চার টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন—১৩৬১

পূজ্যপাদ পিতৃদেব

আশুতোষ ঘোষাল

মহোদয়কে

শ্রদ্ধার সহিত

পঞ্চানন

নিবেদন

সর্ব্বোপরি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দুইজন মনীষীর নিকট। এঁদের একজন বর্ত্তমান বাংলার ইন্সপেকটার জেনারেল অব পুলিশ শ্রীহীরেন্দ্র সরকার এবং অপর জন কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষ-চৌধুরী, এঁদের উপদেশ ও অনুমতি না হলে এই গ্রন্থ প্রকাশ কোনও দিনই সম্ভব হতো না।

আমার এই পুস্তক কয়খানি 'গুরুদাস চ্যাটার্জ্জি এণ্ড সন্সে'র স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীহরিদাস চ্যাটার্জ্জি মহোদয় নানা অসুবিধার মধ্যেও আগ্রহের সহিত প্রকাশ করার জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সুসাহিত্যিক শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী মহোদয় পুনঃ পুনঃ তাগিদ ও উৎসাহ না দিলে এই বিরাট পুস্তক রচনা করা হয়তো সম্ভব হতো না। মুদ্রণ বিষয়ে তাঁর বিবিধ উপদেশ ও আগ্রহের জন্যও আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁর সহকারী শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তী এই পুস্তক কয়খানির মুদ্রণ বিষয়ে বহু শ্রমস্বীকার করেছেন, এইজন্য তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। এ'ছাড়া ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কসের শ্রীরামহরি বাড়, শ্রীসূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীশশাঙ্কশেখর কোঙার মুদ্রণকার্য্যে বহু অসুবিধা স্বীকার করেছেন, এইজন্য তাঁদেরও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অপরাধ-বিজ্ঞান

অষ্টম খণ্ড

অপরাধ-নিরোধ

এদেশে রোগ ও রুগীর বৃদ্ধি ঘটলে ডাক্তারের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু এমন দেশও আছে যেখানে উহাদের সংখ্যা কমাতে পারলে ডাক্তারের মাইনে বাড়ে। বস্তুতঃপক্ষে রোগ নিরাময় অপেক্ষা রোগ-নিবারণ বহুগুণে শ্রেয়ঃ। অপরাধ-নিরোধ সম্পর্কেও এই একই কথা বলা চলে। যে দেশে অপরাধীর সংখ্যা কম, প্রকৃতপক্ষে সেই দেশই স্বর্গভূমি। অপরাধীর সংখ্যা কমিলে আমাদের এই মর্ত্তই বেহস্তে পরিণত হতে পারে।

অপরাধ-নিরোধ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, এই দুই উপায়েই সম্ভব; কিন্তু উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক উপায়ই শ্রেষ্ঠ। বক্তব্য বিষয়টী একটু বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। ধরুণ, একটা দস্যু আপনার বাসগৃহ আক্রমণ করেছে। প্রতিরোধার্থে আপনি তার মস্তকে দারুণ আঘাত করলেন। সে আর্তনাদ করতে করতে পলায়ন করলো কিন্তু তা মাত্র ক্ষণিকের [redacted]নরায় দেখা গেল, সে আপনার ঐ বাটী আক্রমণার্থে [redacted]ছে। আপনি পুনরায় তাকে অনুরূপ ভাবে আঘাত করলেন, [redacted] পশ্চাদপদ হোল কিন্তু পরদিনই দেখা গেল সে আবার ফিরে [redacted] এই ভাবে যতবারই তাকে আঘাত করা যায় ততবারই সে [redacted]টে, কিন্তু পুনরায় সে ঐ একই উদ্দেশ্যে ফিরে আসে। এইরূপ

অপরাধ-নিরোধের নাম 'অস্বাভাবিক অপরাধ-নিরোধ'। আইন ও শাস্তির দ্বারা এইরূপ ভাবে অপরাধ-নিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু আপনি যদি ঐ দস্যুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে খুশী করে বা তার মনে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক করে একবার ফিরিয়ে দিতে পারেন তাহ'লে সে, সেই যে চলে যাবে আর কখনও অসৎ উদ্দেশ্যে ফিরে আসবে না। এই শেষোক্ত পন্থায় অপরাধ-নিরোধের নাম 'স্বাভাবিক অপরাধ-নিরোধ'।

এমন একরূপ চিকিৎসা পদ্ধতি আছে যাহা দ্বারা ত্বরায় রোগ সারানো যায় বটে, কিন্তু তা সাময়িক ভাবে ফলপ্রসূ হয়; এমন কি একটি রোগ সারিয়ে উহা আর একটি রোগের সৃষ্টি করে। এইরূপ চিকিৎসার সঙ্গে 'অস্বাভাবিক অপরাধ-নিরোধে'র তুলনা করা চলে, কিন্তু এমন বহু চিকিৎসা আছে যা রোগের কারণ নির্ণয় করে, উহার মূল উৎপাটনে সচেষ্ট হয়। ইহা সময় সাপেক্ষ হলেও সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে এবং চিরকালের মত ঐ রোগের উপশম ঘটায়। এইরূপ চিকিৎসার সহিত 'স্বাভাবিক অপরাধ-নিরোধে'র তুলনা করা চলে।

স্বাভাবিক ভাবে অপরাধ-নিরোধ করতে হলে যে সকল সামাজিক ব্যবস্থা ও অবস্থা অপরাধী-সৃষ্টি করে, সেগুলি দূরীকরণ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। মানুষের দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ এবং অর্থনৈতিক-অসমতা দূরীকরণ, তাদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান ও সুন্দর পরিবেশ তৈরি করার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষার প্রচলন, অস্বাভাবিক ও অকারণ বাধা নিষেধের অপসারণ, মানুষের নিম্নতম চাহিদা মিটিয়ে তাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং অপরাধ-নিরোধ মূলক মনোবৃত্তির প্রসার দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে অপরাধ-নিরোধ করা সম্ভব।

মানুষের দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ এবং অর্থনৈতিক-অসমতা অপরাধী-সৃষ্টির অন্যতম কারণ তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

অবিবেচনার ফলে নানাপ্রকার শুল্ক কর-ভার দ্বারা দেশবাসীকে ভারাক্রান্ত করে বা অর্থনৈতিক-অসমতা দ্বারা গরীবকে আরও গরীব করে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যেতে পারে যার ফলে বহুসংখ্যক ব্যক্তি কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্যই অপরাধী হতে বাধ্য হয়। তদুপরি অন্ন-বস্ত্রহীন গরীব বস্তিবাসী মানুষ দিনের পর দিন দেখে আসছে তাদের মুষ্টিমেয় ধনিক প্রতিবেশীর কদাচার পূর্ণ আয়েসী জীবন ও তাদের অন্যায় ভাবে আহৃত অর্থের অপব্যবহার। এ অবস্থায় তাদের মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দমনের জন্য যে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন তা তাদের না দিলে স্বভাবতঃই তারা অপরাধী হয়ে উঠবে। যে ভৃত্য-চোর প্রতিদিন তার মনিবকে বিনা বাধায় ও বিনা আপত্তিতে দস্যুগিরি করতে দেখেছে তাকে শাস্তি দেবার অধিকার সমাজের কোথায়? অপর দিকে কাউকে কেউ অযথা তার ন্যায্য প্রাপ্য অর্থ বা সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করলে বা কারো কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি বলপূর্ব্বক দখল করলে তার মধ্যে যে গ্লানি আসে তা সর্ব্বদাই অপরাধী-সৃষ্টির সহায়ক। এই গ্লানি শুধু এক পুরুষেই সীমাবদ্ধ বা পর্য্যবেশিত থাকে না, ইহা পুরুষানুক্রমে ও বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হতে থাকে। এই সকল কারণে মধ্যম পন্থা অবলম্বনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তবে ইহা যুগোপযোগী করে তৈরী করতে হবে। দেশের আইন এমন ভাবে সৃষ্টি করা উচিত যাতে একদিকে ধনিক অত্যধিক সম্পত্তি অর্জ্জন করতে না পারে—অপর দিকে তেমনি কারুর কষ্টার্জ্জিত বা স্বল্প সঞ্চিত অর্থ কেউ বলপূর্ব্বক কেড়েও না নিতে পারে। দেশের আইন এমন ভাবে গঠিত হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক নাগরিক স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে আত্মসম্মান-সহ সগৌরবে বসবাস করতে পারে, এবং কেহ কাহারও উপরে অযথা কোনও অত্যাচার করতে সক্ষম না হয়। এইরূপ আইন প্রতিটী সভ্যদেশে প্রচলিত থাকলেও ব্যয়সাপেক্ষ বিধায় গরীবের পক্ষে উহার

সাহায্য নেওয়া আজও পর্য্যন্ত কষ্টসাধ্য। এ'ছাড়া বিচারক যতক্ষণ না ঘটনাস্থলে স্বয়ং তদন্ত করবেন ততক্ষণ তাঁর পক্ষে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করা দুরূহ। বিচারকার্য্যের প্রতিটি ভুল মানুষকে বেপরোয়া করে অপরাধী করে তুলে। এদের যে সকল পড়শী সত্য ঘটনা অবগত থাকে তাদের উপরও এই সকল বিচার-বিভ্রাট একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই জন্য সাধু ও সুধী গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বিচারই অতীতে এদেশে অপরাধীর সংখ্যা কমাতে পেরেছিল। এই জন্য কোনও কোনও দেশে ভ্রাম্যমান আদালতের প্রচলন আছে। এরা অতর্কিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে যাকে সম্মুখে পায় তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে।

এদেশের গ্রাম্য সমাজে পূর্ব্বে ধনী ও নির্ধনের প্রভেদ ছিল। বিরাট প্রাসাদের পার্শ্বে বহু পর্ণকুটীরও দেখা গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা কখনও অপরাধী সৃষ্টি করে নি। এর কারণ এই প্রভেদের মধ্যে কোনও গ্লানি বা বিদ্বেষ ছিল না। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য থাকলেও তাতে পাপ বা গ্লানি থাকে নি। তেমনি সেখানে ধনীদের মধ্যেও অনাচার ছিল না। এই সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমরা ছিলাম ঐ অঞ্চলের পুরানো জমিদার। এই পল্লীতে আমাদের প্রাসাদোপম বাটীর সম্মুখে রাস্তার ওপারে মেটে বাড়ীতে কয়েক ঘর চাষী বাস করতো। ছয় সাত পুরুষ ধরে তাদের সঙ্গে আমাদের 'রাজা প্রজার' সম্পর্ক। আমাদের ন্যায় তারাও তাদের সাত-পুরুষের নাম বলতে পারে। কবে কোন পুরুষে কেমন করে তাদের সঙ্গে আমাদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার ইতিহাস আমাদের ন্যায় তাদেরও জানা আছে। বাটীর প্রশস্ত রোয়াকে চেয়ারে বসে কতবার দেখেছি 'বৃদ্ধ চাষী হাবুল জেঠা'কে দেখে, পিতাঠাকুর সসম্মানে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'হাবুলদা আছো কেমন?' আমরাও হাবুল জেঠার কাছে তার

নিজের পুত্রকন্যার ন্যায়ই স্নেহের পাত্রী ছিলাম। আমাদের কারুর অসুখ হলে তার উৎকণ্ঠাও লক্ষ্য করেছি। অপর দিকে গরীব কোনও প্রতিবেশী অভুক্ত আছে জানলে আমাদের মা জেঠাইয়েরও মুখে অন্ন উঠে নি। পরস্পর পরস্পরের হাঁড়ীর খবর রেখে তবে তাঁরা তাঁদের মুখে অন্ন তুলতেন। এই সম্পর্কে শত্রু মিত্রের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ ছিল না। এইরূপ মনোবৃত্তি ছিল গ্রাম্য দ্বেষাদ্বেষী ও দলাদলির বহু উর্দ্ধে। সমস্ত গ্রামটি ছিল যেন একই পরিবারভুক্ত। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি যে ঐ সকল চাষী পরিবার খড়ো ঘরে বাস করলেও তাদের দরিদ্র বলা যায় না। প্রত্যেক পরিবারেরই নিজস্ব কয়েক বিঘা জমি ছিল এবং তাতে শস্যও উৎপন্ন হতো প্রচুর। তাদের কারোই মোটা ভাত কাপড়ের অভাব আমি কখনও দেখি নি। তারা নিজের পরিশ্রম লব্ধ মোটাভাত কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকতো। কারো কাছে তারা কোনও দিনই আপন সম্মান বিক্রয় করে নি। আমাদের সঙ্গে তাদের এই মাত্র তফাৎ ছিল যে আমরা বিরাট অট্টালিকায় সুদৃশ্য ঝাড় লণ্ঠনের তলায় বাস করেছি এবং তারা বাস করেছে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেটে ঘরগুলিতে। আমরা বজরা ভাড়া করে ইল্লি-দিল্লী ও কাশী-গয়া ভ্রমণ করে এসেছি। কিন্তু তারা গরুরগাড়ী ও রেলগাড়ী ছাড়া অন্য কোনও যানবাহন ব্যবহার করার কোনও প্রয়োজন মনে করে নি। আমাদের মা' কাকী ও জেঠাই যেখানে হীরা জহরতের অলঙ্কার পরেছে, সেখানে তাদের ঝি বৌ'রা পরেছে রূপার কঙ্কন ও বৈঁচি। আমাদের সুখ ঐশ্বর্য্যে তারা কখনও ঈর্ষান্বিত তো হয়ই নি বরং তার জন্য তারা গর্ব্বই অনুভব করেছে। এর কারণ আমাদের উভয় পরিবারের এই অর্থ-নৈতিক অসমতার মধ্যে কোনও গ্লানি ছিল না। এ'ছাড়া বাবুরা আরও বড়লোক হলে সময়ে ও অসময়ে তাদের আরও সাহায্য

করতে পারবে একথাও তারা ভেবেছে। আমরা মানুষ হয়েছি ঝি'মাদের কোলে ও কাঁধে, তাদের ছেলেরা মানুষ হয়েছে মা, পিসি ও মাসীর কোলে। আমাদের অট্টালিকার যেখানে সেখানে অবাধ গতিতে ভ্রমণ করে তারা আমাদের মতই সেখানকার আসবাব পত্রের সৌন্দর্য্য অনুভব করতো। যতদূর মনে পড়ে, তারা যে আমাদের চেয়ে মানে ছোট তা আমরা কোনোদিনই ভাবতে সাহসী হই নি। যে হাসি আমাদের মুখে ফুটে উঠেছে, তাদের ছেলেদের মুখেও আমরা সেই হাসিই দেখেছি। কোন ধনী তাদের গ্রামে এসে বসবাস করলে ঈর্ষান্বিত না হয়ে খুশী হয়ে তারা তাদের ধন দৌলত রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছে। এই সকল বিষয় হতে আমার মনে হয় ধনী যদি নির্ধনের প্রতি দরদী হয় তা'হলে অর্থনৈতিক বৈষম্য গ্রামের ন্যায় সহরেও এমন উৎকট রূপে প্রকাশ পায় না। কিন্তু সহরে ও শিল্পাঞ্চলে এইরূপ মনোবৃত্তি প্রসারের পরিবেশ অত্যল্প, এইজন্য দেখা গিয়েছে যে সেখানে শিল্প ও বাণিজ্যের সহিত বিবিধ শ্রেণীর অপরাধীদেরও সৃষ্টি হয়েছে।

এ ছাড়া আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েত ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে এমন ভাবে গ্রামবাসীদের বিবাদ বিসম্বাদের সুমীমাংসা করে দিয়েছে যে কেহ কখনও অপমানের গ্লানি নিয়ে গৃহে ফিরে আসে নি। আত্মসম্মানের বিলোপ নৈতিক অসাড়তা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। প্রত্যেকেই সম্মানের সহিত বসবাস করতে পারায় কেহ কখনও অন্যায় করে নি বা অপরাধী হয় নি। দৈবাৎ কেউ কখনও চুরি করে বসলেও তাকে জেলে পাঠাবার কেউ কল্পনাও করত না। পাছে ঐ পরিবারের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এইজন্য তারা নিজেরা তাকে শাস্তি না দিয়ে তার পিতামাতার কাছে তাকে বিচারের জন্য ধরে নিয়ে গিয়েছে, এবং ঐ চোর পুত্রকে যা কিছু শাস্তি দেবার তা দিয়েছে তারই পিতামাতা বা অভিভাবক; পাড়া-পড়শী

বা গ্রাম্য পঞ্চায়েত নয়। আপন পিতামাতার দ্বারা প্রহৃত ভর্ৎসিত বা বন্দীকৃত হওয়ায় ঐ চোর পুত্রের আত্মসম্মান কখনও ক্ষুণ্ণ হতে পারে নি এবং সেইজন্য পরবর্ত্তীকালে সে সাধু জীবনই যাপন করতে পেরেছে। এ'ছাড়া গ্রামের প্রতিটি ছেলেমেয়ের নৈতিক চরিত্রের প্রতি তার মাতা-পিতার ন্যায় ঘরে বাইরে প্রতিটি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির সমান ভাবে লক্ষ্য ছিল। তদুপরি রামায়ণ, মহাভারত পাঠ, কথকতা ও ধর্ম্মোপদেশ এবং বয়জ্যেষ্ঠদের উপদেশ আশৈশব তাদের উপর বাক্-প্রয়োগের কাজ করেছে। এর ফলে গ্রামবাসীদের কেউ কেউ নিরক্ষর থাকলেও তারা সুশিক্ষিত ছিল। তাদের প্রত্যেকের নৈতিক শিক্ষার তুলনা নেই। অপর দিকে অসৎ সঙ্গেরও পল্লীগ্রামে অভাব, অতোগুলি শুভাকাঙ্ক্ষীর দৃষ্টি এড়িয়ে অসৎ হওয়ার পরিবেশ কৈ? সত্য কথা বলতে গেলে আমি স্বীয় জীবনে মাত্র দুইবার থানার দারোগাকে তদন্তের ব্যাপারে গ্রামে আসতে দেখেছি। এইরূপ কোনও গ্রাম্য পরিবেশে অপরাধী সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব।

গ্রাম্য পরিবেশের অপরাধের স্বল্পতার অপর কারণও ছিল। লোক সংখ্যা অল্প থাকায় তারা পরস্পর পরস্পরের সহিত সুপরিচিত ছিল। প্রতিদিন তারা পরস্পর পরস্পরের সন্নিধানে আসতে বাধ্য হতো। এই কারণে তারা পরস্পর পরস্পরের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক অপরাধ স্পৃহা প্রারম্ভেই প্রদমিত করতে পেরেছে। আধুনিক আদিমবাসীদের ন্যায় তারা স্বগোষ্ঠীর লোকেদের প্রতি অপরাধ করার কথা চিন্তাও করে নি। অপর দিকে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি গ্রামে প্রবেশ করা মাত্র সে সহজেই চিহ্নিত হয়ে যেতো। কোনও এক সুবাদে বাহিরের কেউ গ্রামে এলেও উপযুক্ত কৈফিয়ৎ ব্যতীত গ্রামের অলিগলিতে তাদের পক্ষে ঘুরা-ফিরা করা সম্ভব হয় নি। গ্রামের একান্ন ভুক্ত পরিবারগুলি

এমন ভাবে তৈরী যে উহার দুই একজন পুরুষ সহরে কর্ম্মরত থাকলেও অপর দুই একজন গ্রামে থেকে চাষবাস ও কৃষি শিল্পে নিযুক্ত থেকেছে। গ্রাম হতেই প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু উৎপন্ন করে নিতে তারা সক্ষম ছিল। এইজন্য অকারণে একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি তখনও ভেঙে যায় নি। এইজন্য গ্রাম্য সম্পত্তি যৌথভাবে চৌকি দিবার মত পুরুষের অভাব গ্রামে কখনও হয় নি। কিন্তু তা সত্বেও কালে ভদ্রে গ্রামে সিঁদ চুরী যে হয় নি তাও নয়। কিন্তু উহা সাধিত হয়েছে বাহিরের ভ্রাম্যমান স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় বা ভিন্ন গাঁয়ের বিতাড়িত কোনও গ্রামের উপকণ্ঠ বা অরণ্যবাসী অপরাধীদের দ্বারা। এই সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে ডাকাতির প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধেও আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। অনুসন্ধান করে আমি জানতে পারি কোনও কোনও দূর গ্রামে ভূমিহীন মজদুর বাস করে। বহু ক্ষেত্রে এদেরই কেউ কেউ ডাকাত দলে যোগ দিয়েছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নির্ম্মম ডাকাতি সমূহ ভ্রাম্যমান স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় লোকেরাই সমাধা করেছে। কিন্তু গ্রামবাসীর সহযোগীতা ও প্রতিরোধ শক্তির জন্যে এইরূপ অপরাধের সংখ্যাও বেশী হতে পারে নি। ভূমিহীন মজদুরদের ভূমি সংগ্রহ করে দিতে পারলে এবং স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় দলের প্রতি কড়া নজর রাখলে এই অপরাধও সেখানে আর একটিও হবে না।”

উপরোক্ত গ্রাম্য পরিবেশকেই বলা হয়ে থাকে রামরাজ্য। এই রামরাজ্য কেবল মাত্র গ্রাম্য পরিবেশেই স্থাপন করা সম্ভব। একমাত্র এইরূপ পরিবেশই ধনী ও নির্ধন এবং প্রবল ও দুর্ব্বলের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে নৈতিক অসাড়তা দূর করে মানুষকে নিরপরাধী রাখতে সক্ষম; কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান উদ্যোগ শিল্প এইরূপ ব্যবস্থার পরিপন্থী। পরিসংখ্যা হতে দেখা গিয়েছে যে কুটীর-শিল্প ও কৃষিপ্রধান গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত

অপরাধী নেই বললেই চলে। অপরাধী ও বেশ্যা নারীর যা কিছু প্রাবল্য তা সহর ও শিল্পাঞ্চলে। অবশ্য জনবহুল গণ্ডগ্রামেও তাদের সামান্য সংখ্যায় দেখা গিয়েছে। এইজন্য আমি মনে করি, দশ হাজারের উর্দ্ধ সংখ্যক বসতির সহর, অধিক সংখ্যায় কোনও দেশে স্থাপন করা উচিত হবে না এবং নূতন গ্রাম সৃষ্টি করতে হবে মাত্র এক সহস্র বা তদোনিম্ন সংখ্যক বসতি নিয়ে। তা না হলে তারা এক পরিবার ভুক্ত বলে নিজেদের কখনও মনে করতে পারবে না। এছাড়া তাদের একই স্থানে পুরুষানুক্রমে বসবাসেরও প্রয়োজন আছে। এইরূপ ব্যবস্থা কঠোর সমাজ গঠনের পরিপন্থী। কোনও পাপ, অন্যায় বা অপরাধ গ্রামে বা পাড়ায় যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া আনে, তা উহা সহর ও শিল্পাঞ্চলে কখনও আনে না। জনৈক ব্যক্তি কোনও পর-নারী সহ গ্রামে বা পাড়ায় বাস করতে এলে সামাজিক প্রতিক্রিয়া তাকে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু সহর ও শিল্পাঞ্চল তাকে সমাদরে আপন বুকে জায়গা করে দিয়েছে। আপন গ্রামে যে ব্যক্তি কোন বাধা নিষেধ এড়াতে পারে নি—সে বিদেশে এসে অনায়াসে যে কোনও কুকাজ করতে পেরেছে। এই ভাবে আমরা দেখতে পাবো যে জনসংখ্যানুযায়ী গ্রাম ও সহর সৃষ্টি দ্বারা আমরা অপরাধ-নিরোধের পরিপন্থী সুপরিবেশের সৃষ্টি করতে পারি। ব্যাধির ন্যায় অপরাধও যাতে সংক্রামক হতে না পারে তার জন্য একটী গ্রাম হতে অপর গ্রামের ন্যূনাধিক প্রয়োজনীয় দূরত্ব রক্ষা করতে হবে এবং কোনও গ্রামেই এক সহস্রের উর্দ্ধসংখক নরনারী রাখা উচিত হবে না। এই সঙ্গে সহর হতে মানুষ এসে কোনও অজুহাতে গ্রামের নৈতিক আবহাওয়া যাতে পঙ্কিল করতে না পারে তাও দেখা দরকার।

কিন্তু কেবলমাত্র গ্রাম দ্বারা বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব নয়। এই জন্য দেশে সহরেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু কোনও সহরই বৃহদাকার হওয়া উচিত হবে না। ছোট ছোট সহরে অপরাধ-নিরোধ যত সহজ বড় বড় সহরে তা তত সহজ নয়। উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা দশ সহস্র সংখ্যক নরনারীর ছোট ছোট সহরে অপরাধ-নিরোধ করা সম্ভব, কিন্তু বড় বড় সহরে সম্পূর্ণরূপে অপরাধ-নিরোধ আজও পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নি। যে দেশ বারে বারে জয় করতে হয় সে দেশ জয় করা বা না করা সমান কথা। বড় বড় সহরে অপরাধ-নিরোধ সম্বন্ধে এই একই কথা বলা চলে। এইখানে অপরাধ-নিরোধ করার একমাত্র অর্থ লৌহ-কক্ষের দুয়ারে দিবারাত্র বিশ্বাসী দরোয়ান বসিয়ে রাখা। এই সকল সহরে অপরাধ-নিরোধ করতে হ'লে নগরবাসীদের প্রত্যেককেই অপরাধ, অপরাধী ও তাদের বিবিধ পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দীক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অপর দিকে নগর-পুলিশকে সদা সজাগ থেকে সহরের ক্রমবর্দ্ধমান অপরাধীদের সহিত অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে নূতন নূতন বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কোনও প্রকারে অপরাধীদের সংখ্যা কথঞ্চিত কমানো যায় মাত্র। এই সকল সহরে অপরাধ-নিরোধ করতে হ'লে নগরবাসীদের প্রত্যেককেই হতে হবে অপরাধীদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও সাবধানী এবং তাদের বাসের জন্য গৃহের নির্ম্মাণ প্রণালীও করতে হবে অপরাধ-নিরোধ মূলক বৈজ্ঞানিক পন্থায়। কেবল মাত্র সমবেত চেষ্টায় উপরোক্তরূপ বিলিব্যবস্থা করে এইখানে অপরাধ-নিরোধ করা সম্ভব। বক্তব্য বিষয়টী নিম্নের বিবৃতি হতে সুস্পষ্ট বোঝা যাবে।

"আমার বন্ধু অমুক তাঁর নূতন তৈরী বাড়ীটী আমাকে দেখাচ্ছিলেন।

প্রায় সত্তর হাজার টাকা ব্যয় করেছেন ইহা নির্মাণে। তদুপরি আসবাবপত্র প্রভৃতি ক্রয় করতেও তাঁর দশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। শ্বেত পাথরের মেঝে ও গরম জলের ব্যবস্থা পরিদর্শন করার পর তাঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, প্রায় নব্বই হাজার টাকা ব্যয় করেছেন, কিন্তু এই সঙ্গে আরও দুই হাজার বা একহাজার টাকা ব্যয় করে একটা ষ্ট্রঙ্‌ রুম তৈরী করেন নি কেন। বাড়ীতে নিশ্চয়ই বহুমূল্যের অলঙ্কার ও জহরত আছে। চুরি হতে সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে যৎসামান্য ব্যবস্থা এই নূতন বাড়ীতে রাখলেন না কেন? এতই যখন করলেন তখন একটী ষ্ট্রঙ্‌ রুম ও একটী লাইব্রেরীর কথা একবারও আপনি ভাবলেন না।' আমার এই প্রশ্নে ভদ্রলোক নিরুত্তর ছিলেন, কারণ আগের দিনই তাঁর ঐ হালফ্যাসানি খোলা মেলা বাড়ী থেকে দশ সহস্র মূল্যের অলঙ্কার চুরী গিয়েছিল।"

অপরাধ নিবারণের জন্য ছোটখাটো সহরের মানুষদের সংঘটন তৈরী করে তাদের পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচয় করিয়ে দিলে বা তাদের বিভিন্ন পল্লীগুলিকে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের মত একীভূত করতে পারলে অপরাধ-নিরোধ করা সুগম হবে। যে মনোবৃত্তি স্বল্প সংখ্যক গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বতস্ফূর্ত্তভাবে আসে তা' ছোটখাটো সহরবাসীদের মধ্যে প্রচারের দ্বারা আনা সম্ভব। কিন্তু বড় বড় সহর তৈরী করবার সময় অপরাধ-নিরোধের সুবিধার কথা ভেবে তা তৈরী করা উচিত। এই সকল সহর এমন কয়েকটী ছোট ছোট ব্লকে বিভক্ত করতে হবে যার চতুর্দ্দিক ঘিরে চারিটী সুপ্রশস্ত রাজপথ থাকবে। এইরূপ ক্ষেত্রে শান্ত্রীদের পক্ষে এই সকল ব্লক ঘিরে উহা রক্ষা করা সহজ সাধ্য। এ'ছাড়া এই সকল ব্লক পাঁচমেশালী নাগরিক অধ্যুষিত হলে চলবে না। যথাসম্ভব সমকৃষ্টি ও অবস্থার মানুষদের জন্য এইরূপ এক একটী ব্লক

নির্দ্দিষ্ট করে দিতে হবে ; যাতে কৃষ্টিগত বা অর্থনৈতিক অসমতা পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ করে তুলতে না পারে। এইরূপ ব্যবস্থা একটী গৃহস্থকে অপর গৃহস্থের প্রতি স্বতস্ফূর্ত্তভাবে আগ্রহশীল করেও তুলবে। সহর নির্ম্মাণের ন্যায় সহরে বাটী ও পথঘাট নির্ম্মাণ ও অপরাধ-নিরোধের অনুকূল করে তৈরী করতে হবে। এ'ছাড়া বড় বড় সহর ছোট ছোট কয়েকটী 'পকেটে' বিভক্ত করে তাদের উন্মুক্ত স্থান বা প্রান্তর দ্বারা বেষ্টিত রাখা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা বড় বড় সহরেও গ্রাম্য সমাজের অনুরূপ সমাজ গঠন করে সহরে অপরাধীর সংখ্যা কমিয়ে আনবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা দ্বারা অপরাধ করার সুযোগ ও সুবিধে কমিয়ে দেওয়া যায়। ইহাকে অপরাধ-নিরোধের অস্বাভাবিক উপায়ের একটি উপায় বলা যেতে পারে। কিন্তু শহরের পঙ্কিল পরিবেশ ও আবহাওয়া দূর করে স্বভাবিক উপায়েও অপরাধ-নিরোধ করা যেতে পারে। সহরের অপরাধ-সৃষ্টির অন্যতম কারণ হচ্ছে এইখানে আত্মগোপনের সুবিধা, দরিদ্রদের জন্য উপযুক্ত আবাসের অভাব, অর্থনৈতিক অসমতা, একের প্রতি অপরের অবজ্ঞা এবং ধন ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য। এইজন্য সহরে স্বভাবিক এবং অস্বাভাবিক ঐ উভয় উপায়ে অপরাধ নিরোধের প্রয়োজন। সহরের বস্তীজীবন যে অপরাধী সৃষ্টির সবিশেষ সহায়ক, তাহা পুস্তকের পূর্ব্বতন খণ্ডগুলিতে বিশেষ করে বলা হয়েছে। অপরাধী মাত্রেই প্রায় দরিদ্র, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুতরাং দারিদ্র্যতা দূর এবং বস্তী-আবাস সমূহের উন্নয়ন দ্বারা অর্দ্ধেক অপরাধ-নিরোধ করা সম্ভব। আমার বিশ্বাস ভাল ঘরের একশত শিশুকে যদি মানুষ হবার জন্য সহরের বস্তীতে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে তাদের অন্ততঃ আশীজন নেশাভাঙ ও চুরি-চামারি করতে অভ্যস্ত হবে। অনুরূপ ভাবে উহাদের মধ্যে যারা মেয়ে তাদেরও

অধিকাংশ ধীরে ধীরে বেশ্যাতে পরিণত হয়ে যাবে। বহুক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে বস্তি-সংলগ্ন অট্টালিকাবাসী অবস্থাপন্ন গৃহস্থের শিশুরাও এই অনুকূল প্রতিবেশের সংস্পর্শে এসে চোর বা বেশ্যা হয়ে গিয়েছে। কোনও ভদ্র গৃহস্থ দারিদ্র্যবশত বস্তিতে বাস করতে বাধ্য হ'লে তাদের পরিণাম কি হতে পারে তা পুস্তকের পূর্ব্বতন খণ্ডগুলিতে বলা হয়েছে। সহরে বস্তিগুলির পুনর্গঠন ও উন্নয়ন দ্বারা বাসভূমি সম্পর্কিত পরিবেশের সমস্যা সমাধান করা সহজ। উন্নত ও সুন্দর পরিবেশ দ্বারা যেমন মানসিক রোগ সারানো যায় তেমন অপরাধীকেও নিরপরাধী করা যায়। অন্ততঃ এই সুপরিবেশ নূতন নূতন অপরাধী-সৃষ্টির অনুকূল কখনও হতে পারে না। অবশ্য এই সঙ্গে ঐখানকার শিশুদের নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে; সেই সঙ্গে যা গড়ে দেওয়া হবে তাদের পিতামাতা কুদৃষ্টান্ত ও কুশিক্ষা দ্বারা তা না ভেঙ্গে দেয় তাও দেখা দরকার।

কিন্তু সহরের লোকদের দারিদ্র্য দূর করা বস্তি উন্নয়নের মত অত সহজ নয়। সহরবাসীর দারিদ্র্য দূর করতে হ'লে যাদের সহরে কোনও প্রয়োজন নেই এবং যাদের মানসিক গঠন সহর বাসের অনুকূল নয় তাদের সহর থেকে অপসরণ করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে যে একজন বস্তিবাসী মজদুরকে যত সহজে অপরাধী করা যায় তত সহজে ভূমির অধিকারী একজন হালচাষী কৃষককে অপরাধী করা যায় না। এর কারণ ঐ হালচাষী কৃষক শস্য সৃষ্টি করে নিজের ও তার পরিজনের জন্য, কিন্তু ঐ মজদুর দ্রব্য উৎপন্ন করে অপরের সুখ সুবিধার জন্যে। এইজন্য মজদুর মাত্র নিজেকে ক্রীতদাস মনে করে এবং সে শস্য বা দ্রব্য সৃষ্টি করলেও সে ঐ সৃষ্টির আনন্দ হতে বঞ্চিত থাকে। অবশ্য যদি সে'ও মালিকদের ন্যায় ঐ মিল বা ফ্যাক্টরীর সামান্য অংশীদার হয়

তা'হলে স্বতন্ত্র কথা। অন্যদিকে যে ভূমির অধিকারী হালচাষী সে তার স্বল্প পরিসর পরিবেশের মধ্যে সকল দিক হতেই স্বাধীন; তদুপরি কৃষিজাত দ্রব্যের প্রতি তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। দেনার দায়ে উহা বিক্রয় হয়ে গেলেও তাতে উহা গ্লানি আনে নি। সে মানুষের নিকট দ্রব্য অপহরণ না করলেও উহা সে ভূমির নিকট হতে অপহরণ করে। এইভাবে সে তার অপহরণ স্পৃহারও নিবৃত্তি ঘটিয়ে থাকে। মনস্তত্ত্বের এই ব্যাখ্যাটীও এইস্থলে প্রযোজ্য। কিন্তু যে শ্রমিক শিল্পজাত দ্রব্যের উপর তার নিজের কোনও অধিকারই নেই। সকল দিক হতেই সে পরাধীন। তার শ্রমলব্ধ দ্রব্য অপরে অপহরণ করে। ভূমিহীন কৃষক মজদুর সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। আমার মতে মনের অন্তর্দেশে এই মানসিক প্রতিক্রিয়া এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যা শ্রমিকদের বেপোরায়া জীবনযাপন করতে বাধ্য করবে। এই জন্য আমরা জমির স্বত্বাধিকারী কৃষকদের খুব কম ক্ষেত্রেই অপরাধী হতে দেখেছি। যদি কোনও অপরাধী বা অপরাধ-মুখী দরিদ্র ব্যক্তিকে চাকুরী দিয়ে তার দারিদ্র্য দূর করতে হয় তা'হলে তাকে কোনও মিল বা ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করে দিলে সুফল ফলবে না। তাকে এই ক্ষেত্রে শিল্পাঞ্চল ও শহরের আবহাওয়া থেকে ত্বরায় সরিয়ে কোনও গ্রামাঞ্চলে এনে কৃষিকার্য্যে বা কুটীর-শিল্পে নিয়োগ করতে হবে। ঐ ব্যক্তি একজন প্রকৃত অপরাধী হলে এই একান্ত নূতন (Abrupt Change) পরিবেশ তার মানসিক গঠন এবং অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাতেও সক্ষম। এমন অনেক মালিক আছেন যারা শিল্পদ্রব্য সৃষ্টি করে প্রয়োজন বা চাহিদা মিটাইবার জন্যে নয়, তা তারা করে কেবলমাত্র তাদের লাভের জন্য। যদি তারা বোঝে যে ঐ শিল্পজাত দ্রব্য বিনষ্ট করে দিলে তাদের অধিক লাভ হবে, তা'হলে তাতেও তারা প্রস্তুত।

এমন অনেক ব্যবসায়ীও আছেন যারা যাদের দ্রব্য তারা কেনে তাদের এবং যাদের কাছে তারা ঐ দ্রব্য বিক্রয় করে তাদের; অর্থাৎ এই উভয় প্রকার মানুষদের নিকট দাঁও মারবার মনোবৃত্তি নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে নামে। এই জন্য বড় বড় সহর যেখানে ব্যবসায় চলে ও উদ্যোগ-শিল্প দ্বারা শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সেখানকার পরিবেশ ও আদর্শ অপরাধী সৃষ্টির অনুকূলই হয়ে থাকে। এইজন্য বহুদেশে শিক্ষা কেন্দ্রগুলি এইরূপ বড় বড় সহর হতে দূর দূর স্থানে স্থাপন করা হয়ে থাকে। ঐ সকল দেশে তরুণমতি বালক বালিকাদের সুশিক্ষার জন্য বহু অভিভাবক তাদের নিয়ে সহরের নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্যপ্রদ গ্রামে বাস করাই নিরাপদ মনে করেছেন। ঐ সকল দেশে ইলেকট্রিক্ ট্রেন চালু থাকায় গ্রাম হতে তারা স্বল্প সময়ে কার্য্যোদ্দেশে সহরেও আসা-যাওয়া করতে পেরেছেন। আমি মনে করি সহরের অপরাধীদের জন্য আমরা আরও দূরে পৃথক পৃথক গ্রামের সৃষ্টি করে তাদের কিছুকাল রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রাখলে সহরে নূতন অপরাধী সৃষ্টির কার্য্য বহুলাংশে ব্যহত হবে। ঐই ব্যবস্থা সহরের ন্যায় সমগ্র দেশেরই উপকার করবে, কারণ গ্রাম্য আবহাওয়া ও সুযোগ সুবিধের অভাব ঐ সকল অপরাধীকে নিরপরাধী করে কৃষিকার্য্য ও কুটীর শিল্পের আরও প্রসার করবে। ভূমি বা সম্পত্তির মালিকানা বোধও অপরাধ নিরোধের সহায়ক হয়ে থাকে। সাধারণতঃ যার নিজের সম্পত্তি বা ভূমি আছে সে অপরের ভূমি বা সম্পত্তির প্রতি সম্মান দেখায়। যে নিজে স্ত্রী কন্যা নিয়ে ঘর সংসার করে সে অপরের স্ত্রী কন্যার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখে। মানুষের সমাজ গঠনের মূল কথাই হচ্ছে এই। এর অন্যথা যারা করে তারা অসামাজিক জীব বা অপরাধী। অধিকাংশ সামাজিক মানুষেরই মনোবৃত্তি এইরূপ হয়ে থাকে। এইজন্য ভূমি বা সম্পদ এমন

ভাবে বণ্টন করতে হবে যাতে প্রত্যেকেই নিজেদের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মালিক মনে করতে পারে। এদেশে যে সকল চাষীর কিছু না কিছু পরিমাণ ভূমি আছে তারা অপরাধ করে না বললেই চলে। কিন্তু কাউর সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে অপরের মধ্যে উহা বণ্টন করলে ফল হয় বিপরীত। এতে একজনকে নিরপরাধী করতে গিয়ে গ্লানি সৃষ্টি দ্বারা অপর দলকে অপরাধীতে পরিণত করা হবে। এইরূপে সম্পত্তি বণ্টনের সহিত মানুষকে দিতে হবে নৈতিক শিক্ষা যাতে মানুষ স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। গ্রামাঞ্চলের স্বতঃস্ফূর্ত্ত এই নৈতিক শিক্ষার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমি ঐ কৃষকদের ঐ ভূমির উপর দিয়ে রাস্তা তৈরী করবার জন্যে নির্দ্দেশ দিলে তারা তাতে অস্বীকৃত হয়ে উত্তর দিলে, 'সে কি বাবু! এ যে অপরের জমি। ভূমি-হরণ মাতৃহরণের সমতুল্য। এ আমরা পারবো না।'

আইন প্রণয়ন দ্বারা অপরাধ নিরোধকে বলা হয় উহার অস্বাভাবিক উপায়। আইন প্রণয়ন দ্বারা রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিককে তাদের স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করে। এই দিক হতে ইহার সার্থকতা যথেষ্ট। এ'ছাড়া সহসা কোনও এক পরিস্থিতি ঘটে গেলে সমাজকে রক্ষা করবার জন্য ত্বরিত গতিতে উহার দেহে অস্ত্রোপচার করতে হয়; এইরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উপায়ে অপরাধ নিরোধ করতে হ'লে, যে সময়ের প্রয়োজন তা দেওয়া যায় না, কারণ বিলম্বের কারণে ইতিমধ্যে জনসাধারণ তথা নিরাপরাধী ব্যক্তিদের বহু অনিষ্ট ঘটে যেতে পারে। এই রাষ্ট্রীয় আইন-জনিত বাধা নিষেধ সকলেরই প্রতি সৎউদ্দেশ্যে সমানভাবে প্রযুক্ত হ'লে কাহারও মধ্যে কোনও গ্লানি সৃষ্টি করে না। অপর দিকে যে আইন এক দলকে উন্নত করে অপর দলের ক্ষতিসাধন করে সেই আইন গ্লানি বিবর্জ্জিত

আইন রূপে বিবেচিত হতে পারে নি। আইন দ্বারা গৃহহারা বা ভূমিহীনদের জন্য সুবিবেচনার সহিত রাষ্ট্র কারও গৃহ বা জমি দখল করলে ব্যক্তিগত বা দলগত কোনও গ্লানির সৃষ্টি হয় না—কিন্তু সেই স্থলে অপর কেহ যদি কারও জমি বা বাড়ী জবর দখল করে এবং রাষ্ট্র যদি তাকে এই অপমান হ'তে রক্ষা না করে তা হ'লে তার মনে আসে এই গ্লানি। এই গ্লানি সুদূর প্রসারী হয়ে কিরূপ ক্ষতিকর হয় তা ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত করা হয়েছে। অপরাধ-স্পৃহা এমন এক বস্তু যা একবার নির্গত হ'লে তার আর শেষ নেই। একটি অপরাধ কেহ বিনা বাধায় সমাধা করতে সমর্থ হ'লে সে অপর আর একটি অপরাধ করবেই এবং তারপর সুরু হবে দল বেঁধে অপরাধ করা। প্রারম্ভেই দমিত না হ'লে পরে ইহা দমন করা কঠিন। কেহ কেহ মানুষের এই স্বাভাবিক অপস্পৃহা আপন প্রয়োজনে ও স্বার্থে অপরের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে আখেরে ইহা নিজেদের বিরুদ্ধেই ঘুরে দাঁড়ায়। বাধা না পেলে এরা একটির পর একটি অপরাধ করে সমাজে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। এই অপস্পৃহার সহিত কোনও প্রকার আপোষ নিষ্পত্তি করা আরও ক্ষতিকর। অপস্পৃহার দ্বারা আহৃত ভাল কাজও পরোক্ষে সমাজের ক্ষতি করে। এইরূপ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে প্রকারান্তরে এরা একটি বিরাট অপদলের সৃষ্টি করে চলেছে। শুধু তাই নয় এরা একটি মুখোমুখী বিরাট বিরোধী দলেরও সৃষ্টি করে থাকে, যারা অনুরূপ অপস্পৃহার সাহায্যে তাদের প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত। প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে, তবে উহা দেরীতে আসে এই যা। কারণ প্রতি-সংগঠন তৈরী হ'তে কিছু দেরী হবেই। এই স্থলে আইন একদলের প্রয়োজন মিটাতে প্রারম্ভেই সক্ষম, অপর দিকে উহা অপর দলকে অন্যায় হতে রক্ষা করতেও সক্ষম। তা না হ'লে মানুষ প্রয়োজনানুযায়ী আইনের করণীয় কাজ স্বহস্তে গ্রহণ

করবে। যারা এই সম্পর্কে অধিকারত্বের পৃথক ব্যাখ্যা করে, তারা ভুলে যায় যে একদিন সাধারণ চোর ডাকাতরাও ঐরূপ ব্যাখ্যা করতে পারে। আইন সমগ্র দেশের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিবিধ স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য এনে আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম। উহার প্রকৃত সার্থকতা মাত্র এইখানেই। কিন্তু এই আইন দ্রুত চালু করা উচিত, তা না হ'লে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। দেরীতে কোনও অপরাধ বন্ধ হলেও উহা অপর আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করবে। এই সম্পর্কে নিয়ে একটি কাহিনী উদ্ধৃত করা হ'ল।

"বিদেশের কোনও এক সহরে সহসা বহু ম্যাসেজ হোম বা মালিস-ঘর স্থাপিত হ'তে থাকে। ইহার মুনাফা স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্পায়াসে অত্যধিক হওয়ায় বহু সাধু ব্যক্তিও এই কাজ অন্যায় বুঝেও এতে আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিরোধী এমন কোনও আইন ছিল না যার দ্বারা এই রকম আড্ডাস্থল ত্বরায় ভেঙে দিতে পারা যায়। এই জন্য নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত হ'তে থাকে। ইতিমধ্যে বহু নারী যারা ভাই বা আর কারো সংসারে স্থান করে নিয়ে তাদের সহিত বনিয়ে বসবাস করছিল, তারা লোভে আকৃষ্ট হয়ে বা স্বাবলম্বিনী হবার ইচ্ছায় এই সকল মালিস-ঘরে এসে জমা হয়েছে। এর ফলে পূর্ব্বস্থানে তাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আইন পাশ হবার পর দেখা গেল এদের 'পুনর্ব্বাসন' রূপ অপর এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।"

প্রথমে অপরাধ-মুখী বালক বা যুবকগণ পুলিশ অগ্রাহ্য অপরাধে অভ্যস্ত হয়। যেমন অযথা পড়শীদের গালিগালাজ মারপিঠ ইত্যাদি। পরে কুলফি বরফ কেড়ে খাওয়া, বাগানে ফুলফল লুঠ হতে সুরু করে এরা বড় বড় অপরাধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এদের প্রথম অপরাধ সমূহ আইনতঃ পুলিশ গ্রাহ্য না হওয়ায় পুলিশ প্রারম্ভে তাদের দমন করতে পারে নি। এইরূপ

বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ আইন বহির্ভূত বিশেষ আইনেরও প্রয়োজন আছে। এই সকল ক্ষেত্রে আইনের ভাষা বা ওয়ার্ডিং নিয়ে মাতামাতি না করে আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা স্প্রিট্ গ্রহণ করলে অধিক সুফল ফলবে।

কেহ কেহ মনে করেন, কেবলমাত্র দেশের দারিদ্র্য দূর করলে অপরাধ নিরোধ করা যায়। কিন্তু তাহা ভুল, কারণ দারিদ্র্য দূর করা ও প্রবৃত্তি দূর করা এক কথা নয়। এই সম্পর্কে মানুষের স্বাভাবিক অপরাধ স্পৃহার অবস্থানের কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? পরিসংখ্যা হতে দেখা গিয়েছে যে দেশের খাদ্যাভাব বিদূরীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ কিছু কমেছে বটে কিন্তু সেই অনুপাতে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অযৌনজ ও যৌনজ অপরাধের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ অপস্পৃহা একটী পথ পরিত্যাগ করে, অপর এক পথে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা দীক্ষা ও প্রাচুর্য্যের সহিত অপরাধে প্রযুক্ত নিষ্ঠুরতা কথঞ্চিৎ কমে যায় এই যা। এইজন্য দারিদ্র্য অপসরণের সহিত নৈতিক শিক্ষারও প্রচলন প্রয়োজন এবং তৎসহ মানুষের বাড়তি উৎসাহ ও স্বাভাবিক অপস্পৃহা প্রদমনের জন্য আইন কানুন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসহ বিবিধ রূপ অপকার্য্যের সুযোগ সুবিধা বিলোপেরও প্রয়োজন আছে। মানুষের বাড়তি অপস্পৃহা বা উৎসাহ ভিন্নপথে নিষ্কাশিত বা পরিচালিত করেও অপরাধ নিরোধ সম্ভব।

[কিছুটা সভ্য হওয়ার পর অর্থাৎ কৃষিকার্য্য শিক্ষার পর মানুষের অপরাধ করার প্রয়োজন কথঞ্চিৎ কমে যায়। পূর্ব্বতন কঠোর জীবন সংগ্রামে তাদের একে অপরের সংগৃহীত খাদ্য কেড়ে বা চুরি করে নিলেও পরবর্ত্তীকালে তারা এই বিষয় কথঞ্চিৎ নিরপরাধী হয়। কিন্তু এই সময়ও মানুষ ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করে নি। একমাত্র পরিচ্ছদ ও ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া তাদের কোনও সম্পত্তি ছিল না। এই সকল সম্পত্তিও তাদের মৃত্যুর

পর মৃতদেহের সহিত কবর দেওয়া হ'ত। ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা উত্তরাধিকারী সূত্রে পিতামাতার নিকট হতে কিছু পায় নি। শস্য সম্পদ যা কিছু তারা উৎপাদন করেছে পচ্যমান বিধায় তা তারা সঞ্চয় করে রাখতে পারে নি। এইজন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত খাদ্য তারা পড়শীদের বিতরণ করতে বাধ্য হ'ত। এইজন্য সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ করার প্রয়োজন তাদের ছিল কম। কিন্তু যেদিন হতে মুদ্রা বিনিময়ের প্রচলন হ'ল সেই দিন হতে তারা সঞ্চয় করতে সুরু করেছে। এর ফলে মানুষ নূতন করে নূতন উপায়ে অপরাধ সুরু করে। তাদের মধ্যে যারা কর্ম্মী তারা সঞ্চয় করেছে, যারা অলস তারা তাতে ভাগ নেবার জন্যে অপরাধ করেছে।]

অনেকের মতে এইরূপ পরিবেশের মধ্যে মানুষ সর্ব্বপ্রথম অপস্পৃহা লাভ করে। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে নারীর সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় পুরুষের মধ্যে যৌনজ অপরাধেরও স্পৃহা এসেছিল। কিন্তু এর পূর্ব্বে মানুষের মধ্যে অপস্পৃহা ছিল না এইরূপ উক্তি জৈব ধর্ম্মের বিরোধী। কারণ পূর্ব্বতন আদিম মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে অপরাধ করা ছিল এক সাধারণ ব্যাপার। কেবল মাত্র পরিবৈশিক মতে বিশ্বাসী বিরোধীবাদীরা আজকালকার কোনও জীব গোষ্ঠীর ও আদিম মানুষের রীতিনীতির প্রশ্ন তুলে উহা খণ্ডন করে থাকেন। কিন্তু তারা ভুলে যান যে, যে জীবজন্তু হতে প্রথম মানুষের সৃষ্টি হয় তাদের সহিত আধুনিক জীবজন্তুর প্রভেদ আছে। যে একাচারী গরিলাসদৃশ জীব হতে প্রথম একাচারী মানুষ এবং যে একাচারী গুহা-মানুষ হতে আদিম মানুষ সৃষ্ট হয়েছে তাদের সহিত বর্ত্তমান বানরাদি জীব ও বর্ত্তমান আদিম-মানুষের প্রভেদ আছে। কিন্তু তা সত্বেও তাদের পরিবর্ত্তিত বর্ত্তমান স্বভাব হ'তেই তাদের পূর্ব্বপুরুষদের স্বভাব কত ভীষণ ছিল তা আমরা

উপলব্ধি করতে পারি। এঁরা ভুলে যান যে বর্ত্তমান বানর বা গরিলা মানুষের পূর্ব্বপুরুষ নয়। বর্ত্তমান বানর ও মানুষ, এই উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষ ছিল বানর সদৃশ এক জীব। এই সকল পণ্ডিতেরা, যে সকল আদিম মানুষ সভ্যতার সংস্পর্শে এসে পশু-পালন ও কৃষিকার্য্য শিখেছে তাদের কথাই বলেছেন। তাঁরা এদের পূর্ব্বপুরুষ একাচারী গুহাবাসী পশুসদৃশ মানুষের কথা ভেবে দেখে নি। এই সম্পর্কে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারীতে ইংলণ্ডের টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত নৃতত্ত্ব সম্পর্কীয় একটী প্রবন্ধ হতে এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত করলাম।

"বর্ত্তমান কালে যে সমস্ত অসভ্য মানুষ দৃষ্ট হয়, তারা যে ক্রমোন্নতি-শীল মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বানরতুল্য জীবের ও আধুনিক সভ্যমানুষের মধ্যবর্ত্তী কোনও জীব, তা নয়। সম্ভবতঃ তারা ভূতপূর্ব্ব ও অধুনা-বিস্মৃত আমাদেরই তুল্য মানসিক ও নৈতিক বলে বলীয়ান কোনও মানব জাতির অধঃপতিত বংশধর মাত্র।" —প্রবাসী ভাদ্র ১৩২৮, পৃঃ ৬৯৯

আমার মতে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ-স্পৃহা মানুষ তাদের পূর্ব্বপুরুষ অধুনালুপ্ত বা ক্রমলুপ্ত জীবজন্তু ও একাচারী আদিম মানুষের নিকট হতে লাভ করেছে এবং প্রবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অপরাধের স্পৃহা তারা আহরণ করেছে সভ্যতা তথা সঞ্চয়-প্রবৃত্তির ও মুদ্রারীতি প্রচলনের সহিত। এইজন্য প্রবঞ্চক এবং বিশ্বাসঘাতকতা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই অভ্যাস অপরাধীর পর্য্যায়ে পড়ে। এইজন্য অপরাধ-নিরোধের জন্য কোনটী পরিবৈশিক কারণে অপরাধী হয়েছে এবং কোনটী বা গোত্রানুক্রম জনিত অপরাধী তা প্রথমে নির্দ্ধারণ করা উচিত। এ ছাড়া কোনটী বা অপরাধ-রোগী তাও পূর্ব্বাহ্ণে নির্দ্ধারিত করতে হবে। কেহ কেহ মনে করেন, মানুষের আভ্যন্তরিক ক্ষয়-ক্ষতির কারণে মানুষ অপরাধ করে থাকে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহ'লে অপরাধী হতে সামান্ত

সময়ে নৈতিক শিক্ষা ও বাক-প্রয়োগ দ্বারা মানুষ নিরপরাধী হয় কি করে? আমার মতে দৈহিক ক্ষয়-ক্ষতির কারণে কেবল মাত্র অপরাধ-রোগীর সৃষ্টি হয়। যাহা হউক এই সকল বিবিধ প্রকার অপরাধীর রীতিনীতি ও উহাদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। কেহ কেহ গোত্রানুক্রম জনিত সৃষ্ট স্বভাব অপরাধীদের অপরাধী-রোগীর পর্য্যায়ে ফেলে থাকেন, কিন্তু এদের উভয়ের ব্যবহারের পার্থক্য হতে এদের ভিন্নতা আমি ইতিপূর্ব্বেই প্রমাণ করেছি। তবে এই উভয় প্রকার অপরাধীদের সংখ্যা অত্যল্প মাত্র। পরিবৈশিক কারণে সৃষ্ট অভ্যাস অপরাধীদের সংখ্যাই অত্যধিক।

এমন কয়েকটী অপরাধ আছে যাহা একমাত্র নৈতিক শিক্ষা ও পরিবেশ সৃষ্টির দ্বারা নিরোধ করা সম্ভব। আইন প্রণয়ন দ্বারা সাময়িক ভাবে উহার গতিরোধ করা গেলেও উহা নূতন নূতন উপসর্গ বা অপরাধের সৃষ্টি করে। মানুষের স্বাভাবিক স্পৃহার গতিরোধ না করে উহা ভিন্ন পথে পরিচালিত করাই ভাল। এইরূপ অপরাধ নিরোধের সহিত নদীবেগের গতিরোধের সহিত তুলনা করা চলে। একমাত্র উহার জলনিকাশের ভিন্ন পথ সৃষ্টি দ্বারা নদীর মোড় ঘুরানো সম্ভব, তা না হ'লে উহা দুই কূল প্লাবিত করে দেবে। এই সকল অপরাধ নিরোধের জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাকে বলা হয় অস্বাভাবিক আইন। সহসা কোনও একটী এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্যে আইনের যে প্রয়োজন নেই তা'ও নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাদক নিবারণ আইন ও কালাবাজার নিয়ন্ত্রণ আইনের কথা বলা যেতে পারে। শস্যের ঘাটতি শস্য উৎপাদনের বৃদ্ধি দ্বারাই নিবারণ করা সম্ভব, উহার ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নয়। এইজন্য এই সকল আইনের পরিস্থিতির সুযোগে মানুষের লোভ ও স্পৃহা একদল অপরাধ-মুখী লোককে অপরাধীর

পর্য্যায়ে এনে ফেলে। এইজন্য প্রয়োজনানুসারে এই সকল বিধিনিষেধ সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রমাত্রেরই উচিত হ'বে দ্রব্য ও শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা, অপরদিকে মাদক নিবারণ করতে হ'লে দেখতে হবে যে, যারা মদ খায় নি তারা যেন তাতে অভ্যস্ত না হ'তে পারে। নূতন মাতাল সৃষ্টি নিবারণ ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার দ্বারা একমাত্র ইহা নিরোধ করা সম্ভব। অন্যথায় মদ্যদ্রব্যের চোরাই কারবার নিবারণ করা কষ্টসাধ্য হতে বাধ্য। মানুষের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা না করলেও কয়েকটী অপরাধ এমনই সমাজে এসে পড়ে। এইজন্য সুখ সুবিধা ও চাহিদা মিটিয়েও কোনও কোনও অপরাধ নিরোধ করা গিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে কোনও দ্রব্যের চাহিদা আছে অথচ উহা সুপ্রাপ্য নয়; এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল দ্রব্য অধিক সংখ্যায় অপহৃত হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে, যে লাইব্রেরী হ'তে ইচ্ছামত পর্য্যাপ্ত বই পাওয়া যায় সেই লাইব্রেরীর বই চুরি না হয়ে তা স্বস্থানে ফিরে আসে। এইজন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সুলভ ও সুপ্রাপ্য করেও বহু অপরাধ-নিরোধ করা সম্ভব।

অপরাধ-নিরোধ সুলভ মনোবৃত্তি দ্বারা অপরাধীর সংখ্যা কমানো সম্ভব। বহু ক্ষেত্রে কয়েকটী অপরাধ মানুষের গা সওয়াও হয়ে গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে মানুষের মনে হয় উহা বুঝিবা এক স্বাভাবিক পরিণতি। গয়লা দুধে জল দেয় দিক, শুধু দূষিত জল না দিলেই রক্ষে। খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল সম্বন্ধেও তারা শুধু উহার পরিনামের কথাই ভেবেছে। উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে তারা ভেবেছে, ঘুষ নেয় নিক, কিন্তু পরিবর্ত্তে কাজ যেন তারা করে দেয়। এই অবস্থায় মানুষকে তার অধিকার ও মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। সক্রীয় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে দিয়েও অপরাধ নিরোধ করা যায়। যেখানে সমাজ নেই, সেইখানে সামাজিক প্রতিক্রিয়ারও প্রশ্ন নেই। অন্যদিকে সমাজ দুর্ব্বল

হ'লে উহা প্রতি-আঘাত হানতেও অক্ষম হয়। সামাজিক প্রতিক্রিয়ার অভাব অপরাধী সৃষ্টির অনুকূল। এইজন্য গ্রামের ন্যায় শহরেরও পল্লীতে পল্লীতে সক্রীয় সমাজ গড়ে দিয়েও অপরাধ-নিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। যে অপরাধ করে ও যে সহে, তারা উভয়েই সমভাবে অপরাধী। অপরকে অত্যাচারিত হতে দেখে যে মনে করে অনুরূপ অত্যাচার তার উপর হ'বে না সে বাতুল।

সুপরিবেশ ও সুসংসর্গ দ্বারা যে অভ্যাস-অপরাধীর সংখ্যা বহুলাংশে কমানো সম্ভব তা সর্ব্বজনস্বীকৃত। এই দেশে বহু সৎ ব্যক্তিও কুপরিবেশ ও কুসংসর্গের কারণে অপরাধীর সংখ্যা বাড়িয়েছে। এই সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"আমি বাল্যকালে যে ইস্কুলে পড়তাম সেই ইস্কুলেরই এক শিক্ষকের নিকট বাড়ীতে পড়াশুনা করতাম। ভদ্রলোক প্রতিবারই তাঁর সহ-শিক্ষকদের সুপারিশ করে আমাকে পাশ করিয়ে দিতেন। আমার পিতাঠাকুর ঘুণাক্ষরেও এই বিষয় জানতে পারেন নি। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ঐ শিক্ষক কর্ম্মচ্যুত হওয়ায় আমি পুনঃ পুনঃ ফেল করে ইস্কুল ছাড়তে বাধ্য হই। আমার সহপাঠি ও বন্ধুরা সুশিক্ষিত হওয়ার পর আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তাও কইতো না। এর ফলে অসৎ বালকদের মধ্যে বন্ধু সংগ্রহ করতে আমি বাধ্য হই। পিতাঠাকুর অবস্থা আরও মন্দের দিকে চলেছে বুঝে আমাকে একটী ফ্যাক্টরীতে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পিতাঠাকুর সপরিবারে বদলি হ'য়ে কর্ম্মোপদেশে অন্য এক শহরে চলে যান। কিন্তু আমি এই শহরে একাই থেকে যাই। ধীরে ধীরে আমি মদ খেতে শিখি। কুনারী সংসর্গও করতে থাকি। এরপর একদিন ফ্যাক্টরীর একটী দ্রব্য চুরি করে আমি জেলেও যাই।"

উদ্যোগ শিল্প বা ইন্‌ডাসট্রীর প্রসারের সহিত অপরাধীর বাহুল্য

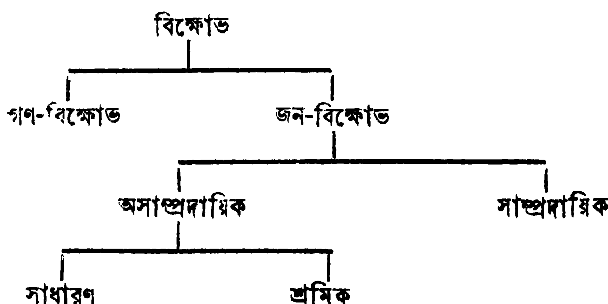
ঘটেছে, কিন্তু তা সত্বেও এই উদ্যোগ শিল্প পরিহার করার কথা আমি কখনও বলবো না, কারণ ইহার প্রসার ব্যতীত জাতি কোনদিনই শক্তিশালী হবে না। আমি কেবল এইটুকু বলতে চেয়েছি যে অপরাধী ও অপরাধীমুখী ব্যক্তিকে শিল্পাঞ্চল হতে কুটীর শিল্প বা কৃষি প্রধান স্থানে সরিয়ে আনা উচিত। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য এক উপায়ের কথাও বলা যেতে পারে। আমার মতে কুটির শিল্পগুলিকে বড় বড় ইন্‌ডাস্ট্রীর সাবসিডিয়ারী রূপে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে। এমন বহু দ্রব্য আছে যা ফ্যাক্টরীতে না তৈরী করে উহার মালিকরা তা গৃহস্থ বাড়ীতে অবস্থিত ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাঁচা মাল সরবরাহ করে তৈরী করিয়ে নিতে পারেন। বক্রি দ্রব্যগুলি অবশ্য বড় বড় ফ্যাক্টরীতেই তৈরী করে নিতে হবে। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা একাধারে উদ্যোগ শিল্পীরা লাভবান হবেন ও কুটীর শিল্পেরও প্রসার হবে; এবং তৎসহ বহু মানুষ আপন পরিবারের মধ্যে বসবাস করে নিরাপরাধী থাকতেও সক্ষম হবে।

অপরাধ-নিরোধ—জন-বিক্ষোভ

জন-বিক্ষোভ ও গণ-বিক্ষোভ এক বস্তু নয়, এইজন্য প্রথমেই বুঝা দরকার উভয়ের প্রভেদ কি? কোনও জাতি বা জনগণের অধিকাংশ ব্যক্তি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে উহাকে বলা হয় গণ-বিক্ষোভ। কিন্তু যখন উহাদের মাত্র সামান্য একটী অংশ কারণে বা অকারণে বিক্ষুব্ধ হয়, তখন তাকে বলা হয় জন-বিক্ষোভ। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে জন-বিক্ষোভের পশ্চাতে সমগ্র জাতির সমর্থন থাকে নি। কিন্তু গণ-বিক্ষোভ জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমর্থিত হয়েছে। বহুক্ষেত্রে জন-

বিক্ষোভ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থীও হ'য়ে থাকে। এই কারণে প্রারম্ভেই উহাকে দমন করার প্রয়োজন হয়। কোনও কোনও জন-বিক্ষোভ স্বার্থ প্রণোদিত নেতাদের দ্বারা সৃষ্ট হ'য়ে উহা তার নিজের বা দলের প্রয়োজনে চালিত হয়েছে এবং এতদ্বারা ঐ সকল উত্তেজিত জনগণ নিজেদের এমন কি সমগ্র জাতিরও ক্ষতি সাধন করেছে। শুধু তাই নয় বহু জীবন এবং ব্যক্তিগত ও সরকারী সম্পত্তিও এই সময় অকারণে এরা বিনষ্ট করে জাতীয় সম্পত্তির হ্রাস ঘটিয়েছে।

এইখানে আমরা মাত্র জন-বিক্ষোভ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই জন-বিক্ষোভ বহু প্রকারের হ'য়ে থাকে। নিম্নের তালিকাটী হ'তে বক্তব্য বিষয় সম্যক রূপে বুঝা যাবে।



জন-বিক্ষোভে কারণে ও অকারণে নানা শ্রেণীর বা জাতির সমাবেশ হয়ে থাকে। এইজন্য প্রথমে উহার স্বরূপ ও গঠন সম্বন্ধে বলা দরকার। প্রথমে জনতার গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করবো। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে কোনও এক উত্তেজনা পূর্ণ বা চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর ভোর ছয়টা হতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত জনতা একই স্থানে অবস্থান করছে। সাধারণ ভাবে মনে হ'যে যে এই এতগুলি লোকের কি পরিবারবর্গ বা কাজ কর্ম্ম নেই।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তারা সকলেই একস্থানে অতক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে নি। দুই একজন করে ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে চলে গিয়েছে এবং দুই একজন নূতন লোক এসে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। একই প্রকার আদর্শ ও তার সুর বা রেশ নিয়ে জনতা একইস্থানে দাঁড়িয়ে থাকলেও মুহুর্মুহুঃ বা মধ্যে মধ্যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সময় সময় এই পরিবর্ত্তন এত ধীরে ধীরে ঘটে যে তা আমাদের সুস্পষ্ট রূপে চোখে পড়ে নি। এই পরিবর্ত্তন অতি ধীরে সমাধা হয় বলে পরিবর্ত্তিত জনতার আদর্শ ও উদ্দেশ্য একই রূপে থেকে যায়। এর কারণ বুঝতে হ'লে আমাদের জনতার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। জনতার গঠন সম্বন্ধে বলা হলো এইবার জনতার প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধে বলবো। যে অকাজ মানুষ একজনে বা দশজনে মিলে করতে পারে না, শত জনে মিলে তা তারা সহজেই করে ফেলে, কারণ তারা তখন বিবেক বিবর্জ্জিত পশুসুলভ প্রবৃত্তি লাভ করে। জনতার অংশ বিশেষ প্রতিটী মানুষের কোনও পৃথক সত্তা তখন আর থাকে না, জনতা তখন বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে দানব প্রকৃতির একক মানুষের ন্যায় ব্যবহার করে থাকে। এই সময় তারা পরস্পর পরস্পরকে গণ-বাক্-প্রয়োগ (Mass suggestion) দ্বারা ক্ষিপ্ত করে তুলে এবং তারা তখন পশুর মতনই বিচারবুদ্ধিহীন ও নিষ্ঠুর হয়ে অভাবনীয় ভাবে অপরাধ মূলক কার্য্য করে। গণ-বাক্-প্রয়োগ বা মাস্ সাজেসসন মানুষের অন্তর্নিহিত আদিম অপস্পৃহার একটী বিশেষ প্রমাণ। জনসভায় বহুলোক একত্রিত হয়ে যখন আলোচনা করে তখন প্রায়ই একজন অন্য জনের কথা শুনা মাত্রই তা বিশ্বাস করে এবং তাদের মন তখন সেই অনুসারে কাজও করতে চায়। এই কারণে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় জন-সভা আহ্বান নিষিদ্ধ হয়ে থাকে।

এই সম্পর্কে জনতার চিত্ত-প্রস্তুতির কথাও বলা যেতে পারে। ধর্ম্মঘট

জনিত অপরাধ সকল এইরূপ চিত্ত-প্রস্তুতির প্রত্যক্ষ ফল। শান্তিপূর্ণ ভাবে শ্রমিকরা কাজ করে চলেছে। হঠাৎ তারা একজোটে কর্ম্মত্যাগ করে ম্যানেজারকে নিহত করল। ঘটনাটী বাহ্যতঃ একদিনে সঙ্ঘটিত হলেও অপরাধীদের গণ-চিত্ত এর জন্য বহুদিন ধরে প্রস্তুত হয়েছে। অভাব ও অভিযোগ জনিত আক্রোশ বহুদিন ধরে এদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। অভাব ও অত্যাচার জনিত আক্রোশ বহুদিন ধরে তাদের চিত্তমধ্যে সঞ্চিত হচ্ছিল। বারুদের স্তূপ চাইছিল অগ্নি-সংযোগ। এই সময় কোনও নেতা এসে তাদের সাহস দিলে বা উত্তেজিত করলে, তারা একদিনেই অপরাধমুখী হয়ে উঠবে।

এই চিত্ত-প্রস্তুতি বহুক্ষেত্রে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসমতার জন্যে কিংবা রাজনৈতিক কারণেও গড়ে উঠে। তবে এইরূপ কারণে সঙ্ঘটিত দুর্ঘটনার সংখ্যা এখনও সকল দেশেই অত্যল্প।

এই সকল কারণে প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত বা জাতিগত প্রতিটী বৈধ-অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকা উচিত হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, আজ যাহা মাত্র দশ জন ব্যক্তির চিন্তার বিষয়, কাল তাহা শত জনের এবং পরশু সহস্র জনের চিন্তার বিষয় হ'তে পারে। আজ যাহা দশ জন মানুষ সমাধা করল, দশ বৎসর পরে সেই কাজ করবে সহস্র জন মানুষ। এইজন্য আমাদের প্রতিটী কার্য্য আজ হতেই ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। ভুলে গেলে চলবে না যে আজ যারা অর্দ্ধেক পেলে সন্তুষ্ট, কাল তারা পুরাই চেয়ে বসবে। যদি তাকে তার প্রাপ্য অর্দ্ধেক আজই না দেওয়া হয়।

উপরোক্তরূপ বৈধ কারণ ব্যতীত অবৈধ কারণেও জন-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এই জনতাকে দমন করতে বাধ্য।

এইবার কিরূপে এই সকল জন-বিক্ষোভ দমন করা যেতে পারে সেই

সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই সম্বন্ধে বহু রক্ষী বহু প্রকার মতামত প্রকাশ করে থাকেন। এই সকল মতামতের প্রত্যেকটী নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

(১) কাহারও কাহারও মতে বহু সংখ্যক সশস্ত্র শাস্ত্রীসহ অবৈধ জনতার সম্মুখীন হওয়া উচিত হবে। এঁদের মতে এই ভাবে ভীতি প্রদর্শন দ্বারা প্রথমেই তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া ভাল। জনতা মাত্রই সাধারণতঃ শক্তের ভক্ত, নরমের যম হ'য়ে থাকে। আপাতঃদৃষ্টিতে এরা সাহসী মনে হ'লেও প্রকৃতপক্ষে এদের অনেকেই ভীতু প্রকৃতির। এঁদের মতে বহু সংখ্যক শাস্ত্রীসহ অগ্রসর হ'লে অকারণে উভয় পক্ষীয়দেরই মধ্যে হতাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম। এঁদের মতে স্বল্পসংখ্যার কারণে শাস্ত্রীদের মধ্যে কেহ হতাহত হ'লে সাধারণ ভাবে রক্ষীকুলেরও মনোবল ভেঙ্গে পড়তে পারে, উপরন্তু অবৈধ জনতার মনোবল বেড়ে গিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা দূর দূর স্থানেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

(২) এঁদের অন্যান্য ব্যক্তিরা বলেছেন যে, প্রথমেই বহু শাস্ত্রীসহ অকুস্থলে গেলে জনতার শান্ত অংশটীও উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। বরং স্বল্প সংখ্যক শাস্ত্রীসহ ঘটনাস্থলে গেলে রক্ষীপুঙ্গবগণ জনতার শান্ত অংশকে বুঝিয়ে পথ হ'তে তাদের ভীড় সহজেই সরিয়ে দিতে পারবে। এমন কি জন-বিক্ষোভ দমনার্থে তাঁরা বহু ভদ্র ব্যক্তির সক্রিয় সাহায্য পেলেও পেতে পারেন।

[এঁদের কেহ কেহ এ'ও বলেন, যে সাধারণ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় বহু সংখ্যক রক্ষীসহ ঘটনাস্থলে এসে প্রথমেই আঘাত হেনে (সতর্ক করে দেওয়ার পর) এদের যা কিছু প্রচেষ্টা তা অঙ্কুরেই বিনাশ করা ভাল; কিন্তু রাজনৈতিক বিক্ষোভের সময়ে ক্ষেত্র বিশেষে সমুদয় শাস্ত্রী রাজপথ হতে সরিয়ে এনে ইহার ফলাফল দেখলে মন্দ হয় না। এই

ক্ষেত্রে তারা যা কিছু অনাচার ও অত্যাচার করবে তা সমগ্রভাবে জনসাধারণের বিরুদ্ধেই যাবে। এই অবস্থায় জনমত সহজেই এদের বিরুদ্ধে বিরূপ হ'বে এবং তারা সক্রিয় ভাবেপরদিন হ'তে এদের দমনে শান্ত্রী দলের সহায়ক হ'বে। এমন কি এরা তারস্বরে শান্ত্রীদলকে এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্যে চীৎকার সুরু করে দেবে। এ'ছাড়া এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা বুঝা যাবে এরা কত দূর পর্য্যন্ত বাড়তে পারে এবং এদের সংঘটন শক্তিই বা কিরূপ। এই সময় ছদ্মবেশী পুলিশ বা গোয়েন্দাদের পথে বার করে দিলে তারা এদের কার্য্যকরণ ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে বহু সংবাদ অলক্ষ্যে সংগ্রহ করে আনতে পারবে। কিন্তু অধিকাংশ বহু রক্ষীকুল এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কর্ত্তব্যচ্যুত হওয়া আদপেই পছন্দ করেন নি। এঁদের মতে এরা অবলীলাক্রমে বিনা বাধায় সাধারণের ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করবে এবং রক্ষীকুল তা নির্ব্বিকার চিত্তে দেখবে; এ আবার কোন দেশীয় কথা।]

এই উভয় ব্যবস্থাই অবস্থা ভেদে অবলম্বন করা চলে। কিন্তু সব কিছু নির্ভর করে জনতার প্রকৃতি ও সংঘটনের উপর। আমার মতে উত্তেজনার সময় জনতার সহিত বুঝা-পড়া করা নিরর্থক। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে বুঝাতে গিয়ে বৃথা তর্ক-বিতর্কের স্থষ্টি হয়েছে। এই ক্ষেত্রে জনতার ধারণা হয়েছে যে ইহা পুলিশের উদারতা নয়, ইহা তাদের দুর্ব্বলতা। এদের মধ্যে যারা গোলমাল বাধাবার জন্যে দলবেঁধে সেখানে উপস্থিত হয়েছে, তারা এই সুযোগে ভীড়ের অপরাপর লোকদের মিথ্যা গুজবাদি দ্বারা অধিকতর উত্তেজিত ক'রে দিতে পেরেছে। এইজন্য বহু অফিসার বলে থাকেন বিতর্ক না ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে জনতাকে এক স্থানে ভীড় করতে না দেওয়াই ভাল। এঁদের মতে কথা কইলে জনতা মনে করে এরা মার-মুখো নেসিন তা'হলে

নয়, এরা তাদের মতই সাধারণ মানুষ। অতএব এদের অতটা ভয় না করলেও চলে। দূর হতে মানুষ মানুষকে সমীহ ভক্তি বা ভয় করে, কিন্তু নিকট সান্নিধ্য সেই সেরিমোনিয়াল ভয় ভেঙে দেয়। এই জন্যে ওদের মতে যে দৌবারিক সে হাত-জোড় করলে শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। এ'ছাড়া দেশের আইন তাকে হাত জোড় করার অধিকারও দেয় নি; বরং দেশের আইন তাকে নির্ম্মম ভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করতে বলেছে। তবে এইটুকু সর্ব্বদাই দেখা দরকার যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলপ্রকাশ যেন কদাচ করা না হয়।

জনতার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে রক্ষীদের মনে রাখতে হ'বে যে উহাদের মধ্যে চারি শ্রেণীর মানুষ আছে, যথা—(১) গুণ্ডা প্রকৃতির দলবদ্ধ মানুষ, যারা কুমতলব নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। (২) নির্লিপ্ত দর্শক, যারা কেবল মজা দেখবার জন্যে সেখানে জড় হয়েছে। (৩) সাধারণ পথচারী, যারা যাতায়াতের পথে সেখানে এসে আটক পড়ে গিয়েছে। (৪) গুণ্ডাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল স্থানীয় বা পথচারী জনতা। এইজন্য জনতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হ'লে প্রথমে ভীতি প্রদর্শন বা তাড়া ক'রে কিংবা বুঝিয়ে সুঝিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে নির্লিপ্ত জনতাকে এবং বন্ধু ভাবাপন্ন মানুষদের ঐ স্থান হতে সরিয়ে দেওয়া কিংবা শাস্ত্রী দ্বারা কর্ডন তৈরী ক'রে তাদের গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদের নিকট হ'তে পৃথক ক'রে রাখা।

এই সময় রক্ষীদের অপর কর্ত্তব্য হ'বে 'চীৎকার ও কার্য্যকরণ' হ'তে জনতার মধ্যে কে কে গুণ্ডা প্রকৃতির বা নেতা তা লক্ষ্য করা। এর পর একদল রক্ষীর উচিত অতর্কিতে অগ্রসর হ'য়ে ঐ সকল নেতাদের পাকড়াও ক'রে ফেলা এবং অপর একদল রক্ষীর উচিত অচিরে তাড়া ক'রে তাদের সাজপাঙ্গদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া। উপস্থিত রক্ষীদের

তৃতীয় ও অপরাপর দলের উচিত হ'বে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে থেকে লক্ষ্য করা, ছত্রভঙ্গ আইন-ভঙ্গকারিগণ পশ্চাদপসরণের সময় জনসাধারণের সম্পত্তি প্রভৃতির কোনও ক্ষতি ক'রে যাচ্ছে কি'না। রক্ষীকুলের এই অবস্থায় অপর কর্ত্তব্য হবে ধৃতিকৃত অপরাধীদের ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে ঘটনাস্থল হ'তে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া। মারমুখী বা আইন-ভঙ্গকারী জনতা ছত্রভঙ্গ করার পূর্ব্বে অবশ্য আইনানুযায়ী তাদের সতর্ক ক'রে দেওয়ার রীতি আছে।

এইবার সহজে ও স্বল্প সংখ্যক শাস্ত্রীর সাহায্যে সুবৃহৎ জনতা ছত্রভঙ্গ করবার কয়েকটী বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করবো। মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে হলে শাস্ত্রীদলকে জনতা হ'তে প্রথমে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর পর সাবধানে দূর হতে লক্ষ্য করতে হ'বে জনতার সংগঠন। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে জনতার কয়েকটী অংশ থাকে দৃঢ়চিত্ত, সাহসী ও বেপরোয়া। আবার উহাদের কয়েকটী অংশ থাকে দোদুল্য-চিত্ত ও ভীরু প্রকৃতির। জনতার উত্তেজিত ও বেপরোয়া অংশকে প্রথমে আঘাত করলে তারা আরও বেপরোয়া হ'য়ে প্রতি-আক্রমণ করবে। কারণ এইরূপ এক অঘটন সমাধা করবার জন্যে তারা তাদের চিত্ত পূর্ব্ব হ'তেই প্রস্তুত ক'রে রেখেছে। এই অবস্থায় এদের এই অত্যদ্ভুত সাহস দেখে জনতার ভীরু অংশের মনোবল প্রবল হ'য়ে উঠবে। কিন্তু শাস্ত্রীদল যদি জনতার এই ভীরু অংশের উপর প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তা'হলে তারা তৎক্ষণাৎ পলায়নপর হ'বে। কারণ তাদের চিত্ত সর্ব্বদাই পলায়োন্মুখ হয়েই আছে; এবং জনতার এই অংশকে সহসা পলায়ন করতে দেখে উহার সাহসী অংশের মনোবল এমনিই ভেঙ্গে পড়বে যে তাদেরও মন তখন ঐ একই রূপে পলায়ন ক'রতে চাইবে। এইরূপ বৈজ্ঞানিক পন্থায় অতীতে

স্বল্প সংখ্যক 'অরগ্যানাইজড্' শাস্ত্রীদলের সাহায্যে সহস্র সহস্র জনতাকে নিমিষে হতাহত ব্যতীরেকে দূরীভূত করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

জনতা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে বলপ্রয়োগ করা মাত্র বা তা করবার উপক্রম করা মাত্র তাদের উপর আঘাত হানা প্রয়োজন। জনতা একবার পশুসুলভ মনোবৃত্তির অধিকারী হ'লে এক মাত্র আঘাত হেনেই তাদের প্রকৃতস্থ করা সম্ভব। অন্যথায় তাদের নিকট হতে দূরে সরে আসতে হবে যতক্ষণ না তাদের সদ্য আহৃত পশু-প্রবৃত্তি বা অপস্পৃহা সময়ের ব্যবধানে অন্তর্মুখী হয়ে তাদের নিরাময় করে দেয়। প্রথমে জনতার কয়েকজন মাত্র বলপ্রয়োগ সুরু করে এবং অপর কয়েকজন বলপ্রয়োগে উন্মুখ হয়ে থাকে এবং তা তারা করে সাময়িকভাবে তাদের ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্ন (uplit up) হয়ে যাওয়ার জন্যে ; অর্থাৎ তারা এই সময় সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের অপর আর এক মানুষ হয়ে যায়। অতর্কিত আঘাত বহুক্ষেত্রে ত্বরায় তাদের স্বাভাবিক সম্বিত ফিরিয়ে দিয়েছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা বাধাপ্রাপ্ত না হ'লে ধীরে ধীরে জনতার দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর বহু ব্যক্তিও তাদের অপস্পৃহা ও পশুপ্রবৃত্তি বহির্মুখা করে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষে পরিণত হয়ে পূর্ব্বগামীদের ন্যায় অনুরূপ অপকর্ম্ম সুরু করে দেয়। আমার মতে এইরূপ একই প্রকার অবস্থায় সমগ্র জনতা উপনীত হবার পূর্ব্বেই রক্ষীদের উচিত পূর্ব্বোক্ত প্রথম দলীয় ব্যক্তদের অতর্কিতে আঘাত হানা। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দলীয় ব্যক্তিগণ আরও বিক্ষুব্ধ ও বিরূপ হয়ে উঠলেও তাদের আদিম পশুপ্রবৃত্তি বা অপস্পৃহা পূর্ব্বগামীদের ন্যায় অত প্রকট হয়ে উঠবার সময় পায় না। এই ক্ষেত্রে তারা স্বাভাবিক মানুষের ন্যায় ভীত ত্রস্ত ও পলায়ন-পর হয়ে উঠবে। তবে এদের কেহ যদি চিত্ত প্রস্তুতির সহিত কোনও একটী আদর্শ দ্বারা প্রণোদিত হয়ে জনতার মধ্যে উপস্থিত হয় তা' হলে সে কথা স্বতন্ত্র ; কিন্তু এইরূপ

ব্যক্তির সংখ্যা জনতার মধ্যে অতি কমই থাকে। বরং জনতার মধ্যে এমন বহু ব্যক্তি থাকে যারা কেবল মাত্র নির্ব্বল বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য সেখানে এসেছে। বলপ্রয়োগ কিংবা উচ্ছৃঙ্খলতা তারা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে পছন্দ করে না।

বিক্ষোভ প্রদর্শক জনতা লাঠি-সোঁটা, ইট-পাটকেল প্রভৃতি দ্বারা বলপ্রয়োগ করলে, উপরোক্ত উপায়ে কেবল মাত্র মৃদু বা গুরু যষ্টি চালনা দ্বারাই তাদের ছত্র-ভঙ্গ করা সম্ভব। কিন্তু জনতা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করলে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারাই তাদের ছত্র-ভঙ্গ করা প্রয়োজন। তবে রক্ষীদের তরফ হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটী মাত্র গুলিও আগ্নেয়াস্ত্র হতে নিক্ষেপ করা উচিত হবে না। এই জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গুলি প্রয়োজন মত ক্ষেপে ক্ষেপে নিক্ষেপ করা উচিত। জনতা নীরব বা পলায়নপর হওয়া মাত্র রক্ষীদেরও আত্মসংবরণ করা প্রয়োজন। জনতার কেহ রক্ষীদের কাহারও ব্যক্তিগত ভাবে শত্রু বা মিত্র নয়। ব্যক্তিগত ভাবে আত্মরক্ষার্থে কিংবা সাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার্থে তারা প্রতিবল প্রয়োগ করেছে মাত্র। এই জন্যে এদের একদলের উচিত পলায়নপর জনতাদের মধ্য হতে বাছা বাছা কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা এবং তাদের অপর এক দলের উচিত অতি দ্রুত আহতদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে তাদের জীবন রক্ষা করা। গুলি চালানোর প্রয়োজন হ'লে অতি নিকট হতে চালানো উচিত হবে না। কারণ এই ক্ষেত্রে জনতার যে অংশে গুলি করা হয় সেই অংশ কথঞ্চিৎ নড়ে উঠে মাত্র উহাদের বাকি অংশ গুলি বর্ষণের কোনও এফেক্ট উপলব্ধি করতে পারে না। তারা আরও উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এসে স্বল্প সংখ্যক রক্ষীদের পর্য্যুদস্ত করে দিতে পারে। এই কারণে গুলি চালাবার প্রয়োজন হ'লে জনতা হতে বহু দূরে পিছিয়ে এসে তা করা উচিত। এইরূপ

অবস্থায় সমগ্র জনতা গুলি চালানোর একেক্ট সমগ্র ভাবে উপলব্ধি করে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়ে থাকে। অবশ্য ইতিমধ্যে আত্মরক্ষার্থে যদি আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা' হ'লে সে কথা স্বতন্ত্র। জনতাকে যদি বিরাটাকার এবং সশস্ত্র ও ক্ষিপ্ত দেখা যায় এবং অকুস্থলে যদি মাত্র কতিপয় সশস্ত্র শান্ত্রী থাকে তা' হ'লে পর্য্যুদস্ত হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য তাদের উচিত হবে ব্যবস্থা অবলম্বন না করে দূরে সরে যাওয়া কিংবা সাহায্যকারী আরও শান্ত্রিদল না আসা পর্য্যন্ত সাবধানে নিকটে বা দূরে অপেক্ষমান থাকা। এই সম্পর্কে রক্ষীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে রক্ষিগণ নিজেরা যাতে বহুসংখ্যায় নিষ্প্রয়োজনে হতাহত না হয় তা'ও বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেখা উচিত বলে আমি মনে করি। এই জন্য অন্ধকার হয়ে এলে বা রক্ষীরা সংখ্যায় স্বল্প হ'লে, রক্ষীবাহিনীকে সাময়িকভাবে নিরাপদ স্থানে (প্রয়োজন বোধে) সরিয়ে আনার রীতি আছে; কারণ স্বল্প সংখ্যক রক্ষীগণ ক্ষিপ্ত জনতাকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম হ'লে দুর্ব্বৃত্তদের দ্বারা জন-সাধারণের পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগকারী সশস্ত্র বোমারু জনতাকে কেবল মাত্র যষ্ঠি ও গ্যাস সেলের সাহায্যে প্রতিরোধ করার প্রয়োজন হয়। এই ক্ষেত্রে রক্ষীদের নিজেদেরও সংঘর্ষের কারণে আহত হতে হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণ রক্ষীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য রক্ষিপুঙ্গব বা অফিসারদের উচিত সাধারণ রক্ষীদের সম্মুখভাগে থেকে অগ্রসর হওয়া। আমার মতে নেতৃপদবাচ্য রক্ষীদের আগ্নেয়াস্ত্র ধারী রক্ষীদের পশ্চাতে থেকে এবং যষ্ঠি ও গ্যাস সেলবাহী রক্ষীদের সম্মুখে থেকে তাদের পরিচালনা করা উচিত। এইরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র রক্ষীবাহিনী তাদের নেতাদের তাদের মতই সাহসী ও কর্ত্তব্য পরায়ণ

মনে করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে। এইরূপ অভিযানের সময় ফাষ্ট ইন কমাণ্ড আহত হ'লে যাতে সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড তাদের পরিচালনার ভার ত্বরায় গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্নেই করে রাখা উচিত। এ'ছাড়া রক্ষীবাহিনীর চিত্ত প্রস্তুতির কারণে পূর্ব্বাহ্নে তাদের মন বা চিত্তকে সম্ভাব্য বিপদ ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা সচেতন করে রাখা ভালো। এইরূপ ক্ষেত্রে তাদের মন অতর্কিতে কোনও অপ্রত্যাশিত আপদের সম্মুখীন হয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভেঙ্গে পড়বে না।

বহু ক্ষেত্রে বে-আইনি জনতা বা কোনো শোভা যাত্রা আইনানুযায়ী ভেঙ্গে দেওয়ারও প্রয়োজন হয়েছে। এই শোভাযাত্রা বা জনতাকে (ক্ষেত্র বিশেষে) অনুসরণ করে এগিয়ে এসে এমন এক স্থানে তা ভেঙ্গে দেওয়া উচিত, যে স্থান জনবহুল নয় এবং যে স্থানে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি অধিক সংখ্যায় বর্ত্তমান নেই। কোন এক স্থানে বে-আইনি জনতা ভেঙ্গে দিতে হ'লে তাদের পশ্চাদপসরণ ও পলায়নের পথ পূর্ব্বাহ্নেই বন্ধ করে রাখা ভালো। জনতা যদি বোঝে যে বড় রাস্তা হতে নির্গত অলি-গলির সম্মুখের বা পশ্চাতের মুখে সিপাহীশান্ত্রী মোতায়েন আছে তাহ'লে তারা পলায়নের পথের অভাবে রক্ষীদের সহিত অযথা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। বে-আইনি জনতার নেতারা পূর্ব্বাহ্নেই রক্ষীদল উপরোক্ত রূপ ব্যবস্থা করেছে জেনে বহু ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত স্থানে বে-আইনি জনতা সৃষ্টি করতেই সাহসী হয় নি। কারণ তারা জানে যে একবার বিফল হ'লে তাদের অনুচরদের মনোবল এমনই ভেঙ্গে পড়বে এবং জনসাধারণের মধ্য হতেও তখন আর কেউই তাদের অনুসরণ করতে রাজী হবে না। অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে সম্মুখ হতে প্রতি-আক্রমণ করে জনতাকে সহজে দমন করা যায় নি, কিন্তু এই সময় মাত্র

কয়েকজন রক্ষীকে মোড় ঘুরে জনতার পশ্চাদ্দেশে পাঠানো মাত্র তারা পলায়নপর হয়েছে।

রাজনৈতিক বিক্ষোভকারীদের দমন করতে হ'লে তাদের সৃষ্ট বে-আইনি জনতার স্বরূপ প্রথমে উপলব্ধি করা উচিত। এইরূপ জনতার মধ্যে এরা বর্ণচোরা বহু সুশিক্ষিত সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কর্ম্মী পাঠিয়ে দিয়ে থাকে। এই সকল কর্ম্মীদের মধ্যে যারা নিরস্ত্র তারা শোভাযাত্রা ও বে-আইনি সভার মধ্যে আত্মগোপন করে সাধারণ মানুষকে নানা মিথ্যা কাহিনী শুনিয়ে উত্তেজিত করে। এবং তাদের অপর একটী দল সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে বোমা পটকাসহ পথের ভিড়ের মধ্যে বা আশে পাশে বা নিকটে ও দূরে আত্মগোপন করে থাকে যাতে পরে তারা সভাভঙ্গকারী রক্ষীদের উপর সুযোগ মত তা নিক্ষেপ করতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষীদের উচিত হবে যে, অবস্থাভেদে ছদ্মবেশী রক্ষীদের এদের ভিতর প্রেরণ করে এদের স্পট্-আউট করে সুবিধামত পূর্ব্বাহ্নে এদের গ্রেপ্তার করে ফেলা বা তাদের উপর কড়া নজর রাখা, যাতে হাত উঠানো মাত্র তাদের নিরস্ত্র করা বা গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থা এমন সাবধানে সমাধা করতে হবে যাতে স্বপক্ষীয় উর্দ্দিপরিহিত রক্ষীদের দ্বারা তারা নিজেরাই নিগৃহীত বা আহত না হয়। রাজনৈতিক অপদল-সৃষ্ট বিক্ষোভ বানচাল করতে হ'লে রক্ষীদের বহুবিধ বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শনের প্রয়োজন আছে। এই সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিটী প্রণিধানযোগ্য।

"অমুক পার্কের মধ্যস্থলে মাত্র কতিপয় নেতাকে তাদের অনুচরসহ বে-আইনি সভা করতে দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে দূরে অদূরে ও আশে পাশে ছদ্মবেশী কয়েকজন বোমারু যুবক অপেক্ষা করছে। রক্ষিগণ পার্কের মধ্যস্থলে এসে নেতাদের গ্রেপ্তার করবার জন্য অগ্রসর হওয়ামাত্র তারা এ সব অস্ত্ররক্ষীদের উপর নিক্ষেপ করবে। এই জন্য

আমরা দুইজন করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দুইদিকে অগ্রসর হ'লাম, যাতে দুর্ব্বৃত্ত নিক্ষিপ্ত পটকা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। ধীরে ধীরে একত্রে অগ্রসর না হওয়ায় ও সহসা ছুট দিতে থাকায় তাদের নিক্ষিপ্ত সব কয়টী পটকাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। এর পর নেতাদের নিকট নিরাপদে আমরা উপস্থিত হ'লে তারা নেতাদের নিরাপত্তার জন্য আর পটকা নিক্ষেপ করতে পারে নি। কয়েকজন কর্ম্মী ও তাদের নেতাদের সহিত রাজপথে ফিরে আসবার সময় ঐ একই কারণে তারা ঐরূপ অপকর্ম্ম আর করে নি।"

[কোনও কোনও রক্ষী বলেন যে একাকী ইতস্ততঃ মোতায়েন না থেকে রক্ষীদের পথের মানুষদের মধ্যে বিচরণ করা ভাল, কারণ তাহ'লে পথচারীদের আহত করার দায় এড়ানোর জন্য দুর্ব্বৃত্তরা রক্ষীদের উপর পটকা না ফেলতেও পারে। কিন্তু অপরাপর রক্ষিগণ বলেন—এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দুর্ব্বৃত্তরা কমক্ষেত্রেই দিয়েছে। তাঁদের মতে গোলমালের সময় নির্লিপ্ত দর্শকদের পথে ভিড় করতে না দিয়ে তাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের দুর্ব্বৃত্তদের হতে পৃথক করা ভাল। এই জন্য পূর্ব্বাহ্নেই তাদের বুঝিয়ে বা জোর করে সরিয়ে দেওয়াই উচিত।]

বিক্ষোভকারিগণ স্বল্প সংখ্যক হ'লে রক্ষীদের উচিত হবে তাদের 'কর্ডন' করে বা ঘিরে ফেলে জনসাধারণ হতে পৃথক করে রেখে একে একে তাদের গাড়ীতে তুলে গ্রেপ্তারের কারণে বা অন্য কোনও ব্যবস্থার জন্যে ত্বরিতগতিতে অকুস্থল হতে সরিয়ে নেওয়া। অন্যদিকে যদি বিক্ষোভ-কারীরা মাঝারি সংখ্যক হয় তা'হলে রক্ষীদের উচিত হবে প্রথমে তাদের নেতৃস্থানীয় ও উত্তেজিত সদস্যদের গ্রেপ্তার করে সরিয়ে এনে সমগ্রভাবে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে বাকি সকলকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া। অধিক সংখ্যক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে বৃথা হায়রানি না হওয়াই ভাল,

কারণ তাদের অনেকেই সাময়িক উত্তেজনার কারণে অকুস্থলে আসে এবং পরদিনই নানা কারণে তারা তাদের মত ও পথ বদলে ফেলে। এইরূপ এক ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে রক্ষীরা কিছুক্ষণ ধীরভাবে লক্ষ্য করে জেনে নেন বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কে বা কারা ব্যবহার ও চীৎকার দ্বারা বাকি লোকদের পরিচালিত করছে।

বলপূর্ব্বক বিক্ষোভকারীকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পর রক্ষীদের উচিত হবে বিভিন্ন স্থানীয় হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে অবগত হওয়া, সেখানে দাঙ্গাহত কোন দাঙ্গাকারী ভর্ত্তি হয়েছে কি'না। যদি কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামার মামলা রুজু করার প্রয়োজন হয় তাহ'লে এই সকল ব্যক্তিকে আসামীর পর্য্যায় ফেলা উচিত। কিন্তু এই সম্পর্কে রক্ষীদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হবে, ঘটনা সম্পর্কীয় একটী পূর্ণ বিবরণ তৎক্ষণাৎ কর্ত্তৃপক্ষ সমক্ষে পেশ করা বা অন্য কোনও উপায়ে ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করে দেওয়া।

রাজনৈতিক দাঙ্গা প্রভৃতি সম্বন্ধে বলা হ'ল, এইবার শ্রমিক বিভ্রাট ও তৎকর্ত্তৃক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্বন্ধে বলবো। বিবিধ প্রকার শ্রমিক বিভ্রাট ও ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে ইতিপূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। শ্রমিক বিভ্রাট প্রতিরোধ করতে হ'লে প্রথমে শ্রমিক বিক্ষোভের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। সাধারণতঃ শ্রমিকরা দুই শ্রেণীর নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। যথা,—(১) বহিরাগত কোনও না কোনও এক রাজনৈতিক দলভুক্ত নেতৃবৃন্দ এবং (২) নিজেদেরই ভিতরকার কর্ম্মরত শ্রমিক-কর্ম্মী নেতৃবৃন্দ। এদের যথাক্রমে বলা হয় বহির্নেতৃত্ব ও অভ্যন্তর-নেতৃত্ব। এই অভ্যন্তর-নেতারা সকল ক্ষেত্রেই বহির্নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় যে কোনও মিল বা ফ্যাক্টরীর শতকরা

নব্বইজন ব্যক্তিই নিজেদের কখনও সংঘবদ্ধ করতে পারে নি। এদের মধ্যে লড়াকু প্রকৃতির মাত্র শতকরা ত্রিশজন ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ নেতৃত্বাধীনে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ইউনিয়ন প্রভৃতি তৈরী করে থাকে। এবং এই শতকরা ত্রিশজন ব্যক্তি তাদের মতামত বাকি নব্বইজন ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা নির্বিশেষে তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়ে থাকে। যেহেতু অধিকাংশ ব্যক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে না, সেই হেতু তারা অল্পসংখ্যক সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তির আয়ত্তাধীনে থাকতে বাধ্য হয়। ধর্ম্মঘট সমূহে দেখা গিয়াছে যে, বহু শ্রমিকের মন এই সকল অনিশ্চিত ঝামেলায় যেতে চায় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘটে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। এই সকল ব্যক্তি সুযোগ সুবিধে পাওয়া মাত্র নেতাদের সংসগ ত্যাগ করে স্বাভাবিক কাজে যোগ দিয়েছে।

মালিক শ্রমিকের বিরোধ একান্তরূপে তাদেরই ঘরোয়া বিরোধ। পারতপক্ষে রক্ষীদের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। কিন্তু শ্রমিকগণ আইন-বিরুদ্ধ আচরণ বা কলকব্জা ধ্বংস করে জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি করলে বা তা করতে উদ্যত হ'লে রক্ষিগণ উহাতে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য। সাধারণ ভাবে সরকার নিযুক্ত লেবার কমিশনার কোনও ধর্ম্মঘট বে-আইনি বলে মত প্রকাশ না করলে কোনও মিটিং বা ষ্ট্রাইক প্রভৃতিতে রক্ষীদের হস্তক্ষেপ করার রীতি নেই, কিন্তু প্রয়োজন বুঝলে নিরাপত্তার জন্য ঐখানে শান্ত্রী মোতায়েন করা যেতে পারে।

আইন-ভঙ্গকারী শ্রমিকদের মিল বা ফ্যাক্টরী হতে সরিয়ে দিতে হ'লে প্রথমেই তাদের নেতাদের ঘটনাস্থল হতে যেরূপেই হউক সরিয়ে নিতে হবে। বহির্নেতারা বাহিরের ব্যক্তি বলে তাদের ঘটনাস্থল হতে সরিয়ে

দেওয়া সহজ, কারণ এই ক্ষেত্রে তারা ঐস্থানে অনধিকার প্রবেশ করেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। শ্রমিকদের কাউকে কার্য্য হতে বরখাস্ত করা হয়ে থাকলে তারাও অনধিকার প্রবেশকারীর পর্য্যায় পড়ে যাবে। রক্ষীদের প্রধান কর্ত্তব্য হবে শ্রমিকদের অভ্যন্তর বা অন্দর নেতাদের যথা সত্বর খুঁজে বার করা। এই বিষয়ে মালিক ও ম্যানেজারগণ রক্ষীদের প্রয়োজনীয় সংবাদ দিতে সক্ষম। অন্যথায় শ্রমিকদের বলতে হবে—আমি তোমাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তোমাদের মধ্য হতে ছয়জন বা দশজন ব্যক্তিকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও। এর পর তারা দশজন প্রতিনিধি যদি বেছে দেয় তা'হলে বুঝতে হবে ঐ দশজনই হচ্ছে তাদের বাছা বাছা অন্দর-নেতা। এই বহির্নেতা ও অন্দর-নেতাদের বেছে বার করে নিয়ে যাবার পর এদের লড়াকু বা 'মিলিটেণ্ট টাইপ' সদস্যদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এর পর স্বভাবতঃই বাকি শ্রমিকদের মনোবল ভেঙে পড়বে এবং সামান্য রূপ বলপ্রয়োগে উদ্যত হওয়া মাত্র তারা অতি সহজে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে।

[বহু ক্ষেত্রে শ্রমিক-সঙ্ঘের সেক্রেটারী বা নেতারা অবাধ্য ও অবুঝ শ্রমিকদের ভয়েও ধর্ম্মঘট করাতে রাজী হয়েছে। এই ক্ষেত্রে এরা গোপনে রক্ষী বা মালিকদের সাহায্যও করেছে। মনে রাখতে হবে যে বাহিরে এরা যতই রোক দেখাক না কেন এদেরও জীবন ও প্রতিপত্তি সর্ব্বদাই বিপন্ন থাকে। এই সম্পর্কে কোনও এক শ্রমিক সঙ্ঘের এক সেক্রেটারীর বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমি একদিন গোপনে ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি। এমন সময় দুর্ভাগ্য ক্রমে নিচে কয়েকজন লড়াকু অবুঝ শ্রমিক-কর্ম্মী এসে হাজির হ'ল। ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর

জন্য আমি ক্রোধের ভান করে উভয় হস্তের মুঠি দৃঢ় করে তর তর করে নেমে আসতেই এদের একজন আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বললো, কেয়া গাঙ্গুলী সাহেব, বাত কেয়া ? ম্যানেজার সাহেবসে আপ একলা মিলনে গিয়া কাহে ? আমি ততোধিক ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের এই প্রশ্নের উত্তর করলাম, কেয়া মিলনে গিয়া ? হাম ম্যানেজারকো গালি বকনে গিয়া। শুনা থে কয় আদমি কো উন বরথাস্ত করতা হ্যায়, ওহিকো বাস্তে। আভি বোলাও সব কইকে ইহিপর, যো যো বাত উহা হুয়া উ আভি বাতায়। হাম তু'লোক কো পাশই এহি বাস্তে আতা থি।"]

বিক্ষোভের পর দুই এক দিন মিল বা ফ্যাক্টারী বন্ধ রেখে বা শ্রমিকদের ছুটি দিয়ে, পরে তা খুলে তাদের নিকট হতে সৎ ব্যবহারের 'বণ্ড' নিয়ে তাদের একে একে মিলে ঢুকতে দেওয়া ভাল। এইরূপে বন্দোবস্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সহজেই বিতাড়িত করা সম্ভব হয়েছে।

জন-বিক্ষোভ দ্বারা ধনপ্রাণ বিপন্ন হ'লে প্রয়োজনবোধে আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগে উহা নিরোধ করা হয়েছে। এই আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ বা গুলি চালানোর রীতিনীতি সম্বন্ধে বহুবিধ মতামত আছে। কাহারও কাহারও মতে প্রথমে অযথা প্রাণনাশ না করে শূন্যে গুলি বর্ষণ করা উচিত। অন্যান্য রক্ষীরা বলেন সকল ক্ষেত্রে ইহা ফলপ্রসূ হয় নি। বরং এই সুযোগে নেতারা মিথ্যা বলে প্রচার করেছে যে, রক্ষিগণ তাদেরই দলের লোক তাই তারা শূন্যে গুলি বর্ষণ করলো। বহুক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে তারা ছুটে এসে স্বল্প সংখ্যক রক্ষীদের পর্যুদস্ত করে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিতে পেরেছে। এ'ছাড়া এমন বহু ব্যক্তি আছেন যারা বলেন যে প্রথমে পদযুগল লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করা ভাল। কিন্তু কেউ কেউ বলে থাকেন মৃত্যু ঘটাবার জন্যই গুলি করা উচিত, তা'

না হ'লে ঐরূপ পন্থা আদপেই গ্রহণ না করা ভাল। অঙ্গহানি করার চেয়েও মৃত্যু ঘটানো ভালো।

জন-বিক্ষোভে অংশ গ্রহণকারী মানুষ পরস্পর পরস্পরকে বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা কিরূপে ক্ষিপ্ত করে অমানুষ করে তুলে তাহা ইতিপূর্ব্বে বলেছি। এদের গ্রেপ্তার করে একত্রে একই হাজত ঘরে রাখলে বহু সময় পর্য্যন্ত তাদের মনের অবস্থা ঐরূপই থেকে গিয়েছে। কিন্তু তাদের এক একজনকে দল ছাড়া করে পৃথক পৃথক হাজত ঘরে পুরে দিলে দেখা যাবে যে তাদের সিংহ শাবকত্ব আর নেই। এইরূপ ক্ষেত্রে তারা ক্ষণিকের মধ্যে নিরীহ মেষে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এই সময় পরিবারবর্গের চিন্তা, ভয়-ভাবনা ও অনুশোচনায় তাদের মন অস্থির করে তুলেছে। তবে এদের মধ্যে যদি কেউ পূর্ব্বকল্পিতরূপে আদর্শ প্রণোদিত হয়ে এই কার্য্যে অগ্রসর হয়ে থাকে তাহ'লে সে'কথা স্বতন্ত্র। এইরূপ ক্ষেত্রে বাক্‌প্রয়োগ ও উপদেশ দ্বারা তারা যে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে তা বুঝিয়ে দিলে তবে সুফল ফলে।

বহুক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে বিক্ষোভকারিগণ বিনা বাধায় চেঁচিয়ে মনের যা কিছু গ্লানি নির্গত করে দিয়েও নিরাময় হয়ে গিয়েছে। এই সময় এদের অযথা ছত্রভঙ্গ না করে দিয়ে মনের সুখে চেঁচাতে দেওয়া উচিত হবে।

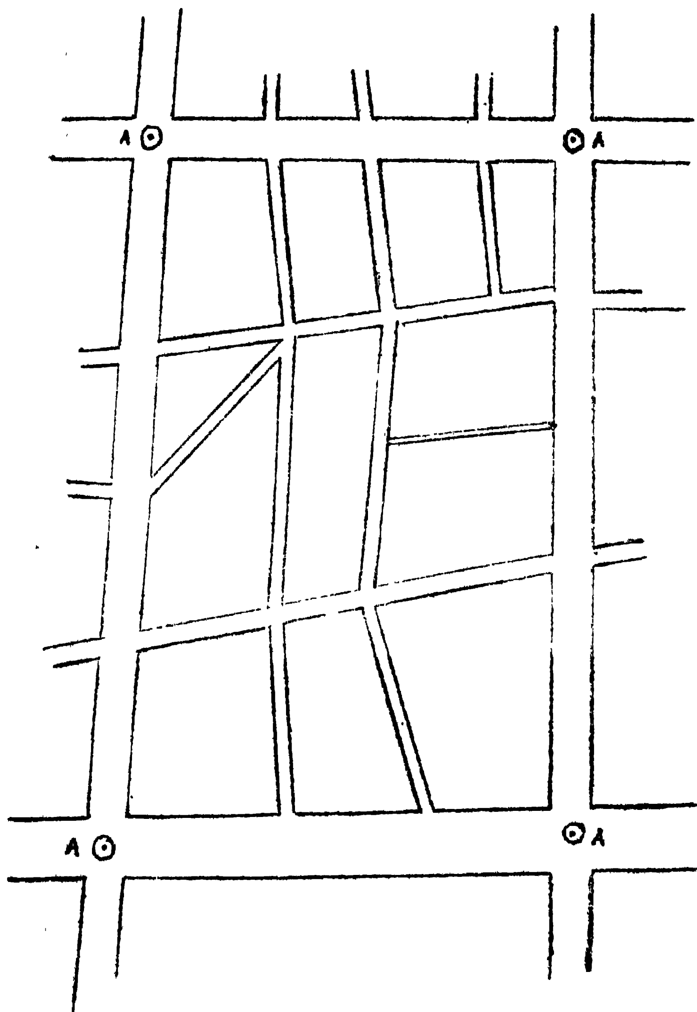
অপরাধ-নিরোধ—পাহারার দ্বারা

আমাদের দেশে যতপ্রকার অপরাধ আছে তার মধ্যে সাধারণ এবং সিঁদেল চুরীর সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। এর পরই সংখ্যার দিক হতে রাহাজানি ও ডাকাতি স্থান পেয়েছে। ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অপেক্ষা সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা বাহুল্য সকল দেশেই দেখা যায়। এইজন্য শেষোক্ত অপরাধের নিরোধের জন্য রক্ষিগণ অধিক মনোযোগ দিয়ে থাকেন। অপরাধ-নির্ণয় অপেক্ষা অপরাধ-নিরোধ যে শতগুণে শ্রেয়: তা সকলে স্বীকার করবেন। এতদ্বারা জনসাধারণ আর্থিক ক্ষতি ও মনোকষ্ট হতে যেমন অব্যাহতি পান তেমনি রক্ষীকুলও অযথা পরিশ্রম ও চিন্তা হতে রেহাই পেয়ে থাকেন। এ'ছাড়া বড় বড় শহরে চোরাই মাল চুরির অব্যবহিত পরেপাচার করে দেওয়া হয়ে থাকে। শত শত অসাধু স্যাকরা গহনা গলাবার জন্য দিবারাত্রি এখানে হাপর জ্বালিয়ে বসে থাকে। ক্ষণিকের মধ্যে উহা বড় সোনার তাল বা বাটের আকারে আত্মবিলীন করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উহা পেটিকাবদ্ধ হয়ে বৈধ চালানের পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে শত যোজন দূরে নীত হয়। এইরূপ বিভিন্ন কারণে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতির ন্যায় জনবহুল শহরে অপরাধ নির্নীত হওয়া সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। কিন্তু সামান্য প্রচেষ্টা দ্বারা রক্ষীরা বড় বড় শহরে অপরাধ-নিরোধ করতে সমর্থ হয়েছেন। ১০০টি চুরী হ'ল কিন্তু উহাদের মধ্যে ১০টি চুরীর কিনারা হ'ল, বাকি গুলির কোনও কিনারা হ'ল না; এই অবস্থা ভাল, না প্রতিরোধ ব্যবস্থার ফলে মাত্র ৩০টি চুরী একটী এলাকায় হল কিন্তু ঐ মাসে উহাদের একটীরও কিনারা হ'ল না এইরূপ ব্যবস্থা ভাল, তাহা বিবেচ্য। আমার মতে

প্রতিরোধ বা পাহারার দ্বারা শেষোক্ত ব্যবস্থার প্রচলনই সর্ব্বোত্তম। এইবার পাহারা ব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণী ও প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

পাহারা প্রথা তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) পাহারা, (২) টহল এবং (৩) সন্ধান। যে সকল সিপাহী রাস্তার মোড় বা কোনও ঘাঁটীতে একটী স্থানে মোতায়েন থাকে তাদের বলা হয় পাহারাদার সিপাহী এবং যে সকল সিপাহী কোনও রাজপথের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ টহল দিয়ে বেড়ায় তাদের বলা হয় টহলদারী সিপাহী। এতদ্ব্যতীত যে সকল সিপাহী কোনও একটী বিশেষ এলাকার অলিগলি আঁকাবাঁকা পথে বারে বারে ঘুরাফিরা করে তাদের বলা হয় সন্ধানী সিপাহী। এইরূপে আমরা দেখতে পাই যে 'পাহারাদার, টহলদার ও সন্ধানী', এই তিন প্রকারের সিপাহীদের দ্বারা মূলতঃ অপরাধ-নিরোধের কার্য্য সমাধা হয়ে থাকে। এই তিন প্রকার করণীয় কার্য্যের খবরদারী করবার জন্যে দারোগা, পরিদর্শক এবং অপরাপর অধস্তন ও উর্দ্ধতন রক্ষীপুঙ্গবগণ নিযুক্ত থাকেন।

পার্শ্বের নক্সা হতে বুঝা যাবে যে একটি বিশেষ এলাকার বা মহল্লার চতুর্দ্দিক ঘিরে চারিটি প্রধান রাস্তা আছে। এই প্রতিটি রাস্তার 'A' চিহ্নিত স্থান হতে 'A' চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত 'টহলদারী' সিপাহী রাত্রে টহল দিচ্ছে। এবং ঐ বিশেষ এলাকার চারিটী প্রান্তের রাস্তার মোড়ে 'O' চিহ্নিত স্থানে একজন করে পাহারাদার সিপাহী মোতায়েন আছে। এই সকল O চিহ্নিত বিশেষ কেন্দ্রকে ইংরাজীতে বলা হয় 'ফিক্সড্-পয়েন্ট'। এইরূপ এক ফিক্সড্-পয়েন্টে মোতায়েন পাহারাদার সিপাহীর নিকট পর্য্যন্ত এসে টহলদারী সিপাহিগণ পুনরায় ফিরে গিয়ে বিপরীত দিকের ফিক্সড্-পয়েন্ট বা স্থির-কেন্দ্রে মোতায়েন সিপাহীর নিকট পর্য্যন্ত পৌছুবে। এইরূপ ভাবে বারে বারে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে যাতায়াত করাকে বলা হয়


A
A
A
A

টহল দেওয়া। এই সকল টহলদারী রাজপথ অতীব দীর্ঘ হলে টহল কার্য্যের জন্ম দুইজন টহলদারী সিপাহী মোতায়েন করা হয়ে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে দুইজন টহলদারী সিপাহী রাজপথের প্রান্তদ্বয় হতে এসে উহার মধ্যস্থল পর্য্যন্ত পৌছিয়ে পুনরায় আপন আপন পথ-প্রান্তে ফিরে গিয়ে থাকে। কখনও এইরূপ দীর্ঘ রাজপথের মধ্যদেশেও একটি স্থির-কেন্দ্র স্থির করে ঐখানে একজন পাহারাদার সিপাহী মোতায়েন রাখা হয়েছে। এইরূপ পাহারার ব্যবস্থায় সুবিধে হয় এই যে ঐ চারিটী রাজপথের মধ্যবর্ত্তী এলাকায় বাহির হতে কোনও অপরাধী রাত্রে অপকার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। এবং যদিও বা তারা দৈবাৎ উহার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে কিংবা পূর্ব্ব হতে উহার ভিতর অবস্থান করে তা' হ'লেও তারা বহির্দেশে বামাল সহ ঐরূপ এক সুবেষ্টিত স্থান হতে বার হয়ে আসতে পারবে না। এইরূপ পন্থায় স্বল্প সংখ্যক রক্ষীদ্বারা একটী বিশেষ এলাকা সুবেষ্টিত করে রাখা সম্ভব। এই সকল কর্ত্তব্যরত সিপাহিগণ বা পল্লীরক্ষিগণ সন্দেহ হ'লে যে কোনও পথচারী বা নিশাচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেপ্তার করতে আইনতঃ সক্ষম। পরে অবশ্য তদন্ত করে নির্দ্দোষ বুঝলে তাদের মুক্তিদান করা যেতে পারবে। এইরূপ এক সুবেষ্টিত এলাকার মধ্যে যে সকল অলিগলি আছে সেই সকল পথে ও উপপথে সন্ধানী সিপাহিগণ এলোমেলো ভাবে বা চক্রাকারে ঘুরাফিরা করবার জন্মে তাদের এক এক জন বা একত্রে দুইজন ঐ বেষ্টনীর বিভিন্ন রাজপথে প্রবেশ করে উহার বিভিন্ন বহির্মুখ হতে বার হয়ে এসে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থায় বেষ্টনীর মধ্যবর্ত্তী এলাকায় কোনও অপরাধী বা সন্দেহমান ব্যক্তি অবস্থান করলে সন্ধানী সিপাহীরা তাদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে যে ভিতর হতে তাড়া খেয়ে অপরাধীরা নৈশবেষ্টনীর বহির্দেশে আসতে চেষ্টা করেছে এবং উহার ফলে

চারিবার এইরূপ দুর্ভোগ ভোগ করার পর অপরাধিগণ শহরের স্থান বিশেষের সন্নিহিত স্থানেও প্রবেশ করতে ভীত হয়ে উঠবে। এইরূপ বেষ্টনী তল্লাস দ্বারা ধৃতিকৃত সন্দেহমান ব্যক্তিদের কোতোয়ালীতে এনে তাদের বাছাই করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ নিরাপরাধী ব্যক্তিদের চরিত্র সম্পর্কে অনুসন্ধানের পর তাদের মুক্তি দিয়ে কেবল মাত্র অপরাধী ব্যক্তি-দেরই হাজতে আটক রাখা হয়েছে। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই গৃহহীন ও কর্ম্মহীন থাকে, এদের কেহ কেহ সিঁদকাটী প্রভৃতি যন্ত্রাদি-সহও ধরা পড়েছে। এই সকল ব্যক্তির অঙ্গুলির টিপ গ্রহণ করে রাজকীয় টিপ-ঘরে তাহা প্রেরণ করে রক্ষিগণ অবগত হয়ে থাকেন উহাদের মধ্যে কয়জন পুরানো পাপী আছে। বনানীর অংশ বিশেষ ঘেরাও করে যেমন হিংস্রজন্তুদের নিধন করা সম্ভব, তেমনি এই কোম্বিঙ্ বা বেষ্টনী ব্যবস্থা দ্বারা অপরাধীদের নির্ম্মূল করাও সম্ভব। এইজন্য এই বিশেষ পদ্ধতির খুঁটিনাটী সমূহ সযত্নে রক্ষী মাত্রেরই অবশ্য শিক্ষণীয়।

এক্ষণে একটি বিশেষ এলাকাতে যে বহু সংখ্যায় অপরাধ সমূহ সঙ্ঘটিত হয়ে চলেছে তাহা অবগত হবার রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করবো। অধুনাকালে ক্রাইম ম্যাপ বা অপরাধ প্রদর্শক নক্সা দ্বারা ইহা সম্যক রূপে অবগত হওয়া যায়। কোনও এক থানার এলাকায় কোনও অপরাধ সঙ্ঘটিত হওয়া মাত্র, যে বাটীতে বা পথে উহা সঙ্ঘটিত হ'ল থানার মানচিত্রে সেই স্থানে থানাদার একটি বিন্দু বা ডট্ প্রতিদিন অঙ্কিত করে দেন। ইহার পর এক সপ্তাহ এক পক্ষ বা এক মাসের পর ঐ মানচিত্র অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে উহার দুই এক স্থানে এইরূপ বিন্দুচিহ্নের ঝাঁক বেঁধে গিয়েছে, অর্থাৎ নিকটে নিকটে একই স্থানে বহু বিন্দু একত্রে চিহ্নিত হয়েছে, অথচ মানচিত্রের অন্যান্য স্থানে দূরে দূরে অবস্থিত মাত্র সামান্য কয়েকটি বিন্দু অঙ্কিত দেখা যায়। একস্থানে একত্রে

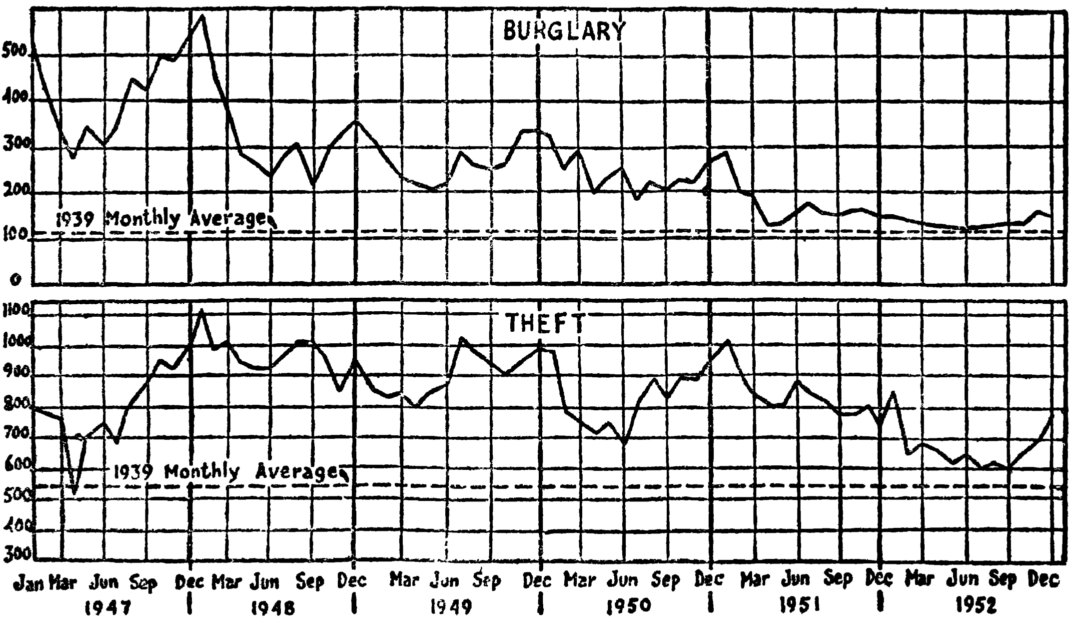
এক ঝাঁক বিন্দু দেখে রক্ষিগণ বুঝে নিয়ে থাকেন যে এই বিশেষ এলাকাতে অপরাধ সমূহ পুনঃ পুনঃ সজ্ঘটিত হয়ে আসছে। ইহা হতে আরও বুঝে নেওয়া হয় যে অপরাধিগণ এই বিশেষ এলাকাতে কোথায়ও তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেছে, কিংবা কোনও এক বিশেষ কারণে এই স্থানটী তারা তাদের অপরাধের কর্ম্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিয়েছে। এইরূপ অবস্থায় থানাদারগণ এই বিশেষ এলাকার চতুর্দ্দিক ঘিরে কেম্বিঙ্-এর ব্যবস্থা করে অপরাধ-নিরোধ করে থাকেন, এই সকল বিন্দু মানচিত্রে স্থাপনেরও বহু রীতিনীতি আছে। এক একটি বর্ণের বিন্দু স্থাপন দ্বারা রক্ষিগণ এক একটী অপরাধ বুঝাইয়া থাকেন, যথা—লোহিত বিন্দু দ্বারা সিঁদেল চুরি, কৃষ্ণ বিন্দু দ্বারা সাধারণ চুরি, পীত বিন্দু দ্বারা ডাকাতি, নীল বিন্দু দ্বারা রাহাজানি, সবুজ বিন্দু দ্বারা পকেটমার, বেগুনে বিন্দু দ্বারা মোটরাংশ বা মোটর চুরি, ধুসর বিন্দু দ্বারা শিশুর দেহ হতে ছিনতাই প্রভৃতি অপরাধ বুঝানো হয়েছে। এই সকল অপরাধের স্থান কাল ও স্বরূপ বুঝে রক্ষিগণ প্রয়োজন মত 'অপরাধ-নিরোধ' মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন। এতদ্ব্যতীত শীতকালে প্রথম রাত্রে এবং গ্রীষ্ম কালে শেষ রাত্রে অপরাধিরা অপকর্ম্মের জন্য বাহির হয়ে থাকে, এই কারণে এই ঋতু পরিবর্ত্তন এবং অভিজ্ঞতার সহিত সামঞ্জস্য রেখে এইরূপ কেম্বিঙ্ বা বেষ্টনী ব্যবস্থার সময় নির্দ্দেশ করা রক্ষীদের উচিত হবে।

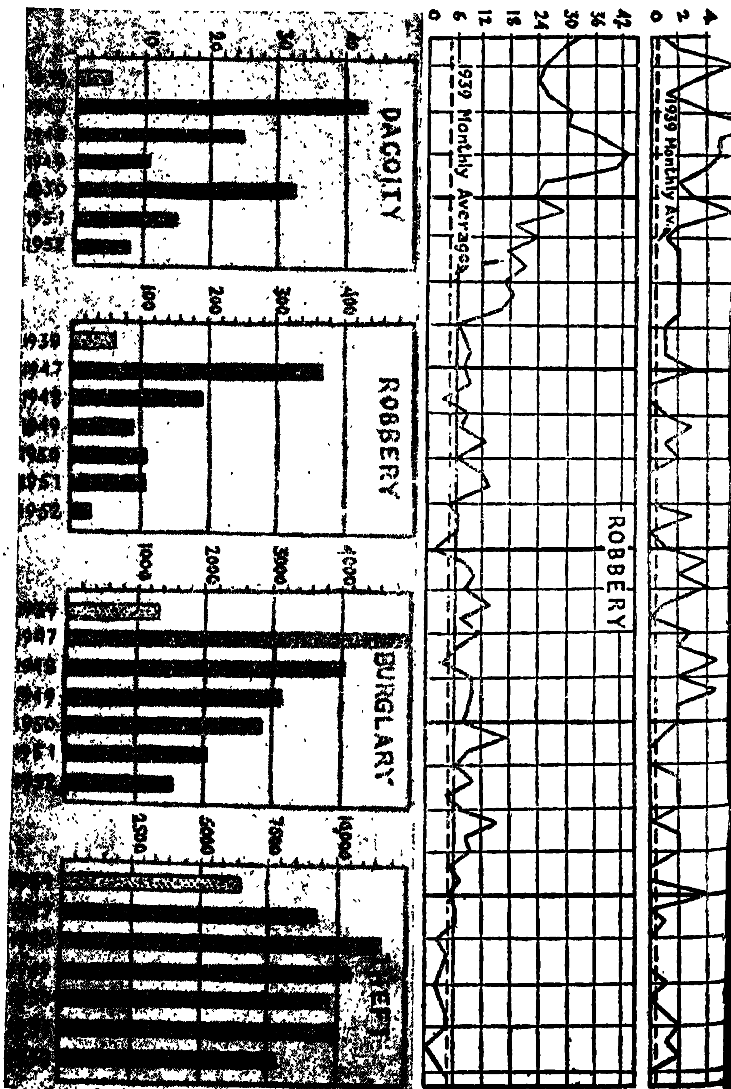
উপরোক্ত কারণে অপরাধ সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় তথ্যের পরি-সংখ্যা রক্ষা করা রক্ষিগণের এক অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। বলা বাহুল্য যে পৃথিবীর সর্ব্বদেশে রক্ষীমহলের কেন্দ্রীয় অফিসে উহা সযত্নে সংগৃহীত ও রক্ষিত হয়ে থাকে। এতদ্বারা রাষ্ট্রীয় সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের সহিত অপরাধের হ্রাস বৃদ্ধির কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তাহাও বুঝা যাবে। এক এক রূপ পরিস্থিতি এক এক প্রকার অপরাধের

সৃষ্টি করে থাকে, এই কারণে সেই সকল নূতন পরিস্থিতির পূর্ণ বিলোপ বা পরিবর্ত্তন দ্বারাও বিশেষ শ্রেণীর অপরাধ সমূহ নিরোধ করা সম্ভব। এইজন্য এইরূপ পরিসংখ্যা দেশের প্রতিটী ঘটনা, ব্যবস্থা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে সঙ্কলিত করার নিয়ম। রাষ্ট্রীয় বিধি নিষেধ, মূল্য বর্দ্ধন, অতিরিক্ত চাহিদা, অপ্রাচুর্য্যতা প্রভৃতি কারণেও যে বহু ক্ষেত্রে অপরাধের হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে, এ কথা সর্ব্বদাই স্বীকার্য্য। এই সকল পরিসংখ্যা অনুধাবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে অপরাধ সম্পর্কে গ্রাফ চিত্র নির্ম্মাণ করা। এই সকল পরিসংখ্যা 'পিলার' থাম এবং কার্ভ এই উভয় প্রথা দ্বারা চিত্রিত হয়ে থাকে। পর পৃষ্ঠায় একটী পিলার ও দুইটী গ্রাফ-চিত্র হতে বক্তব্য বিষয় সম্যকরূপে বুঝা যায়। কলিকাতায় অপরাধের সংখ্যা প্রতি বৎসর কিরূপ হারে কমে আসছে তা এই তিনটী চিত্র হতে বুঝা যায়।

পর পৃষ্ঠার কার্ভ চিত্রে এক একটী বক্ররেখা এক এক প্রকার অপরাধ বুঝাতে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতি বৎসরের প্রতি মাসের সংখ্যা অনুযায়ী বা প্রতি সপ্তাহের বা প্রতি পক্ষের সংখ্যা অনুযায়ী এই সকল বক্ররেখা বা থাম সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই ক্রাইম গ্রাফের প্রতি দৃষ্টি মাত্রে কোনও এক এলাকার অপরাধের প্রকৃত অবস্থা বোধগম্য হতে পারবে।

যদি বুঝা যায় যে অন্য কোনও শহর বা গ্রাম সমষ্টির বাহির হতে অপরাধিগণ এসে শহরে চুরী করে থাকে তাহ'লে শহরের নিষ্ক্রমন পথ সমূহে বা সীমানায় টহলদারী পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে। দুইটী প্রতিবেশী থানায় অফিসারগণ এইরূপ ক্ষেত্রে একত্রে সীমানায় পাহারা মোতায়েন করে থাকেন, যাতে এক এলাকা হতে অপরাধীরা এসে অপর এলাকাতে চুরী না করতে পারে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে পাহারা মোতায়েন করার প্রয়োজন


BURGLARY
1939 Monthly Average
500
400
300
200
100
0
THEFT
1939 Monthly Average
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
Jan Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec
1947
1948
1949
1950
1951
1952


DACOITY
ROBBERY
BURGLARY
1939 Monthly Av.
1939 Monthly Averages
ROBBERY

হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার সময় লোকের পকেট খালি করবারও লোকের অভাব হয় নি। এই সময় বেশ্যাপল্লী অঞ্চলে অপরাধ অধিক সংখ্যায় সঙ্ঘটিত হয়েছে। এই সকল বেশ্যানারীকে ঔষধ বা বিষ প্রয়োগে অচৈতন্য করে অর্থ ও অলঙ্কার অপহরণ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠে। এইজন্য পূজাবকাশে রক্ষিগণের উচিত এই সকল হতভাগ্য নারীদের তাদের সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া এবং এই অঞ্চলে বিশেষ পাহারাদার, টহলদারী এবং সন্ধানী সিপাহীদের মোতায়েন করা। রথযাত্রা, দোলযাত্রা বা কোনও মেলার সময় বহুস্থানে জনসমাগম অধিক হওয়ায় অপরাধীদেরও অপকর্ম্মের জন্য সুবর্ণসুযোগ ঘটে থাকে। এইজন্য এই সময় মেলার ভীড়ের মধ্যে এবং জনবহুল রাজপথে অধিক সংখ্যক টহলদারী সিপাহি এবং সাদা পোষাকে সন্ধানী সিপাহী মোতায়েন করা উচিত।

শহরের নিষ্ক্রমন পথ সমূহ সংখ্যায় অত্যল্প, উহার কোনও পার্শ্বে নদী থাকলে সেইখানে একটী বা দুইটীর অধিক সাঁকো প্রায়শঃ ক্ষেত্রে থাকে না। এই কারণে শহরের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমন পথের মুখে এবং নদী বা খালের সাঁকোর উপর বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত করলে স্বভাবতঃ সুফল ফলে থাকে। কোনও কোনও শহরে এই সকল ঘাঁটী বা স্থান লকগেট দ্বারা সুরক্ষিত করে রাখা আছে। শহরের অভ্যন্তর ভাগে কোনও মোটর-ডাকাতি ঘটলে অপরাধিগণ অনুসৃত হ'লে এই সকল ঘাঁটির মধ্য দিয়ে পলায়নে সচেষ্ট হয়েছে। এই ক্ষেত্রে রক্ষিগণ লকগেট দ্বারা নিষ্ক্রমন পথ অবরোধ করে একটী একটী করে মোটর আরোহীদের মোটর ও দেহতল্লাস করতে সক্ষম হবেন। এতদ্ব্যতীত তাঁরা বাহির হতে সন্দেহমান ব্যক্তিদের শহরে প্রবেশ এবং উহার অভ্যন্তর হতে ঐরূপ ব্যক্তিদের বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম হবেন।

এইভাবে আমরা দেখতে পাবো যে শহরাঞ্চলে মূলতঃ দুই প্রকার পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়, যথা—পাহারাদারী ও টহলদারী। পাহারাদাররা স্থির-কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং টহলদাররা টহল দিয়ে বেড়ায়। প্রয়োজন মত এদের সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। এই স্থির-কেন্দ্র সকল প্রায়শঃ দুই তিন বা চৌ-রাস্তার মোড়ে স্থির করা হয়, যাতে সব কয়টী রাস্তা একই স্থান হতে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দূরে কোথাও গোলমাল হ'লে এই পাহারাদার বা টহল-দারীরা প্রয়োজন বোধে সেখানে গমন করে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে পাহারাদারদের দ্বারা ঘাঁটি আগলানোর কাজ করানো হয়, সেই ক্ষেত্রে পারারাদার সিপাহীদের ঘাঁটি ত্যাগ না করাই ভাল। বড় বড় দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় এই সত্য বিশেষরূপে প্রযোজ্য। নিম্নের বিবৃতি হতে বিষয়টী সম্যক রূপে বুঝা যাবে।

"ঐ বিরাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এক ভদ্রলোক এসে আমার নিকট নালিশ জানালেন, যে অমুক মোড়ে দশজন শান্ত্রী মোতায়েন ছিল। এই সময় তিনি তাদের তাঁর সঙ্গে এসে দূরে আগত কয়েকজন দাঙ্গা-কারীকে বিতাড়িত করতে বলেছিলেন। কিন্তু তারা তাদের ঐ ঘাঁটি ছেড়ে এক পা'ও অগ্রসর হতে চাইল না। উত্তরে ঐ ভদ্রলোককে আমি বলি যে তারা ঐ স্থানে মোতায়েন থাকায় ওপার হতে দলে দলে দাঙ্গাকারীরা এধারে আসতে পারছে না। ওখান হতে ওরা দূরে চলে গেলে দাঙ্গাকারীরা দলে দলে ওধার হতে এধারে এসে পড়বে। এর ফলে দুই-চারজনকে রক্ষা করতে গিয়ে তারা শত শত লোকের জীবনহানির কারণ ঘটাবে।"

শহরের পাহারার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার পল্লী-অঞ্চলের পাহারার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলবো। এই বিরাট প্রদেশে পল্লী-অঞ্চলে

ঘন বসতি না থাকায় এবং রক্ষীদের সংখ্যাও সেই অনুপাতে অত্যল্প হওয়ায় সেখানকার পাহারার ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। প্রদেশের দূর পল্লী-অঞ্চলের কোনও এক স্থানে অপরাধের মরশুম পড়ে গেলে অপরাধ-প্রতিরোধার্থে পাহারার ব্যবস্থা করার রীতি আছে। অন্যথায় প্রতিটী পল্লী বা গ্রাম স্থানীয় রক্ষীদল, চৌকিদার ও দফাদারদের দ্বারাই রক্ষিত হয়ে থাকে। অধুনাকালে অবশ্য সর্ব্বত্রই পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোতোয়ালী হতে রক্ষিগণ বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থাতে পাহারার জন্যে সেখানে এসে থাকেন। এই সময় এরা অপরাধ-সঙ্কুল এলাকায় যেমন পাহারা দেন, তেমনি যে সকল স্থানে অপরাধীরা বাস করে সেই স্থানেও এসে হানা দেন। এই পাহারা বা টহল ব্যবস্থা সাধারণতঃ পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) চক্রাকার পাহারা, (২) বিভক্ত পাহারা, (৩) বহুল পাহারা, (৪) স্থায়ী পাহারা, (৫) ভ্রাম্যমান পাহারা।

গ্রামাঞ্চলে একক পাহারার রীতি নেই। সাধারণতঃ দুই বা চারি জন কিংবা একদল রক্ষী এইখানে পাহারায় নিযুক্ত থাকে। এদের দল বড় হ'লে তাদের সহিত একজন জমাদার বা অফিসার পাঠানোরও রীতি আছে। নিম্নে এই সকল গ্রাম্য পাহারার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো।

(১) চক্রাকার পাহারা—ইহা দ্বিমুখী হয়ে থাকে, ক্লক ওয়াইজ্ ও এ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ্। যখন কোনও এক অপরাধ বহুল স্থানে দুইদল পুলিশ উহার মধ্যস্থল হতে দ্বিবিধ পথে অগ্রসর হয়ে চক্রাকারে ভ্রমণ করে পুনরায় তাদের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরে এসে মিলিত হয়, তখন উহাকে বলা হয় চক্রাকার পাহারা। এই সময় পথিমধ্যে সন্দেহমান ব্যক্তিদের তারা পাকড়াও বা জিজ্ঞাসাবাদ করে, শুধু তাই নয়, পথে অবস্থিত

পুরানো পাপীদের বাড়ীতে হানা দিয়ে দেখে আসে রাত্রে তারা স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করছে কি'না! শান্ত্রীদের একদল চলে যাবার পর ঐ দাগী ব্যক্তিরা পুলিশ আর ফিরে আসবে না মনে করে যদি অপকর্ম্মের উদ্দেশে বার হয়ে পড়ে, তাহ'লে রক্ষীদের তৃতীয় দল পরে সেখানে এসে দেখতে পারে যে তারা বাড়ী হতে গরহাজীর। এইক্ষেত্রে গোপনে পথে ঘাটে রক্ষীরা ভোর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে তারা দেখবেন যে ঐ দাগীরা চোরাই হিস্যা সহ স্ব স্ব গৃহে ফিরে আসছে।

(২) বিভক্ত পাহারা—এই পাহারা ব্যবস্থায় রক্ষীদের দুইটী বা তিনটী দলে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। একদল যখন কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করে, তখন উহাদের অন্যদল গ্রামাঞ্চলে টহল দিতে বার হয়। এই ব্যবস্থায় পর্য্যায়ক্রমে পাহারা দেবার কারণে সকলে একই সঙ্গে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে না। এইভাবে সারা রাত্রি সুষ্ঠুভাবে সর্ব্বত্র আশানুরূপ পাহারার কার্য্য করা সম্ভব হয়।

(৩) বহুল পাহারা—কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপরাধের মরশুম পড়ে গেলে ঐ স্থানে পাহারা বা টহল দিবার জন্যে বহু সংখ্যক সিপাহী, শান্ত্রী ও অফিসার নিয়োগ করা হয়ে থাকে। স্থানীয় থানায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক রক্ষী মজুত না থাকায়, এইরূপ পাহারার জন্যে অন্যান্য থানা বা কেন্দ্রীয় আফিস বা সদর হতেও বহু রক্ষী আমদানী করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থায় নির্দ্ধারিত স্থানের সর্ব্বত্র সমান ভাবে নজর রাখা সম্ভব।

(৪) স্থায়ী পাহারা—অপরাধ বহুল স্থান কোতোয়ালী হতে বহু দূরে অবস্থিত হ'লে, প্রতিদিন সেখানে যাতায়াত করা অসম্ভব। এইজন্য ঐ স্থানে কোনও এক গৃহে এক দল শান্ত্রী অস্থায়ী ভাবে কিছুকালের জন্য অবস্থান করে, এবং প্রতি রাত্রে গ্রাম্য রক্ষী ও চৌকিদারদের সহিত অপরাধ বহুল স্থানে রোঁদে বার হয়।

(৫) ভ্রাম্যমান পাহারা—কোনও কোনও সময় একটী বিস্তৃত এলাকা জুড়ে অপরাধের মরশুম পড়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় একদল সশস্ত্র রক্ষী গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যাতায়াত করে। ডাকাতি আদি অপরাধ কোনও এলাকায় স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনঃ পুনঃ যত্র তত্র সংঘটিত হতে থাকলে এইরূপ পাহারার ব্যবস্থা চালু করা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত পাহারার ব্যবস্থা ব্যতীত দ্রুত গমনাগমন দ্বারা দ্রুতগতি পাহারা এবং উপরোক্তরূপ বেষ্টন পাহারা ব্যবস্থারও গ্রামাঞ্চলে প্রচলন আছে।

এই সকল পাহারার ব্যবস্থা ব্যতীত বর্ত্তমান প্রদেশীয় ইনেস্‌পেকটার জেনারেল অব্ পুলিশ, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ সরকার I. P. J. P. মহোদয় আরও কয়েক প্রকার পাহারার প্রথা আবিষ্কার করেছেন। স্থানাভাববশতঃ সেই সম্বন্ধে এইখানে কিছু বলা হ'ল না।

পাহারার ব্যবস্থা সমূহ যথাযথ রূপে সমাধা হচ্ছে কিনা, তার খবরদারী করার জন্যে ঊর্দ্ধতন অফিসারগণ রাউণ্ডে বেরিয়ে থাকেন। সুষ্ঠুরূপে খবরদারী করবার জন্যে কয়েকটী বৈজ্ঞানিক পন্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে। উহাদের একটী হচ্ছে চাকতি ব্যবস্থা, এই সকল চাকতি তিন প্রকারে হয়ে থাকে, যথা—একটি ফুটা সম্বলিত, দুইটী ফুটা সম্বলিত এবং তিনটী ফুটা সম্বলিত। ধরুণ তিনজন এইরূপ বহু চাকতি সহ কোনও এক স্থির কেন্দ্রে উপস্থিত হ'ল। এদের একজন, ঐ স্থির-কেন্দ্রে ঐরূপ বিবিধ চাকতি সহ মোতায়েন থাকবে, এদের দুইজন প্রত্যেকেই একটী ফুটা সম্বলিত কয়েকটী ঐ টিনের গোল চাকতিসহ দুই দিক হতে অগ্রসর হয়ে কোনও একটি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে সেইখানকার এক দেওয়াল বা গাছের গায়ে আঁটা পেরেকে উহাদের ঝুলিয়ে দিয়ে তাদের পূর্ব্ব স্থানে ফিরে আসবে। এই ব্যবস্থায় যাতায়াতের পথে কোনও দাগীচোর বাস করলে সে গৃহে হাজির

আছে কি'না তা তারা দেখে আসে। এ'ছাড়া তারা পথিমধ্যে কোনও সন্দেহমান মানুষ দেখলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেপ্তার করতেও পারবে। এরপর এই দুইজনের একজন স্থির-কেন্দ্রে অবস্থান করবে এবং তাদের অপর জন স্থির-কেন্দ্রে পূর্ব্বে অবস্থিত সিপাহীর সহিত দুইটী ফুটাযুক্ত দুইটি চাকতি সহ অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন পথে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে উপস্থিত হবে। এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে, তারা ঐ দুইটী ফুটাযুক্ত চাকতি ঐখানে রক্ষিত একটি ফুটাযুক্ত চাকতির সহিত সেঁটে রেখে পুনরায় ঐ ভাবে তাদের পূর্ব্ব স্থানে ফিরে আসবে। এর পর এদের যে সিপাহিটী দুইবারই টহলে বার হয়েছে, সে স্থির-কেন্দ্রে মোতায়েন থাকবে এবং তাদের অপর দুইজন অনুরূপ ভাবে তিনটি ফুটাযুক্ত চাকতি সহ ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে টহল দিতে বার হবে। এর পর এরা ঐ তিন প্রকার চাকতিগুলি ঐ স্থান হতে সংগ্রহ করে পুনরায় তাদের ঐ স্থির-কেন্দ্রে ফিরে আসবে। এইরূপ যাতায়াতের মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র দুই ঘণ্টার। দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর ঐ রূপে সিপাহীরা টহল দিয়ে পুনরায় তাদের পূর্ব্বস্থানে ফিরে এসেছে। উপরন্তু এইরূপ ব্যবস্থায় ঐ তিনজন সিপাহীর একজনকেও চারি ঘণ্টার অধিক সময় টহল দিতে হয় নি। এই ব্যবস্থার সুবিধা এই যে খবরদারী অফিসাররা রোঁদে বেরিয়ে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে ঐ চাকতি গুলি গুণে দেখে বুঝতে পারবে যে ঠিক ঠিক সময়, ঠিক ঠিক রূপে টহলের কার্য্য সমাপিত হয়েছে। চাকতিগুলি কোথায় টাঙানো হবে তা অবশ্য উর্দ্ধতন অফিসাররা প্রয়োজনানুসারে পূর্ব্বাহ্ণেই ঠিক করে দিয়ে থাকেন।

পাহারাদার বা টহলদার সিপাহীদের সহিত একটী চোর-বাতি বা ছোট টর্চ্চ এবং হুইসিল ও প্রয়োজনানুসারে অস্ত্রশস্ত্র থাকা উচিত। সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র থাকলে পর্য্যুদস্ত হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যে

দুইজন সিপাহীর একত্রে টহল দেওয়ার রীতি আছে। দুর্ব্বৃত্তরা বহু সংখ্যক হ'লে অল্প সংখ্যক রক্ষীদের উচিত দূর হতে শস্ত্র নিক্ষেপ করা। এদের কাউকে মাত্র আহত করতে পারলে ঐ আঘাত চিহ্ন হতে তাদের পরে খুঁজে বার করা গিয়েছে। কেউ কেউ বলেন, টহলের সময় হাঁক ডাক করা অনুচিত। এতদ্বারা অপরাধীরা সাবধান হয়ে আত্ম-গোপন করে থাকে। অন্যান্যেরা বলে থাকেন, রক্ষিগণ সংখ্যায় স্বল্প হ'লে হাঁক ডাক করে অপরাধীদের মনে ভীতির সঞ্চার করাই ভাল। এতদ্বারা দূর হতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অপরাধীরা ভাববে অদূরে আগুয়ান সিপাহীরা সংখ্যায় অত্যল্প নয়। তবে নিষ্প্রয়োজনে টর্চ্চের লাইট যত্র তত্র নিক্ষেপ করা উচিত নয়, কারণ উহা বহু দূর হতে দৃষ্ট হয়ে থাকে।

আধুনিক পাহারার প্রথা সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার পূর্ব্বতন পাহারার প্রথা সম্বন্ধে বলবো। এই উভয়বিধ পাহারার প্রথার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা বহু বাস্তব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এ ছাড়া এইরূপ তুলনামূলক আলোচনায় বহু ঐতিহাসিক তথ্যেরও আবিষ্কার হবে।

অপরাধ-নিরোধার্থে পাহারাদার মোতায়েন এদেশের এক সাবেক প্রথা। হিন্দুরাজত্ব কালে, মুসলমান যুগে এবং ব্রিটীশ শাসনের প্রারম্ভকালে দেশের শান্তি রক্ষার ভার যখন স্থানীয় ভূস্বামীদের উপর অর্পিত ছিল, তখনও পাহারাদারী প্রথায় অপরাধ-নিরোধের কার্য্য সমাধা হয়েছে। তবে তৎকালীন পুলিশী কর্ম্মকৃত্যের কর্ম্মচারিগণ বংশানুক্রমে নিযুক্ত হতেন এবং তাদের বেতনের বদলে স্বত্বযুক্ত ভূমি প্রদান করা হতো। তৎকালীন পাহারার ব্যবস্থায় একটী গ্রামকে কয়েকটী পল্লীতে বিভক্ত করা হতো এবং রাত্রিকালে প্রতিটী পল্লীর জন্য একজন বা দুইজন করে চৌকিদার পাহারা রত থাকতো। গ্রাম ছোট হ'লে অবশ্য সেইখানে মাত্র একজন

চৌকিদার কার্য্যরত থেকেছে। প্রয়োজনবোধে এরা হাঁক ডাক করে অপরাধ-নিরোধ বা অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেছে। এই বিষয়ে দরকার হ'লে তারা গ্রামবাসীদের জাগিয়ে দিয়ে তাদের সাহায্য গ্রহণও করেছে। এইরূপ চার পাঁচটী গ্রামে বাহাল চৌকিদারদের কার্য্যের উপর তদারক করবার জন্যে একজন করে দফাদারও নিযুক্ত করা হতো। এই ব্যবস্থা গ্রাম্য পুলিশ আখ্যায় য়ুনিয়ন বোর্ড সমূহের অধীনে আজও পর্য্যন্ত চালু আছে। এতদ্ব্যতীত অপর একটী বিশেষ পদেরও প্রচলন ছিল, উহাদের সেই যুগে বলা হতো ঘাঁটিয়াল। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে কিম্বা এক গ্রাম সমষ্টি হতে অপর গ্রাম সমষ্টিতে যাবার উপযোগী রাজপথের উপর বা উহাদের কোনও এক সংযোগস্থলে ঘাঁটী নির্ম্মাণ করে এঁরা সেইখানে সাঙ্গ-পাঙ্গ-সহ পাহারায় মোতায়েন হতেন, যাতে দস্যুদল কোনও এক গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করার মুখেই বাধা-প্রাপ্ত হতে পারবে।

এই সকল ঘাঁটী আগলে যে সকল ঘাঁটিয়াল বসে থাকতো তার নিজের ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ভরণ-পোষণের জন্য জমিদার, ভূস্বামী বা রাজারা যে নিষ্কর জমি দান করতেন তাকে বলা হতো ঘাঁটীয়ালী। অনুরূপ ভাবে চৌকিদার ও দফাদারদের জন্যও নিষ্কর জমিজমার বিলি ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইরূপ ঘাঁটীয়ালী বা চৌকিদারী সত্বের জমিজমা পরবর্ত্তীকালে তাদের বংশধরগণ ঐরূপ কার্য্যে বহাল না থেকেও ভোগদখল করে এসেছে। এখনও এমন বহু পরিবার দেখা যায় যারা ঐ সকল পূর্ব্বকালীন রাজ-পদের উপাধী আজও পর্য্যন্ত বংশানুক্রমে ধারণ করে আসছেন।

উপরোক্ত পদ কয়টী ছাড়া আরও একটী উল্লেখযোগ্য পদ ছিল। উহাকে বলা হতো দারোগা। এই পদটী আজও পর্য্যন্ত এই দেশে সুপরিচিত। জমিদার শাসকগণ এই সকল পাহারারত হেরিডিটারী বা বংশগত কর্ম্মচারীদের প্রধান রূপে একটী বিশেষ অঞ্চলের ভার এই

দারোগা আখ্যায় ভূষিত এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করতেন। এই সকল দারোগা যে স্থানে দলবল সহ বাস করতেন তাকে বলা হতো থানা। হিন্দীভাষী অঞ্চলে এই রাজকীয় ব্যক্তিকে বলা হতো থানাদার। এই পদটীও বহুদিন বংশগত ভাবে চলে এসেছে এবং এদের ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত জমিজমাকে বলা হয়েছে থানাদারী। এই সকল কর্ম্মচারীদের অধীনে যে সকল লোকলস্কর থাকতো তাদের ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত জমি-জমার নাম ছিল চাকরাণ। বলা বাহুল্য, এই সকল কর্ম্মচারী প্রায়শঃ ক্ষেত্রে বংশগত ভাবে বহাল হয়ে এসেছে।

[যে সকল বংশগত কর্ম্মচারী গ্রামাঞ্চলে পাহারার দ্বারা অপরাধ-নিরোধের কার্য্যে নিযুক্ত থাকতো তাদের ভরণপোষণের জন্য সম্পত্তির নাম ছিল 'রঙ্গাস্তি চৌকিদারী চাকরাণ' এবং যে সকল বংশগত কর্ম্মচারী অপরাধ-নির্ণয়ের কার্য্যে বাহাল থাকতো তাদের ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত জমিজমাকে বলা হতো বালাগস্তি চাকরাণ স্বত্ব।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত এই সকল প্রথা উচ্ছেদ করে শান্তিরক্ষকদের বেতন দ্বারা নিযুক্ত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই চাকরাণ প্রথা উচ্ছেদ এবং শান্তিরক্ষায় বংশগত প্রথার বিলোপ করবার সময় বহু বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের চুর (Chuar) বিদ্রোহের মূলে ছিল এই বিক্ষোভ। পুরানো কলেক্টারী নথীপত্রে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে।]

বহু দারোগা সহ বিবিধ রক্ষীপুঙ্গব ও তাদের অধস্তন কর্ম্মচারিগণ খোদ জমিদার শাসকগণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এতদ্ব্যতীত রিজার্ভ পুলিশ রূপে এঁরা স্বকীয় প্রাসাদ বা কাছারী সমূহে বহু পাইক বরকন্দাজ এবং পেয়াদা বহাল রাখতেন, যাতে প্রয়োজন বোধে এই সকল দারোগা

চৌকিদার, দফাদার ও ঘাঁটীয়ালদের সাহায্যের জন্য তারা ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হতে পারে। এ'ছাড়া এই সকল রক্ষিগণ প্রয়োজনবোধে পথ হতে তাঁবেদার লাঠিয়াল প্রজাদেরও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। ত্বরিতগতিতে গমনাগমনের জন্য জমিদারগণ তাঁদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বহু দ্রুতগামী ছিপ-নৌকা, রণ-পা এবং অশ্ব সদা-সর্ব্বদা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অধীনে প্রস্তুত রাখতেন। কর্দ্দমাক্ত নদীনালা বহুল প্রান্তর ও রাজপথ বিহীন গ্রামাঞ্চলে গমনা-গমনের জন্য উহাদের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য্য। এ'ছাড়া কোনও সন্দেহমান ব্যক্তিকে ডেকে আনতে পেয়াদা ও তাকে ধরে আনতে হলে পাইক পাঠানোর রীতি ছিল।

ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যে সিলেক্ট কমিটি বসেছিল তার পঞ্চম রিপোর্ট হতে বক্তব্য বিষয় সম্যকরূপে বুঝা যাবে। এই সম্পর্কে ঐ রিপোর্টের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল।

"এই সময় জমিদার শাসকগণ আপন জিলা বা জমিদারীর শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাহাজানি, ডাকাতি, সিঁদেল চুরী প্রভৃতি অপরাধের অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার দায়িত্বও ছিল তাঁদের। যদি তারা এই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে বা অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার না করতে পারতেন তাহ'লে এইজন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাঁদের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারতো। এই কারণে তৎকালীন জমিদাররা একটী বিরাট রক্ষীবাহিনী প্রতিপালন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।" এই রক্ষীদল বহিঃ ও অন্তর্শত্রু হ'তে প্রজাদের রক্ষা করতে সমর্থ ছিল।

উপরোক্ত রিপোর্টে বর্দ্ধমান মহারাজার জমীদারী শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু কথা বলা হয়েছে। এই সকল তথ্য হতে তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়।

বর্দ্ধমান জিলা সম্পর্কে জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ১২ই অক্টোবর, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত পত্রটীতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। উহার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

"বর্দ্ধমান মহারাজার অধিকারভুক্ত এলাকা পুলিশি কার্য্যের জন্য কয়েকটী থানায় বিভক্ত ছিল। প্রতিটী থানায় একজন করে থানাদার নিযুক্ত ছিল। ইঁহাদের অধীনে গ্রাম সমূহে প্রায় ২৪০০ সশস্ত্র পাইক কার্য্যরত থাকতো। এই সকল পাইক গ্রামবাসীকে দুর্ব্বৃত্তদের কবল হতে রক্ষা করতো এবং তৎসহ প্রয়োজনীয় ও জরুরী সংবাদ সমূহ থানাদারের নিকট পৌছিয়ে দিত। এই সকল লোক-লস্কর ব্যতীত ১৯০০০ সশস্ত্র জমিদারী পাইক প্রয়োজন বোধে ঐ সকল পুলিশি পাইকদের সাহায্যে অগ্রসর হবার জন্য সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থেকেছে।"

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে D. T. Mc. Niele I. C. S. স্পেশাল অফিসার রূপে তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন উহাও বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"দশসালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বের ন্যায় উহার পরেও দেশের পুলিশি কার্য্য তথা শান্তিরক্ষার ভার এই দেশের জমিদারদের উপরই অর্পিত আছে। এই জমিদারগণই চুরিচামারী ও ডাকাতি আদি অপরাধ নির্ণয় ও নিরোধের জন্য এখনও দায়ী আছেন। তদন্ত করে অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করার ভারও আজ পর্য্যন্ত তাঁর অধীনস্থ লোকেদেরই করণীয় কার্য্য।"

যদিও জমিদারগণই বর্ত্তমানকালীন পুলিশ সাহেবের বা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন এবং সাক্ষাৎভাবে তাঁরাই যাবতীয় শাসন কার্য্য পরিচালনা করেছেন, তাহ'লেও গ্রাম্য পঞ্চায়েত সমূহেরও এই সকল

বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠান সমূহকে জমিদার শাসকদের সাহায্যকারী ইউনিট্—মন্ত্রণা-সভা বললেও অন্যায় হবে না। প্রকৃত পক্ষে স্বতস্ফূর্ত্ত ভাবে জনগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ বা প্রধানদের দ্বারা গ্রাম্যরক্ষিগণ নিয়ন্ত্রিত হতো। জনগণের শুভেচ্ছার উপরই এদের চাকুরীর স্থায়িত্ব নির্ভর করেছে। বহুক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের সুপারিশে এদের চাকুরীতে বাহাল করা হতো।

ঐ সময়কার পুলিশি কর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার ঐ সময়কার বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলবো। কারণ ঐ সময় পুলিশি ও বিচার একত্রে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সাধারণ অপরাধের বিচার-কার্য্যের ভার ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর এবং সাংঘাতিক অপরাধের বিচারের ভার ছিল স্থানীয় প্রধান বা জমিদারদের উপর। এই সম্পর্কে গ্রাম্য প্রধানদের বিচার মনোনীত না হ'লে যে কোনও ব্যক্তি জমিদার বা অন্য কোনও প্রধানের নিকট আপীল দায়ের করারও অধিকারী ছিল। এই কার্য্য মৌখিক বা লিখিত ভাবে করা হতো এবং এইজন্য কাহাকেও এক কড়ি বা পাই পয়সাও ব্যয় করতে হয় নি। জমিদারদের বিচারে কোনও প্রজা অসন্তুষ্ট হ'লে সে অনায়াসে রাজা বা নবাব ও পরবর্ত্তীকালে ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট আপীল দায়ের করতে বা আবেদন নিবেদন জানাতে সক্ষম ছিল। এতদ্ব্যতীত সক্ষম হ'লে এই জমিদার রাজা বা নবাবদের বিচারের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের রাজধানীতে এসে বাদশা বা সম্রাটদের নিকট অভিযোগ পেশ করিতেও বাধা ছিল না।

প্রয়োজনবোধে অপরাধীদের সাময়িক ভাবে বন্দী করে রাখবার জন্য কাছারী বা থানায় সুগঠিত হাজত ঘর এবং জমিদার বা রাজভবনে বৃহৎ কারাগার নির্ম্মিত হতো। ভূমীর স্বত্ব অপহরণ, বেত্রাঘাত, বেগার খাটানো, সামাজিক অপমান প্রভৃতি বিবিধ শাস্তি স্থানীয় বিচারকদের

দ্বারা অপরাধীদের উপর প্রয়োগ করা হতো, কিন্তু প্রাণদণ্ড একমাত্র রাজা বা নবাবরাই দিতে পারতেন।

পুরাতন কালে এই সকল প্রধানদের উপর একাধারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার ছিল। উপরন্তু শাসন ও রাজস্ব আদায়ের ভারও এঁদের উপর অর্পিত ছিল। সমাজের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে উপরোক্ত কারণে তাঁদের জ্ঞান ছিল প্রচুর। এইজন্য আরও সহজে তাঁরা অপরাধ-নিরোধ এবং অপরাধ-নির্ণয়ের কার্য্যে দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন। তৎকালীন বিবিধ অপরাধের স্বল্পতা উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন শাসন ও বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করে বর্ত্তমান কালের শাসন ও বিচার পদ্ধতি উহাদের য়ুরোপীয় পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে যুগপোযোগী করে তৈরী করা হয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলে চৌকিদার, দফাদার, দারোগা প্রভৃতি নামে আখ্যাত ব্যক্তিদের শান্তি রক্ষার্থে মোতায়েন রাখা হয়ে থাকে।

পুলিশি কর্ম্মকৃত্যে বাহাল বংশগত রক্ষীপুঙ্গবদের কর্ত্তব্য কার্য্যে অটল থাকতে বাধ্যকর কয়েকটী প্রথা পূর্ব্বতন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কারণ পথঘাটের অনুন্নত অবস্থা ও স্থানীয় দূরত্বের কারণে সকল ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ভাবে তাদের করণীয় কার্য্যের তদারক করা সম্ভব ছিল না। এই প্রথানুযায়ী যদি কোনও গ্রামবাসীর ধনসম্পত্তি অপহৃত হতো তাহ'লে গ্রামরক্ষী উহা উদ্ধার করে আনতে বাধ্য ছিল। অন্যথায় সমপরিমান অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার জমিজমার আয় হতে প্রদান করতে বাধ্য হতে হতো। যদি অপহৃত দ্রব্যের কিয়দংশ গ্রামরক্ষী উদ্ধার করে আনতে পারতো তাহ'লে সম্পত্তির বাকি অংশের জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ করতে হয়েছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে গ্রামরক্ষীকেও আপন ধন-সম্পত্তির আয় হতে বহু উপরক্ষী

নিযুক্ত করতে তো হয়েছেই, উপরন্তু তাদের অপরাধ নিরোধার্থে বিবিধ রূপ উদ্ভাবনী শক্তিরও উন্মেষ ঘটাতে হয়েছে। অপরাধ-নির্ণয়ের জন্য তাদের খোঁজী-সম্প্রদায়ের (Heriditary Detective) সাহায্য নিতে হতো। এইরূপে এই ভারত ভূমিতেই টিপবিদ্যা ও পদচিহ্ন বিদ্যার প্রথম উদ্ভব সম্ভব হয়। কোনও একস্থানে অপরাধ সমূহ ব্যাপক আকার ধারণ করলে, এই সকল গ্রামরক্ষীদের কয়েদ করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করারও রীতি ছিল। এই সকল কারণে প্রাচীন বাংলা তথা ভারতে ঐ সময়কার উপযোগী এক সুগঠিত পুলিশি কর্ম্মকৃত্য স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবেই গড়ে উঠেছিল। এই বিশেষ কর্ম্মকৃত্য দ্বারা আভ্যন্তরিক ও বহিরাগত এই উভয়বিধ দুর্ব্বৃত্তদের কবল হতে স্থানীয় ব্যক্তিরা রক্ষা পেয়েছে।

গ্রাম্য পাহারা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার নগর রক্ষা ব্যবস্থার কথা বলবো। প্রাচীন বাংলা তথা ভারতে নগর রক্ষার কারণে নগর-রক্ষীবাহিনীরূপ একদল রক্ষীকুল কর্ম্মে বাহাল ছিল। এই নগর রক্ষীবাহিনীর প্রধানকে বলা হতো কোটাল। ভারতীয় প্রাচীন উপকথা সমূহ পাঠে দেখা যায় যে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র এবং কোটালপুত্র একত্রে মেলামেশা করতো। ইহা হতে বুঝা যায় যে মন্ত্রীর পরই রাষ্ট্রে কোটালের স্থান ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে নগর রক্ষীর প্রধানকে বলা হতো কোতোয়াল এবং তার প্রধান ঘাঁটীকে বলা হতো কোতোয়ালী। প্রাচীন ভারতে যে সকল নগর রক্ষিগণ প্রাসাদ ও রাজভবন, ধর্ম্মমন্দির, অস্ত্রাগার, রাজভাণ্ডার প্রভৃতি স্থানে মোতায়েন থাকতো তাদের বলা হতো শান্ত্রী। সাধারণ রক্ষিগণ নগর প্রাচীর এবং নগর রাজপথে অপরাধ নিরোধার্থে পাহারার কার্য্য করেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোসলেম রাজত্বকালে প্রবর্ত্তিত পৃথক পৃথক পুলিশি কর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে আমি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশদরূপে আলোচনা করবো।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি মূলতঃ পূর্ব্বতন বাংলার পুলিশি কর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পুলিশি কর্ম্মকৃত্যসমূহ পৃথকভাবে গড়ে উঠেছিল, ঐ সকল প্রদেশের তৎকালীন রক্ষী-পুঙ্গবগণের পদের নাম ও পরিচয়ও বিভিন্ন প্রকার। আমি আশা করি আমার নির্দ্দেশিত পন্থায় আগতকালে অন্য কোনও গবেষক এই দেশের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন যুগের পুলিশি কর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে তুলনামূলক গবেষণা করে একটী সুবৃহৎ পুস্তক রচনা করতে সক্ষম হবেন। বিভিন্ন প্রদেশের জমী-জমা সম্পর্কীয় সরকারী ও জমীদারী নথিপত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা এইরূপ গবেষণা সম্ভব।

অপরাধ-নিরোধ—অপরাপর

পাহারার ব্যবস্থা ছাড়া আরও বহু উপায়ে অপরাধ-নিরোধ করা সম্ভব। যথা—স্থানীয় পরিজ্ঞান, গণ-শিক্ষা ও গণ-সংযোগ, আশু ব্যবস্থা অবলম্বন, ৫৪ প্রভৃতি ধারা মতে গ্রেপ্তার ও ১০৯ ও ১১০ প্রভৃতি ধারা মতে সোপর্দ্দীকরণ। নিম্নে উহাদের প্রতিটী ব্যবস্থা সম্বন্ধে পৃথক পৃথক রূপে আলোচনা করবো।

(১) গণ-শিক্ষা: গণ-শিক্ষা দুই প্রকারের হয়, যথা নৈতিক ও ও বুদ্ধিগত। নৈতিক শিক্ষা, সুবিচার, উন্নয়ন ও বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি দ্বারা যে অপরাধ-নিরোধ সম্ভব তা সর্ব্বজনস্বীকৃত। সৎ উপদেশ, সৎ পুস্তক, সৎ সংসর্গ অপরাধ-নিরোধের সর্ব্বদাই সহায়ক হয়। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হলে মানুষের পক্ষে অপরাধী হওয়া অসম্ভব নয়। এইজন্য বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজারা নাগরিকদের আয়-ব্যয়ের

উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য একদল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করতেন। কিন্তু অধুনাকালে বুদ্ধিগত গণ-শিক্ষার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। এইজন্য অপরাধ এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে মধ্যে মধ্যে সতর্ক করে দেওয়া উচিত হবে। সাধারণতঃ রেডিও মারফৎ, প্রচার-পত্র দ্বারা ও সংবাদপত্রের সাহায্যে, ঢেঁড়া পিটিয়ে বা মুখে মুখে জনসাধারণকে এই সম্পর্কে সতর্ক করা যায়। কোনও এক অপরাধ কোনও এক স্থানে পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হলে, ঐ সকল অপরাধীদের কার্য্যকরণ সম্বন্ধে জনসাধারণকে জ্ঞাত করে দেওয়া উচিত। এই ব্যবস্থায় সাধারণভাবে প্রবঞ্চকদের পক্ষে লোক ঠকানো অসম্ভব। এদের কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্ণেই অবগত থাকায় জনসাধারণ এদের ধাপ্পায় ভোলে নি; বরং তারা এদের গ্রেপ্তার করে থানায় এনেছে। যে সকল স্থানে কোনও এক অপরাধ বেশী সংখ্যায় সংঘটিত হয় সেই সকল স্থানে 'পিক-পকেট' হতে সাবধান, কিংবা 'জুয়াচোরেরা নিকটে আছে' ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড বা প্রচার-পত্র এঁটে দেওয়া যেতে পারে। শহর ও পল্লী অঞ্চলে এমন বহু স্থান আছে যেখানে রাতবেরাতে একা গমনাগমন করা বিপজ্জনক। প্রচার কার্য্য দ্বারা বিদেশীয় ব্যক্তিদের ঐ সকল স্থান সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েও অপরাধ-নিরোধ করা যায়। পূজা ও পার্ব্বণের সময়, বিশেষ করে বড় বড় উৎসবে, চুরিচামারি অধিক সংখ্যায় ঘটে থাকে। এর কারণ এই সময় অপরাধীদেরও অর্থের প্রয়োজন হয় এবং গৃহস্থদেরও অর্থ মজুত থাকে। এই সময় গৃহস্থগণ ধার করে বা অন্য উপায়ে বা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে অর্থ বাড়ী আনে। এই জন্য এই সকল প্রচারপত্র বিশেষ করে ঐরূপ পূজা-পার্ব্বণকালে বিলি করা উচিত। এই সময় এই একই কারণে অপরাধীরা বেশ্যালয়ে এসে বেশ্যাদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করে অর্থাপহরণ করেছে। শান্তিরক্ষীদের

উচিত বড় বড় পূজা—বিশেষ করে দুর্গাপূজা ও দশহরার সময় বেশ্যা নারীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সাবধান করে আসা উচিত, যাতে ঐ সময় তারা অজানা ও অচেনা ব্যক্তিদের তাদের গৃহে স্থান না দেয়।

গণ-শিক্ষার ন্যায় গণ-সংযোগেরও প্রয়োজন আছে। এই উভয়বিধ প্রথা দ্বারা রক্ষিগণ জনসাধারণকে আত্মরক্ষার রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তুলতে পারেন। আপন আপন এলাকার সাধু-জনগণেব সহিত মধ্যে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করলে তাঁরা রক্ষীদের অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদান করতে পারবেন। এতদ্ব্যতীত এই সুযোগে রক্ষিগণ এঁদের সাহায্যে বহু স্থানীয় পল্লীরক্ষীদলও সৃষ্টি করতে পারবেন। এই সকল নগর বা পল্লীরক্ষীদল অপরাধ-নিরোধের ক্ষেত্রে অসাধ্যসাধন করতে সক্ষম। কিন্তু রক্ষিগণের উচিত হবে এই সকল দলকে তাদের আইনগত আত্মরক্ষার ও অন্যান্য কার্য্যের ক্ষমতা কতটুকু সেই সম্পর্কে সচেতন করে রাখা। গণ-সংযোগের সময় কেবলমাত্র 'পুলিশি' কথাবার্ত্তা না করে সমাজ-সেবা সম্বন্ধেও আলোচনা করা উচিত। পল্লী অঞ্চলের জনসভাতে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ, লাইব্রেরী বা সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠা, চাষবাস ও রাস্তাঘাট সম্পর্কীয় আলোচনা দ্বারা জনগণের হৃদয় সহজেই জয় করা সম্ভব। এই সকল কথাবার্ত্তার সহিত অপরাধ ও অপরাধ-নিরোধ সম্বন্ধে কথা বললে তবে উহা ফলপ্রসূ হবে। এই সকল সভাতে স্থানীয় অপরাধী বা অপরাধীমন্য ব্যক্তিদের ডেকে এনে তাদের সৎ উপদেশ দেওয়া যেতে পারে, কিংবা তাদের চাকুরী দিয়ে বা রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে বা শ্রমিকরূপে নিয়োগের ব্যবস্থা দ্বারা নিরপরাধী করবার জন্যেও জনসাধারণকে অনুরোধ করা যেতে পারে। উপরন্তু এই সুযোগে উপস্থিত রক্ষিগণ এবং জনসাধারণ ভবিষ্যৎ আপদ এড়ানোর জন্যে এই সকল অপরাধীদের চিনে রাখতেও

সক্ষম হবেন। শহরাঞ্চলের সুশিক্ষিত নাগরিকদের সহিত কথাবার্ত্তা এমন ভাবে কইতে হবে যাতে তাঁরা রক্ষীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা করে নিতে পারেন, তা না হলে জনগণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাওয়া তাঁদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হতে পারে। যতক্ষণ না জনসাধারণ বুঝবে যে এই রক্ষীপুঙ্গব পুলিশের গুণ ব্যতীত অন্যান্য মনুষ্যোচিত গুণেরও অধিকারী ততক্ষণ তারা তাদের সমধিক আমল নাও দিতে পারেন বর্ত্তমান অবস্থায়।

(২) স্থানীয় পরিজ্ঞান ঃ—অপরাধ-নিরোধ ও অপরাধ-নির্ণয়ের কারণে স্থানীয় পরিজ্ঞানের (Local Knowledge) প্রয়োজন অসীম। আপন এলাকা ও উহার চতুর্দ্দিকের পথঘাট ও উহার অবস্থা, উল্লেখযোগ্য স্থান, কারা কোথায় বাস করে, কে শত্রু, কে বা মিত্র, স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থা ও জনসাধারণের পছন্দাপছন্দ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে বিবিধ সংবাদ পূর্ব্ব হতেই রক্ষীদের জ্ঞাত থাকা উচিত। এ ছাড়া কোন স্থানে কোন অপরাধ অধিক হয়, অপরাধীরা কে কোথায় বাস করে বা আড্ডা জমায়, কে বা বামাল গ্রাহক * তাহাও রক্ষীদের সাবধানে সংগ্রহ করে নথীভুক্ত করতে হবে, যাতে পূর্ব্বগামী অফিসারদের বদলী হওয়ার পর তাঁর স্থলাভিষিক্তগণ ঐ নথীপত্র হতে প্রথম দিনই এলাকার বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

বলা বাহুল্য যে অপরাধ ও অপরাধী সম্বন্ধে স্থানীয় পরিজ্ঞানের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। সাধারণতঃ দুই প্রকারের অপরাধীর কথা বলা যেতে পারে,

* এক একজন বামাল গ্রাহকের নিকট এক একদল অপরাধী দ্রব্য পাচার করে। কোন বামাল গ্রাহকের সহিত কোন চোর সংযুক্ত তা'ও রক্ষীদের জানা উচিত। চোরেরা প্রায়ই বামাল গ্রাহকের নাম করে। কয়জন চোর একই বামাল গ্রাহকের নাম করেছে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

যথা—যাদের আমরা জানি বা চিনি এবং যাদের আমরা জানিনা বা চিনিনা। যে সকল অপরাধীদের আমরা জানি, তাদের একদলের নাম থানায় নথীভুক্ত করা আছে। তাদের গতিবিধি এবং হাজির ও গরহাজির সম্বন্ধে আমরা খবরাখবর করে থাকি। অন্য কোথাও তারা গমন করলে সেইখানেও স্থানীয় পুলিশে পত্র পাঠিয়ে তাদের কার্য্যকরণ সম্বন্ধে আমরা অবগত হতে থাকি। কিন্তু এদের মধ্যে এমন বহু অপরাধী আছে যাদের সম্বন্ধে আমরা তখনও পর্য্যন্ত অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করি না। এ ছাড়া আরও বহু ব্যক্তি আছে যারা দাগী বা বেদাগী অপরাধী কিন্তু তাদের আমরা তখনও পর্য্যন্ত জনিনা বা চিনিনা। কোনও এক স্থানে অপরাধের বাহুল্য ঘটলে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরাধীদের উপর প্রথম শ্রেণীর অপরাধীদের ন্যায্য নজর রাখতে হবে এবং তৎসহ তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধীদের খুঁজে বার করতে হবে। গত সাত আট বৎসরের নথীপত্র ঘেঁটে এই সকল না জানা অপরাধীদের নাম ধাম সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায়। ডাকাতি অপরাধ সাধারণতঃ পুরানো ডাকাতদল দ্বারা কিংবা কোনও এক অভিজ্ঞ ডাকাতের নেতৃত্বে সমাধা হয়ে থাকে। কোনও এক স্থানে ডাকাতির হিড়িক পড়ে গেলে ঐ সকল ব্যক্তির উপর নজর রাখলে সুফল ফলবে।

[অপরাধীদের চিনে রাখবার জন্যে রক্ষীদের প্রতি সপ্তাহে একদিন জেলে গিয়ে তাদের দেখে আসা উচিত। এই সকল অপরাধীদের কেহ কেহ অন্য কোথাও অপরাধ করার জন্যে হাট বাজার মেলা প্রভৃতি স্থানে মিলিত হয়। এদের কেউ কেউ আবার ঐ মেলার স্থানেতেই অপরাধ করে। এরা চেনা লোক হলে রক্ষীরা সহজে ঐ সকল স্থানে নজর রেখে তাদের পাকড়াও করতে পারেন।]

স্থানীয় পরিজ্ঞানের ন্যায় রক্ষীদের সাধারণ পরিজ্ঞানও থাকা উচিত।

নানাবিধ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জ্ঞান থাকলে রক্ষীদের কার্য্য কিরূপ সহজ হয় তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"অকুস্থান হিন্দু অধিষ্ঠিত হলেও সেখানে কয়েকজন মোসলেমও বাস করে। এই অপরাধটী ভোর চারটায় একটি বস্তীর পার্শ্বে সংঘটিত হলেও হিন্দুরা সকলেই বলে যে ঐ সময় তারা সকলেই নিদ্রিত ছিল। ঐ সময়টী ছিল পবিত্র রমজানের মাস। আমার জানা ছিল যে মোসলেমরা ঐ সময় ভোর বেলায় উঠে আচমন করে খেয়ে দেয়ে নেয়। আমরা এর পর ঐখানকার কয়েকজন মোসলেমকে জিজ্ঞাসা করা মাত্র তাদের কয়জন বলে যে ভোরে উঠে আচমন করবার সময় তারা ঐ ঘটনা ঐখানে হতে দেখেছে।"

ঐতিহাসিকজ্ঞানও বহুক্ষেত্রে রক্ষীদের উপকারে এসেছে। ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহ সামাজিক ব্যবহার বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। বহু বর্ত্তমান অপরাধ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতেও ঘটে থাকে। কারণ ইতিহাস ও সামাজিক কিংবদন্তী বাক্-প্রয়োগের (Suggestion) স্থলাভিষিক্ত হয়ে বহু অপরাধের সৃষ্টি করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক অপরাধ সমূহের কথা বলা যেতে পারে। * আধুনিক আত্মহত্যারও পিছনে থাকে ঐতিহাসিক আত্মহত্যার মনোবৃত্তি। এইজন্য প্রতিটী অপরাধ সম্পর্কীয় আলোচনা কালে আমি উহাদের পূর্ব্বতন ইতিহাসের কথাও বলেছি।

(৩) আশু ব্যবস্থা অবলম্বন :—এমন বহু বালক আছে, যারা

* সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধার্থে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী ছুরি মারায় অভ্যস্ত হয়। পূর্ব্বে রাজনৈতিক কারণে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী আগ্নেয়াস্ত্র সহ ডাকাতিতে অভ্যস্ত হয়। আজও দেখা যায় যে বাঙ্গালীর ঐ শ্রেণীর লোকেরাই মাত্র ঐরূপ অপকার্য্য করিতে সক্ষম।

প্রারম্ভে প্রদমিত না হওয়ায় আখেরে খুনে ডাকাতে পরিণত হয়ে যায়। পড়শীদের অকারণে মারধোর ও অপমান করা ও কুলপী-বরফ বিনা পয়সায় কেড়ে খাওয়া প্রভৃতি হতে এদের অপরাধ-জীবন সুরু হয়। প্রত্যেক পল্লী ও মহল্লায় ঐরূপ দশ বিশ জন বালক যুবক প্রায়ই দেখা গিয়েছে। তাদের কৃত অপরাধ-সমূহ সামান্য বা রক্ষী-অগ্রাহ্য থাকায় প্রারম্ভে তাদের দমন করা হয় নি। আখেরে এই সকল অপরাধ-মুখী বালক ও যুবকগণ রক্ষীদের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়ে বড় বড় ডাকাত দলের সৃষ্টি করেছে।

[প্রথম অবস্থায় এদের অপরাধ সমূহ পুলিশ-অগ্রাহ্য (নন-কগ) হওয়ায় রক্ষিগণ এদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। এই অবস্থায় রক্ষী-অগ্রাহ্য-অপরাধ সমূহ নথিভুক্ত করে রক্ষীদের উচিত হবে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ প্রভৃতি ধারার সাহায্যেও তাদের দমন করা যেতে পারে।]

বহুস্থলে পড়শিগণ এই সকল গুণ্ডা প্রকৃতির যুবকদের বিরুদ্ধে রক্ষীদের সমীপে অভিযোগ দায়ের করতে সাহসী হয় নি। ঐরূপ স্থলে রক্ষীদের উচিত হবে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা এবং পড়শীদের সহিত মেলামেশা করে তাদের মনে সাহস সঞ্চার করা। পুলিশের মদতদারীর উপর আস্থা থাকলে বহু ব্যক্তি সাহস করে রক্ষীদের এই বিষয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। এই সকল যুবকগণের কেহ কেহ প্রভাবশালী বা ধনীব্যক্তিদের পুত্রাদিও হয়ে থাকে। কখনও কখনও এদের সংখ্যাও থাকে অত্যধিক। বহুস্থলে এদের কয়েকজন অপরাধ ক'রছে এবং বাকী কয়েকজন সাধু সেজে এদের স্বপক্ষে সাক্ষী দিয়েছে। কয়েকজন প্রভাবশালী পাড়াপড়শীকে নানাভাবে এরা হাতে রেখে থাকে এবং অপরাপর পড়শিগণ অসংশ্লিষ্ট থাকায় এদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে না।

এই সকল অপদলকে দমন করতে হলে রক্ষীদের উচিত হবে ঐ পল্লীর কোন ব্যক্তি, কে বা কারা? এবং ঐ স্থানের সংগঠন সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা। ঐ সকল যুবকের নাম ধাম সংগ্রহ করার পর উহাদের বিরোধী পক্ষীয়দের নাম ধাম সংগ্রহ করতে হবে। বিরোধী পক্ষীয় ব্যক্তিদের সকলেই সকল সময় যে সাধু প্রকৃতির হয় তা'ও নয়। বহুক্ষেত্রে একটি গুণ্ডা দলকে দমন করবার জন্যে বিরোধী গুণ্ডাদের নিকট হতে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়েছে। এইরূপ নীতিকে বলা হয় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। বহুক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষীয়দের সাহায্যে ফরিয়াদী ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই গুণ্ডারা দল বেঁধে রক্ষীদের বিরুদ্ধে প্রতি-অভিযোগও দায়ের করতে পারে। প্রথম দলের সাহায্যে দ্বিতীয় দলকে দমন করার পর, দ্বিতীয় দলের সাহায্যে প্রথম দলকে দমন করা যেতে পারে। তবে এইরূপ মতবাদ মাত্র ক্ষেত্র বিশেষে প্রযোজ্য। পারতপক্ষে রক্ষীদের উচিত উভয়দলকে একত্রে দমন করবার জন্য সাধারণ ভদ্র নাগরিকদের সাহায্য নেওয়া। কারণ এদের কোনও দলকে একবার আস্কারা দিলে আখেরে এদের দমন করা দুষ্কর হয়ে উঠবে।

এমন কয়েকটী অপরাধ আছে, যার সঙ্গে অপর কয়েকটীর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকে। কোনও এলাকায় বিবিধ প্রকার জুয়া খেলা চললে, কিংবা কোকেন ব্যবসা চালু হলে বা মাদকদ্রব্যের চোরা কারবার চললে, সেই এলাকায় চুরিচামারি অত্যধিক সংখ্যায় সংঘটিত হতে থাকে। এই জুয়া ও কোকেন প্রভৃতির চোরাকারবার বন্ধ হলে এলাকার চুরিচামারি কমে যায় এবং নূতন নূতন অপরাধীদলের সৃষ্টি হয় না। বহু ক্ষেত্রে জুয়া খেলার এবং নেশা করার জন্যে অর্থ সংগ্রহার্থে বহু ব্যক্তি অপরাধীতে পরিণত হয়েছে।

(৩) আদালতে সোপর্দ্দীকরণ :—সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পূর্ব্বাহ্নে ৫৪ বা ৫৫ ধারা মতে গ্রেপ্তার করেও অপরাধ-নিরোধ করা সম্ভব। সাধারণতঃ অপরাধ নিরোধার্থে ১০৯ ধারা এবং ১১০ ধারার সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। ১১০ ধারার মামলায় তুইটী বিষয় বিশেষ করে প্রমাণ করা প্রয়োজন, যথা—(ক) ঐ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে থাকে এবং উহা তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। (খ) ঐ ব্যক্তির পল্লীতে এই সম্পর্কে বিশেষ বদনাম আছে। প্রথমোক্ত বিষয় প্রমাণ করার জন্যে এমন সব অপরাধ সম্পর্কীয় নথিপত্র বা প্রাথমিক রিপোর্ট F. I. R. দায়ের করতে হবে যাতে ঐ অপরাধীদের নির্ভরযোগ্য রূপে সন্দেহ করা হয়েছে। নথিভুক্ত হয় নি—এমন সব অপরাধ সম্পর্কীয় প্রমাণও নির্ভরযোগ্য সাক্ষী দ্বারা দায়ের করা যেতে পারে। দ্বিতীয়োক্ত বিষয় প্রমাণ করার জন্যে স্বগ্রাম বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীর সাক্ষ্য দ্বারা উহা প্রমাণ করা চলে। কোনও পরদেশী বা বিদেশী বা সুদূরবাসী ব্যক্তিদের দ্বারা উহা প্রমাণ করলে চলবে না। উপরন্তু এই সকল সাক্ষী এমন ব্যক্তি হওয়া চাই যারা নিজেরা সৎ ব্যক্তি এবং যাদের সহিত অপরাধীমন্য ব্যক্তির কোনও ব্যক্তিগত বিবাদ বা বিসংবাদ নেই। এই সকল সাক্ষীদের অপরাধীর স্বপল্লী এবং পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী, এই উভয় স্থান হতে সংগ্রহ করতে হবে, এবং এরা এমন ব্যক্তি হবে যাদের পক্ষে ঐ অপরাধীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল থাকা সম্ভব। এতদ্ব্যতীত এমন আরও সাক্ষী সাবুত দায়ের করতে হবে; যারা প্রমাণ করবে যে ঐ ব্যক্তির কোনও আয়ের পন্থা নেই, কিংবা সে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করে থাকে, ঐ ব্যক্তির বহু নামকরা বদ লোক ও অপরাধীর সহিত মেলামেশা আছে, ঐ ব্যক্তি প্রায়ই বাড়ীতে রাত্রে গরহাজির থেকেছে এবং গরহাজিরের রাত্রেই দূরে বা নিকটে অপরাধ

সংঘটিত হয়েছে। এনকোয়ারি স্লিপের প্রত্যুত্তর, রক্ষীদের ওয়াচ-রিপোর্ট ও থানার নথীপত্র হতেও উহাদের এই গরহাজির প্রমাণ করা যেতে পারে। ১১০ ধারা মতে অপরাধ-নিরোধের কথা বলা হল। এইবার ১০৯ ধারা মতে অপরাধ-নিরোধের কথা বলব। এই ১০৯ ধারা প্রমাণ করতে হলে তিনটী বিষয় প্রমাণ করা চাই, যথা—ঐ অপরাধী গ্রেপ্তারের সময় অপরাধ করার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করেছিল বা তা করতে চেষ্টা করেছে, কিংবা ঐ ব্যক্তির ভরণপোষণের উপযোগী কোনও কাজ-কর্ম্ম নেই, কিংবা সে সেখানে কেন এসেছিল তার কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে নি। এই সকল কারণে স্থানীয় (local) অপরাধীদের এই ধারার আয়ত্তে আনা কদাচ সম্ভব হয়েছে।

ধনী ও মানী কালাবাজারীরা গ্রেপ্তারকে বিশেষ ক'রে ভয় করে। এইজন্য গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়লে তারা তাদের কারবার সাময়িকভাবে গুটিয়ে নিয়ে থাকে। এরা সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করে বিনা জামীনে হাজতে থাকা। তারা সর্ব্বদাই ভীত থাকে পাছে কোনও এক মামলায় জড়িয়ে পড়ে তাদের হাজত হয়। এর কারণ জামীন মঞ্জুর না হলে তাদের মান সম্মান তো যায়ই তা ছাড়া অনুপস্থিতির কারণে বহু অর্থ লোকসানও হয়ে যায়। তবে নিরীহ লোক না অযথা ধরা পড়ে তা'ও দেখা দরকার। অন্যথায় রক্ষীদের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ তো হতে পারেই এমন কি এইজন্যে নিজেরাও অপরাধীরূপে গণ্য হতে পারেন।

এমন কয়েকটী অপরাধ আছে যাহা দ্বারা সমগ্র দেশের ক্ষতি সাধন হয়। কিন্তু উহা নিরোধ করতে হলে দেশের একটী শহর বা বন্দরে ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই ফলপ্রসূ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাপড় প্রভৃতি পণ্যের কালোবাজারীর কথা বলা যেতে পারে। বিষয়টী

একটু বুঝিয়ে বলা যাক। কাপড় তৈরী হয় বোম্বাই প্রদেশে অধিক। ধরুন উহার কালোবাজারীর যা কিছু কারবার তা হয় কলিকাতায় এবং কলিকাতার বন্দর-শহর হয়ে বহির্ভারতের (Further India) দেশ সমূহে ও পূর্ব্ববঙ্গে অন্যায় ভাবে ঐ কাপড় প্রেরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া ধরুন এই শহরের এক বিশেষ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একদল এই কালো-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছে। এই ক্ষেত্রে মাত্র কলিকাতা শহর এবং বাংলার সীমান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই এই অপ-ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যাবে। এইখানে ধরপাকড় সুরু করলে প্রকৃত কালোবাজারীরা মনস্তাত্ত্বিক কারণে ভয় পেয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় বোম্বাই প্রদেশ হতে আর আমদানী করবে না। এর ফলে সমগ্র উপমহাদেশের কাপড়ের বাজারের মূল্য এমনিই কমে যাবে। অর্থাৎ কাপড়ের কালোবাজারী বা ব্ল্যাক মার্কেটিং একেবার বন্ধ। এই কারণে ক্ষেত্র বিশেষে সমগ্র দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা বুঝে ঐ দেশের অংশ বিশেষে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সমগ্র দেশই উপকৃত হবে।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণের অপর আর এক উপায় হচ্ছে এমন ব্যবস্থা করা যাতে অপরাধীরা অপরাধকে লাভজনক ব্যবসায় মনে না করতে পারে। গত মহাযুদ্ধের সময় এই দেশে এ্যামিরিকান ও ব্রিটীশ সামরিক বিভাগ এতো অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে এতো অধিক বেতনে নিযুক্ত করেছিল যে এক শ্রেণীর অপরাধীরা অপরাধ করার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করা অপেক্ষা বিনা বিপদে অধিক আয়ের পন্থারূপে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সামরিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা শ্রেয় মনে করেছিল এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ এই দেশের পূর্ব্বাঞ্চলের গ্রাম সমূহে চুরি-চামারির কার্য্য অন্ততঃ শ্রমিক শ্রেণীরা আর করে নি।

এই সম্পর্কে নিম্নে অপর একটী বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল। বিবৃতিটী সত্য না হলেও উহা প্রণিধান যোগ্য।

"ইটালীর এই শহরে আমরা এক চোরা-কারবার খুলেছিলাম। কিন্তু স্থানীয় রক্ষীরা এসে বললে, টাকা না দিলে ধরপাকড় করব। অপর দিকে জেলা রক্ষীরাও এসে বললে, না দিলে ওরা ছেড়ে দিলেও আমরা ধরব। কেন্দ্রীয় আফিস হতে সেই একই কথা বলে। আমরা দেখলাম সকলকেই কিছু কিছু দিতে হলে আমাদের লাভই থাকে না। অতএব কালো-কারবার আমরা এমনিই গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলাম।

সংবাদ সংগ্রহ বা রিপোর্ট সিস্‌টেম্

প্রয়োজনীয় সংবাদ সমূহের আশু আদান-প্রদানের উপরও অপরাধ-নিরোধ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এইজন্য চিরকালই রক্ষ বাহিনীর উপরই এই বিশেষ কার্য্যের ভার দেওয়া আছে। এই উল্লেখযোগ্য কর্ত্তব্য কার্য্যকে বলা হয় "রিপোর্ট সিস্‌টেম্"। এক্ষণে বিভিন্ন যুগের সংবাদ আদান-প্রদানের নিয়মকানুন সম্পর্কে আলোচনা করবো।

হিন্দুরাজত্ব কালে এই বিভাগটী সম্রাট বা রাজাদের খাস বিভাগ ছিল। শাসকবর্গের গোপন চর সারা দেশে ছড়িয়ে থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে রাজভবনে প্রদান করলে রাজা বা সম্রাট উহার প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ তাঁদের প্রকাশ্য দূত মারফৎ রাজ-কর্ম্মচারীদের ও জন-সাধারণের অবগতির জন্য সাম্রাজ্য বা রাজ্যের নানা স্থানে তা সরবরাহ করতেন। এই ভাবে দেশের একাংশের খবর উহার অন্যাংশের লোকেরাও যথাসম্ভব শীঘ্র অবগত হতে পারতো।

মোসলেম রাজত্বকালে এই সংবাদের আদান-প্রদান অনুরূপ ভাবেই সমাধা হয়েছে। মোগল রাজত্বকালে বাদশারা প্রতি সুবায় বা প্রভিন্সে, জিলায় বা ডিস্ট্রিক্টে ও চাকলায় বা সাবডিভিসনে সুদক্ষ চর নিযুক্ত করতেন। এই সকল বিশ্বাসী চরেরা স্থানীয় ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে মাসে একবার বা সপ্তাহে সপ্তাহে রাজধানীতে পত্র পাঠাতেন। এই সকল সংবাদ প্রাদেশিক শাসকদের প্রদত্ত সংবাদের সহিত মিলিয়ে দেখা হতো। ঐ সকল সংবাদ গোপনীয় না হলে উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করার রীতি ছিল। এইভাবে রাজধানীস্থ দরবারে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি দেশের নানা স্থানের সংবাদ শুনতে পেতেন। রাজধানীর এই সভায় বাদশার অধীনস্থ সেনাপতি শাসনকর্ত্তা এবং করদ রাজারা ঐ সকল সংবাদ লিপিবদ্ধ করার জন্যে আপন আপন সংবাদ লেখক বা 'ওয়াকেয়া-নবীস' মোতায়েন রাখতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা এবং করদ রাজারা ঐ সকল সংবাদ তাদের 'ওয়াকেয়া-নবীস'দের মারফৎ পাওয়ার পর উহার প্রয়োজনীয় অংশ আপন আপন প্রাদেশিক দরবারে অনুরূপ ভাবে পাঠ করতেন। ফৌজদার, থানাদার প্রভৃতি ছোট ছোট প্রদেশীয় রাজকর্ম্মচারীরা ঐ সকল সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তার বা করদ রাজার সভায় অনুরূপ ভাবে নিজস্ব পত্র-লেখক বহাল রাখতেন। ইহার পর প্রাদেশিক রাজধানী হতে জমিদার, থানাদার ও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মারফৎ প্রতিটী গ্রামে—সমগ্র ভারতের প্রতিটী প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এই সকল সংবাদ লিপিকে বলা হতো 'আখবার্', বহু বচনে 'আখবারাৎ'। উপরন্তু তৎকালীন জমীদার শাসকগণ তাদের অধীনস্থ, পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের সাহায্যে তাঁর এলাকার অপরাধ সম্পর্কীয় ও অন্যান্য

প্রতিটী সংবাদ সংগ্রহ করে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার কর্ণগোচর করতেন। এই ভাবে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদ সমূহ অবগত হয়ে অধস্তন কর্ম্মচারীদের ঐ সম্পর্কে নানাবিধ নির্দ্দেশ ও উপদেশ পাঠাতেন।

ব্রিটিশ ভারতেও গ্রাম্য সংবাদ পূর্ব্বের ন্যায় চৌকিদারদের মারফৎ সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটী গ্রামের চৌকিদার থানাদারের নিকট পূর্ব্বের মতই স্ব স্ব গ্রামের প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদান করে থাকে এবং থানাদারগণ উহা সংগ্রহ করে জিলাকর্ত্তৃপক্ষ মারফৎ প্রাদেশিক সরকারের নিকট উহা প্রেরণ করেছেন। অধুনা কালে দেশের সংবাদপত্র সমূহ বহু ক্ষেত্রে এঁদের নিকট হতে সংবাদ সংগ্রহ করে সারা দেশে প্রচার করে থাকেন।

কলিকাতার ন্যায় বড় বড় শহরে প্রতিটী থানার ঘটনা থানাদাররা সংগ্রহ করে উপ-নগরপালের মারফৎ নগরপালের নিকট প্রতিদিন পাঠিয়ে থাকেন। ওই সকল সংবাদের প্রয়োজনীয় অংশ সংবাদপত্র-সেবীরা এঁদের নিকট হতে সংগ্রহ করে সারা দেশকে উহা অবগত করিয়েছেন।

অপ-বিজ্ঞান—সোপর্দ্দীকরণ

অপরাধ-তদন্ত দ্বারা অপরাধ-নির্ণয় করার পর অপরাধীকে আদালতে বিচারের জন্য হাজির করে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যসাবুত হাকিমের নিকট পেশ করা হয়ে থাকে। এই বিশেষ কার্য্যকে বলা হয় সোপর্দ্দীকরণ বা প্রসিকিউসন। সোপর্দ্দীকৃত অপরাধীকে সাধারণতঃ জেল হাজতে রাখা হয় কিংবা সে জামীনে মুক্ত থেকে নির্দ্ধারিত দিনে আদালতে আসে। সাধারণ মামলা সমূহের বিচার নিম্ন আদালত করতে সক্ষম। কিন্তু খুন

প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মামলা নিম্ন আদালত হতে বিচারের জন্য দায়রা বা উচ্চ আদালত সমূহে পাঠানো হয়ে থাকে।

পূর্ব্বে রক্ষীদের মধ্য হতে এক দল রক্ষীকে পুলিশের পক্ষ হতে সোপর্দ্দীকরণের কার্য্যে নিযুক্ত রাখা হতো। এদের বলা হতো কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার বা সাব-ইন্‌স্পেক্টার বা কোর্টবাবু। পুলিশি তদন্তের রীতিনীতি সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত থাকায় এরা বহু সুদক্ষ আইন-ব্যবসায়ী অপেক্ষা এই কার্য্যে অধিকতর দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। এর কারণ পুলিশি প্রসিডিওর এমন এক বস্তু যাহা সাধারণ আইনজ্ঞদের বোধগম্য হতে পারে না। এই একই কারণে যে সকল রক্ষী অবসর গ্রহণ করবার পর উকিলের ব্যবসা গ্রহণ করেছে, তারা পুলিশি মামলা সমূহে অপরাধীদের পক্ষে নিযুক্ত হয়ে উহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পেরেছে। অধুনাকালে কোনও কোনও শহরে আইন ব্যবসায়ী উকিলদের মধ্য হতে বহু সোপর্দ্দীকারক এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। কারণ কেহ কেহ মনে করেন যে সুষ্ঠু বিচারের জন্য শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ন্যায় পুলিশি-শাসন ও সোপর্দ্দীকরণ ব্যবস্থাও পৃথক ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। দায়রা ও উচ্চ আদালতে সোপর্দ্দীকরণ কার্য্যের জন্য একজন আইন বিশেষজ্ঞ উকিল বা ব্যারিষ্টার ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ হতেই নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। প্রাচীন ভারতে এই উকিলের কার্য্য যারা করতো তাদের বলা হতো 'ভাট'। মধ্যযুগে মুসলমান আমলে কাজীর আদালতে যারা উকিলের কার্য্য করতো তাদের উকিল বা ভকিল বলা হতো। আদালত বসা মাত্র একজন চেঁচিয়ে উঠতো আসামী, ফরিয়াদী, আইনদার হাজির—র—

মামলা সুষ্ঠু ভাবে আদালতে পেশ করার যা কিছু দায়িত্ব তা মুলতঃ সোপর্দ্দীকারকের, কিন্তু তদন্তকারী অফিসার স্বয়ং এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য

না করলে বহু মামলাই ফেঁসে যাবে। তদন্তকারী অফিসারের উচিত হবে প্রতিটি করণীয় কার্য্য সোপর্দ্দকারককে প্রয়োজন বোধে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কোন সাক্ষী উৎকোচে বশীভূত হয়েছে তা একমাত্র তদন্তকারী রক্ষী জ্ঞাত হতে সক্ষম। সময় মত সোপর্দ্দীকারককে এই সকল তথ্য জানিয়ে রাখতে তদন্তকারী রক্ষী বাধ্য। বহু দিনের ব্যবধানে সাক্ষিগণ তাদের পূর্ব্ব প্রদত্ত বিবৃতির বহু অংশ ভুলে গিয়ে থাকেন। সাক্ষী পরীক্ষা দ্বারা তাঁদের ঐ সকল পূর্ব্ব বিবৃতি মনে করিয়ে দেওয়ারও রীতি আছে। কোন সাক্ষী কি কথা বলবে তা পূর্ব্বে না জেনে তাদের কোনও ক্ষেত্রেই আদালতে পেশ করা উচিত হবে না। আসামী পক্ষীয় সাক্ষীদের জেরা করার সময় তাদের কি কি প্রশ্ন করা উচিত হবে সেই সম্পর্কেও তদন্তকারী রক্ষিগণ সোপর্দ্দকদের বহু তথ্য অবগত করাতে সক্ষম। এই জন্য প্রয়োজন হলে ঐ সকল সাক্ষীদের চরিত্রাদি, নিরপেক্ষতা এবং আসামীর সহিত তার আত্মীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কে গোপন তদন্ত করাও উচিত। যদি উচিত মনে হয় তা'হলে আদালতে উপস্থিত সকল সাক্ষীকে হাকিমের নিকট পেশ না করে বিচারের জন্য অন্য একটি দিন গ্রহণ করাও ভাল। আদালতের ভিতরে যখন বিচার চলে সেই সময় উহার বাহিরে সাক্ষীদের নিকট একজন রক্ষী মোতায়েন থাকা উচিত, যাতে বিপক্ষ-পক্ষীয়রা তাদের সহিত আলাপ জমিয়ে তাদের বশীভূত করে না ফেলতে পারে।

পুলিশি মামলা ফাঁসিয়ে দেবার জন্যে কোনও কোনও বিপক্ষ পক্ষীয় উকিলরা যে সকল কায়দার আশ্রয় নেন, সেই সম্বন্ধে রক্ষীমাত্রেরই যথেষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত। তা না হলে মামলা রক্ষার্থে সময় মত কোনও ব্যবস্থাই তাঁরা অবলম্বন করতে পারবেন না। ঐরূপ বহু কায়দার মধ্যে মাত্র কয়েকটী কায়দা আমি নিম্নে বিবৃত করলাম।

(১) এমন বহু আসামী পক্ষীয় উকীল আছেন যাঁরা আসামী অসুস্থ বলে ডাক্তারী সার্টিফিকেট পেশ করে বারে বারে মামলার তারিখ পেছিয়ে দেন। তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে বারে বারে ফরিয়াদী পক্ষীয় সাক্ষীদের আদালতে বৃথা হাজির করে তাদের নাস্তানাবুদ বা হায়রাণি করা। বারে বারে এই সকল সাক্ষীদের সাধারণ জীবনযাত্রা ব্যাহত হলে তাদের আর্থিক ক্ষতি হয় অপরিসীম এবং আখেরে তাঁরা পুলিশের নাগালের বাইরে এমনিই সরে পড়েন।

(২) এমন বহু বিপক্ষ পক্ষীয় উকিল আছেন যাঁরা বেকায়দা বুঝে বিচাররত হাকিমের সহিত ছুতায় নাতায় কলহ করে উচ্চ আদালতে নালিশ জানিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে মামলা অপর আর এক আদালতে বিচারের জন্য স্থানান্তরিত করেছেন। এর ফলে রক্ষীদের পুনরায় পূর্ব্বিকার সাক্ষীদের এই নূতন আদালতে হাজির করতে হয়েছে। বহু দিনের ব্যবধানে এই সকল সাক্ষীর কেহ কেহ ঠিকানা পাল্টে অন্যত্র গমন করেছেন এবং তাদের খুঁজে বার করা সম্ভব হয় নি। এদের মধ্যে যাদের খুঁজে পাওয়া গিয়েছে তাদের এই দুইবার প্রদত্ত সাক্ষ্যর মধ্যে স্বভাবতঃ বহু গরমিল থেকে গিয়েছে এবং এর সুযোগ আসামী পক্ষীয়রা পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করেছেন।

(৩) এই সকল আসামী পক্ষীয় ব্যক্তিদের কেহ কেহ লোক মারফৎ বা স্বয়ং ফরিয়াদী পক্ষীয় সাক্ষীদের উৎকোচ দিয়ে মিথ্যা বলিয়েছেন কিংবা তাদের অর্থ দিয়ে সাময়িক ভাবে পুলিশের নাগালের বাইরে সরিয়ে দিয়েছেন। এদের কেহ কেহ আবার আসামী পক্ষে বহু মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করে তাদের আদালতে পেশ করেছেন।

(৪) এই সকল আসামী পক্ষীয় ব্যক্তিদের কেহ কেহ বাড়ীওয়ালা

ও স্থানীয় ব্যক্তিদের হাত করে মনিবকে ভৃত্য এবং ভৃত্যকে মনিব রূপে আদালতে প্রমাণ করেছেন, কিংবা প্রমাণ করেছেন যে ঐ বাড়ী অন্য এক ব্যক্তিকে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। চোরাই বা নিষিদ্ধ দ্রব্যের হেপাজতির দায় এড়ানোর জন্য এইরূপ করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও আসামীর নামে অন্য এক মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে বা কবর দিয়ে এরা রেজিষ্টারদের নিকট হতে সার্টিফিকেট এনে প্রমাণ করেছেন যে ঐ আসামী এখন মৃত। এই ভাবে তাঁরা কোনও কোনও পুলিশি মামলা অতি সহজে খারিজ করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। সাধারণতঃ অজ্ঞাত গোত্র শহুরে আসামিগণ এইরূপ চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।

(৫) কোনও কোনও আসামী পক্ষীয় ব্যক্তি বা উকিল তদন্তকারী রক্ষীদের উপর বহু মিথ্যা অভিযোগ বা মামলা দায়ের করে তাদের হায়রাণি করে বা বেকায়দায় ফেলে আসামীদের মুক্ত করতে কিংবা তাঁদের ঐ মামলা উঠিয়ে নিতে বা মিটিয়ে নিতে বাধ্য করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

ফরিয়াদী পক্ষীয় সাক্ষীদের কেবল মাত্র পরীক্ষা করে তাদের পূর্ব্ব বিবৃতি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেই হলো না; সেই সঙ্গে তাদের কি কি জেরা বিপক্ষপক্ষীয় উকিলরা করতে পারে এবং ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তরই বা কি হওয়া উচিত তা'ও তাদের বলে দিতে হবে। তা না হলে সত্য কথা বলতে প্রস্তুত এই সকল সাধু ব্যক্তিরা খেই হারা হয়ে আবল তাবল কথা বললেও বলতে পারে। এছাড়া ঐ সকল সাক্ষীদের পূর্ব্বাহ্লেই সাহস দিয়ে বলে রাখা উচিত যে বিপক্ষ পক্ষীয়রা তাদের অযথা ধমকাধমকি করতে পারে, কিন্তু তারা যেন তাতে উত্তেজিত বা ভীত না হয়ে পড়ে।

তাদের পূর্ব্বাহ্নেই বলে রাখা উচিত যে জেরার সময় তাকে রাগিয়ে দেবার জন্য ইচ্ছা করেই আসামীর উকীল চেষ্টা করবেন। কারণ, ক্রোধ সকল ক্ষেত্রেই মানুষের বুদ্ধিভ্রংশের সহায়ক। আমি এমন এক সাক্ষীকে জানি যাকে জেরা করা হয়, আপনি কি অমুক বাবুর বাড়ীতে পাচক ছিলেন? এইরূপ এক প্রশ্নে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি উত্তর করেছিলেন, কি এতো বড় কথা। জানেন আমার মাসিক আয় হাজার টাকা। এই উত্তরটী হাকিম লিখে নিলে উহার নকল বিপক্ষ পক্ষীয়রা আয়কর আফিসে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় দেখা গিয়েছে যে একবার রাগিয়ে দিতে পারলে সাক্ষিগণ উত্তেজনার কারণে প্রতিটী প্রশ্নের উত্তরে না বুঝেই বলেছে হাঁ।

জেরার উত্তর দানের রীতি নীতি সম্বন্ধে রক্ষিগণেরও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটী প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া মাত্র রক্ষীদের ভেবে দেখা উচিত যে কি উদ্দেশ্যে ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত হলো। অর্থাৎ কোন বিষয়টী তাকে দিয়ে এরা বলিয়ে নিতে চায়। এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝা মাত্র উহার উত্তর দেওয়া সহজ হবে। তবে কোনও প্রশ্নের উত্তরে উহা অন্যায় ভাবে এড়িয়ে যাবার জন্যে আজে বাজে কথা বলা কোনও ক্ষেত্রেই উচিত হবে না। প্রতিটী প্রশ্নের উত্তর 'টু দি পয়েন্টে' ও নিরপেক্ষ ভাবে না দিলে তদন্তকারী রক্ষী সাক্ষীদের উপর বিচারকের অযথা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে।

সাক্ষ্য সাবুত আদালতের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে দায়ের করা প্রয়োজন। এমন বহু ঘটনা ঘটে যা সত্য হলেও সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে না। পারত পক্ষে সোপর্দ্দকদের উচিত হবে যে ঐ সকল ঘটনা সাক্ষীর সাক্ষ্য হতে উহ্য রাখা।

সাক্ষীদের পরীক্ষা বা জেরা করার সময় মানুষের সাধারণ মনস্তত্ব

সম্বন্ধে সোপর্দ্দকের অবহিত থাকা উচিত। স্বয়ং ক্রুদ্ধ হলে তাদের আদপেই চলবে না। বরং ক্রোধ ও বিরক্তি দমন করে মিষ্টি কথায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওয়ানো উচিত। নিম্নে এই সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"ওয়াটগঞ্জের পোলের পাশে এক বৃদ্ধা রমণী পান বিক্রয় করতো। একমাত্র এই বৃদ্ধাই ঐ মোটর দুর্ঘটনা পরিলক্ষ্য করে। পুলিশের পক্ষে তার সাক্ষ্য শেষ হলে আসামী পক্ষীয় উকিল সুমিষ্ট ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা মা, তোমার একমাত্র পোলাও মারা গেছে না ?' চোখের জল ফেলতে ফেলতে বুড়ী 'হাঁ, বাবা' বলার পর উকিল বাবু পুনরায় তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'সেইদিন হতে তুমি খালি কাঁদো। আহা অতো বড় ছেলে গেলো কাঁদবেই তো। কেঁদে কেঁদে দৃষ্টিটুকু পর্য্যন্ত তোমার গেছে আহা, কি করেই বা তা থাকবে বলো, অতে বড়ো ছেলে। দূরের জিনিস ঠাওর করা কি এ বয়সে তোমার পক্ষে আর সম্ভব ?' বলা বাহুল্য এইরূপ প্রতিটী প্রশ্নে বিচলিত হয়ে বৃদ্ধা উত্তর করেছিল, 'হাঁ বাবা।' এই ভাবে মামলা ফেঁসে যাবার উপক্রম হলে ফরিয়াদীর পক্ষের উকিল বিধায় আমি হাকিমের অনুমতি নিয়ে বৃদ্ধাকে অন্যরূপে প্রশ্ন করতে সুরু করি, 'আহা মা, কি কপাল তোমার একমাত্র পোলা। কিন্তু কি করবে বলো, খেতেও হবে পরতেও হবে, বেরুতেও হবে। এই বুড়ো বয়সেও তোমাকে গাড়ী ঘোড়া দেখে পথ পার হয়ে এতো দূরে এসে পান বেচতে হয়। সেকেলে হাড় তাই না অতো দূরের জিনিষপত্তর দেখে চলাফিরা করতে পারো ?' আমার এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধা উত্তর করেছিল, 'হাঁ বাবা, তাই।' এইভাবে আমার এই মামলা পুনর্জীবিত করে তুলতে পেরেছিলাম।"

সাক্ষ্য বিভ্রাট সামলে নেবার জন্যে বহুবিধ গল্প আছে। কোনও

এক মামলায় প্রথম সাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলে যে দলিল মাদুরের উপর বসে লেখা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সাক্ষী বলে, দলিল তক্তপোষের উপর বসে লেখা হয়েছে। এই কথা শুনে তৃতীয় সাক্ষী বলেছিল, 'আজ্ঞে তক্তপোষ বললেও হয়, মাদুর বললেও হয়। কারণ তক্তপোষের উপর মাদুর পাতা ছিল।' কিন্তু ভিতরে অসাক্ষী কাউকে পাঠিয়ে সাক্ষীর জবানী শুনে বাইরে এসে অন্যান্য সাক্ষীদের তা শুনিয়ে দেওয়া একাধারে রীতি ও নীতি বিরুদ্ধ। বিবিধ সাক্ষীর সাক্ষ্যর মধ্যে সামঞ্জস্য আনবার জন্যে এইরূপ অপব্যবস্থা অপরাধের সামিল। সুষ্ঠু বিচারকার্য্যে সাহায্য করতে রক্ষিগণও বাধ্য। এই জন্য পূর্ব্বাহ্নে সাক্ষীদের পরীক্ষা করলেও তাদের কোনও কিছু শিখিয়ে দেওয়া অনুচিত।

আদালতে সাক্ষ্য পরিবেশনের সময় সোপর্দ্দকের প্রভূত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সম্ভাব্য 'ডিফেন্স' কি হবে বা হতে পারে তা বুঝে বা অনুমান করে সাক্ষ্য পরিবেশন করতে হবে। নিম্নে এই সম্পর্কে উদ্ধৃত বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

"এই দিন আদালতে আসামী পক্ষ হতে বলা হলো যে সে ঘটনার দিন ঐ বাজারে দ্রব্যাদি কিনতে গিয়েছিল পকেট কাটতে যায় নি। এই কথা শুনে আমি একজন অতিরিক্ত সাক্ষীকে আহ্বান করি। এই অতিরিক্ত সাক্ষী থানার নথিপত্র এবং সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করে আসামীকে যখন থানায় আনা হয়, তখন তার নিকট একটী কপর্দ্দকও ছিল না। তার দেহ তল্লাস করে থানার নথীপত্রে ইহা সুস্পষ্টরূপে লেখা আছে। যেহেতু তার নিকট কোনও মুদ্রা বা দ্রব্য পাওয়া যায় নি সেই হেতু তার বাজার করতে যাওয়ার কাহিনীও সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

এই সম্পর্কে অপর এক কাহিনীর কথাও আমি আপনাদের বলব।

"কোনও এক পেট্রোল পাম্পের মালিকের বাটীতে (ফার্ম্মে নয়) ১০০৲ টাকা মূল্যের জাল রেজগী পাওয়া যায়। ঐ ব্যক্তির এক ভৃত্য উহার কয়েকটী বাজারে চালাতে গিয়ে ধরা পড়ায় এই মামলা রুজু করা হয়। আত্ম-পক্ষ সমর্থনে আসামী বলে যে ঐ জাল মুদ্রা তাদের ফার্ম্মে ক্রেতারা তাদের অজ্ঞাতে দিয়ে গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমি দোকান হতে গৃহীত তাদের খাতাপত্র পেশ করে দেখাই যে ঐ সম্পর্কে কোনও তথ্যই তাদের হিসাব বইতে লেখা নাই।"

যে সকল আদালতে জুরীর সাহায্যে বিচার করা হয়, সেই সকল আদালতে সোপর্দ্দক কার্য্য আরও কঠিন। কারণ এইখানে হাকিমের সহিত জুরী মহোদয়দেরও বিশ্বাস উৎপাদন করার প্রয়োজন। কিরূপ বচন-বিন্যাস দ্বারা আসামীর পক্ষ হতে জুরীদের মোহিত করার চেষ্টা হয় বা তা হতে পারে তা নিম্নের উক্তি হতে বুঝা যাবে।

"জুরী মহোদয়গণ! ঐ দেখুন আসামী কৃষ্ণচন্দ্রের সাধ্বী স্ত্রী বসে রয়েছেন। চেয়ে দেখুন ঐ সতী ললনার মাথার টকটকে লাল সিঁদুরের দিকে। আজ আপনাদের একটীমাত্র কথার উপর নির্ভর করছে ঐ সাধ্বী স্ত্রীর মাথার সিঁদুর পুঁছে যাবে বা যাবে না। ভেবে দেখুন আপনাদের বিধবা পুত্রবধূ ও বিধবা কন্যার কথা, ভেবে দেখুন তাদের অসহনীয় বৈধব্য যন্ত্রণার কথা। ঐ দেখুন আসামী সুবলচন্দ্রের শিশু পুত্রের দিকে। আপনাদের একটী কথার উপর নির্ভর করছে ঐ অবোধ নির্দ্দোষ শিশুর বাবা বলা চিরতরে ঘুচে যাবে বা যাবে না। মনে রাখবেন খুনী মামলায় দোষী বলার একমাত্র অর্থ হচ্ছে ফাঁসী। কারণ অন্য কোনও কম সাজা এতে দেওয়া যায় না।"

এইরূপ ক্ষেত্রে সোপর্দ্দকের জুরীদিগকে নিহত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রের কথাও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। বলাৎকার প্রভৃতি মামলায়

সাধারণতঃ জুরীদের সহানুভূতি ধর্ষিতা নারীর দিকে আসে, বিশেষ করে যদি তার চোখ হতে জল পড়ে। ধর্ষিতা নারীর সামাজিক অপমানের সহিত মৃত্যু যন্ত্রণার তুলনা করলেও সুফল ফলবে। অন্যদিকে ডিফেন্স হতে বলা হয় যে ঐ ধর্ষিতা নারীর চরিত্র দোষ ছিল ইত্যাদি। ঐ নারী বস্তীর বা অর্দ্ধ গৃহস্থ বাড়ীর মেয়ে হলে আসামী পক্ষের আরও সুবিধা। এইজন্য বিশেষ ক্ষেত্রে জুরীদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে সমাজে বহু স্তর আছে। এক এক স্তরের জীবনযাত্রা-প্রণালী এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। তা ছাড়া আপন জন্মের জন্য কেহ দায়ী থাকে না। কেউ বেশ্যা হলে তাকেও রক্ষা করতে দেশের আইন সঙ্গতভাবে বাধ্য; ইত্যাদি বচন দ্বারা জুরীদের মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব। সোপর্দ্দকদের এই সকল কারণে মামলার পরিশেষে আরগুমেণ্ট বা বাগবিতণ্ডা রীতি সাবধানে শিক্ষা করা উচিত হবে।

কিরূপে বিপক্ষপক্ষীয়দের কেহ কেহ বচন বিন্যাস দ্বারা জুরীদের মন ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"১৯৪০ সালে আমি 'ক' থানায় কর্ম্মে বাহাল ছিলাম। এই সময় জনৈকা ধর্ষিতা নারীকে পড়শীরা কোনও এক ডাক্তারের নিকট প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যায়। কিন্তু ডাক্তার সকল কথা শুনে তাকে চিকিৎসা না করে থানায় নিয়ে যাবার জন্যে উপদেশ দেন। এরপর পড়শীরা তাকে ভুল করে অন্য এলাকার এক থানায় নিয়ে যায়। ঐ থানায় এক নব নিযুক্ত তরুণ রক্ষী ঘটনাটী অন্য থানার এলাকায় ঘটেছে বুঝে তার বিবৃতি গ্রহণ ও মামলা সম্পর্কে কোনও আশু ব্যবস্থা না করেই তাদের আমার থানায় পাঠিয়ে দিলেন। এর ফলে আমাকেই তাদের যা কিছু ভুলচুক তা সেরে নিতে হয়েছিল।

পাছে কথা উঠে যে ঐ ডাক্তার কেন ঐ নারীকে কানুন মত ফার্ষ্ট এড্ তখুনি দেন নি। সেই ভয়ে ঐ ডাক্তার আদালতে বলে যে ধর্ষিতা নারী তাকে ধর্ষণের কথা বলে নি। এই একই কারণে অপর থানার উপরোক্ত তরুণ অফিসারটীও বলে যে ধর্ষণের কথা তাকে আদপেই জানানো হয় নি। ঐ কথা তাঁকে জানানো হলে আইন মত কিছুটা তদন্ত করে তিনি ঐ মামলা আমার থানায় পাঠিয়ে দিতেন।"

এই মামলায় আসামী পক্ষীয়েরা দায়রা কোর্টে যে বিতাণ্ডা উত্থাপন করেন, তার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"জুরী মহোদয়গণ! আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে ঐ ডাক্তারবাবুর এই মামলায় কোনও স্বার্থই নেই। তা' ছাড়া তাঁর মত একজন শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান মিথ্যা বলবেনই বা কেন? আপনারা ঐ তরুণ পুলিশ অফিসারের সাক্ষ্যও শুনেছেন। মাত্র দুই বৎসরের চাকুরী তাঁর এই রক্ষী বিভাগে। এই যুবক এখনো শেখেনি শঠতা, শেখেনি কোনও খলতা ও মিথ্যা কথা। এর পর এই মামলা যখন ঐ ঝানু পুরাতন অফিসারের হাতে পড়লো, তখনি মাত্র তাতে গজালো বহু শাখা ও প্রশাখা। দেখুন না, ওঁর চেহারাটা, দেখুন না, ঐতো বসে রয়েছেন ওখানে।' এর পর ঐ উকিল আমাকে নিম্নস্বরে অথচ জুরীদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'ছিঃ অমুক বাবু এ সব ভালো নয়। এতে পাপ হয়। এরকম আর কক্ষনো করবেন না।' বলা বাহুল্য জজ সাহেব তখুনি প্রতিবাদ করে ঐ উকিল প্রবরকে থামিয়ে দিয়েছিলেন তা না হলে আমার সম্পর্কে তিনি আরও কতো কি কথা বলতেন কে জানে?"

এই সকল কারণে তদন্তের ব্যাপারে কোনও রক্ষী ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুলচুক করলে তাকে বিভাগীয় শাসনতান্ত্রিক শাস্তি প্রদান করার

নিয়ম আছে। বিচারের সময় এই শাস্তি প্রদানের কথা উল্লেখ করলে তারা এই সকল ভুলচুকের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন।

তদন্তকারী রক্ষীদের সহিত পাচকদের, সোপর্দ্দকদের সহিত পরিবেশকদের এবং বিচারকদের সহিত খাদ্য পরীক্ষকদের তুলনা করা চলে। খাদ্যে কি আছে বা না আছে তা পাচকরা উত্তমরূপে জানেন। যারা ঐ খাদ্য পরিবেশন করেন তাদের পাচকদের কথার উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যারা চেকে চেকে ঐ খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করেন তাদের ভুলচুক হওয়া অসম্ভব নয়। এইজন্য সুষ্ঠুরূপে বিচারকার্য্যের জন্য যা কিছু দায়িত্ব তা তদন্তকারী অফিসারদেরই, বলে আমি মনে করি।

স্মারকলিপি লিখন

স্মারকলিপি লিখনকে ইংরাজীতে বলা হয় 'ডায়েরী' লিখা। তারিখ বা দিনপঞ্জি এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত সম্পর্কীয় প্রতিটি করণীয় কার্য্য এবং ঐরূপ কার্য্য দ্বারা পরিজ্ঞাত বা তদন্তলব্ধ প্রতিটি তথ্য বা ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সহজবোধ্যরূপে লিখে রাখতে রক্ষীমাত্রই আইনতঃ বাধ্য। কোনও কোনও স্থানের পুলিশকে প্রতিটি সাক্ষীর জবানী বা বিবৃতি পৃথক পৃথক রূপে লিখে নিতে হয়, কিন্তু কোনও কোনও স্থানের পুলিশ বিভিন্ন সাক্ষীদের নিকট শুনে জ্ঞাতব্য বিষয় একত্রে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি নমুনা উদ্ধৃত করা হলো।

"শ্রীধর মল্লিক, ৫নং খানসামা লেন, হরিসাধন রায়, ২নং দেব লেন ও মতিরাম, ১০০নং রতন ষ্ট্রীট, ইহাদের নিকট হতে আমি নিম্নোক্ত

বিষয় অবগত হতে পেরেছি। তাঁদের বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন এই যে ১২ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ৭টায় এই আসামী ট্রামে উঠে ফরিয়াদী শ্রীধর মল্লিকের পকেট হতে একটি গিনি সহ মণিব্যাগ অতর্কিতে উঠিয়ে নেয়। এই সময় শ্রীধরবাবু তাঁর জামায় টান অনুভব করে ফিরে দেখেন। ঘটনাটি আরোহী হরিসাধন রায় দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলে অপর আরোহী মতিরাম তাকে ব্যাগসহ ধরে ফেলে, ইত্যাদি।"

প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে পুলিশের ডায়েরী লিখন পদ্ধতি উপরে উদ্ধৃত করা হলো। এই প্রথায় কে কতটুকু বলেছে তা বুঝবার উপায় নেই। আদালতের জেরার সময় তাদের কাউকে বলা যায় নি যে তুমি এই কথা পুলিশের কাছে বলেছো বা তা তাদের কাছে আদপেই বলো নি। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতিতে পুলিশ প্রতিটি সাক্ষীর বিবৃতি নিম্নোক্ত রূপে পৃথক পৃথক পাতায় লিখে থাকেন।

"শ্রীযুক্ত শ্রীধর মল্লিক, পিতার নাম ৺পরিতোষ মল্লিক; তৎ প্রদত্ত বিবৃতি—

আমার নাম শ্রীধর মল্লিক। পিতার নাম ৺পরিতোষ মল্লিক। দেশের ঠিকানা, পোঃ ও গ্রাম হালিশা, জিলা খুলনা। কলিকাতার নিবাস, ৫নং খানসামা লেন। আমি একজন বহুবাজার ষ্ট্রীট পোষ্ট্ অফিসের কেরাণী। ১২ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ৭টায় আমি রসারোডে কালীঘাট-গামী এক ট্রামের আরোহী ছিলাম। গাড়ীখানা জগুবাবুর বাজারের নিকট পৌছলে আমি আমার জামায় টান অনুভব করি এবং সেই সঙ্গে একজনকে বলতে শুনি, 'ঐ পকেট মারলে'। পিছন ফিরে দেখি সাক্ষী মতিরামবাবু ঐ আসামীকে মণিব্যাগসহ ধরে ফেলেছে। হরি-সাধনবাবু এই সময় আমাকে বলেন যে তিনিই আসামীকে আমার পকেট মারতে দেখে ঐরূপে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। সাক্ষী মতিরাম আমাকে

এই সময় বলেন যে অপর সাক্ষীকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনে তিনি দেখেন আসামী ব্যাগসহ পালিয়ে যাচ্ছে। এই দেখে ছুটে গিয়ে তিনি আসামীকে ধরে ফেললেন। এর পর আমি দেখি আমার পকেটে আমার মণিব্যাগ নেই। আমি আসামীর হাতে আমার ব্যাগ সনাক্ত করে উহা দাবী করি। এবং আসামীসহ সকলে থানায় এসে এই এজাহার দিলাম।"

প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে পুলিশ প্রতিটি সাক্ষীর বিবৃতি পৃথক পৃথক রূপে ডায়েরীর পৃথক পৃথক পত্রে উপরোক্তরূপে লিখে রাখেন। তদুপরি উহাদের প্রতিটি বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার মূল ডাইরীতে তাঁরা থার্ডপারসেনে লিখে রেখেছেন। কারণ প্রয়োজন বোধে ফাষ্ট পারসেনে লিখিত পৃথক সম্পূর্ণ বিবৃতিটি বিচারের সময় হাকিমের হুকুমানুসারে আদালতে দাখিল করতে হযেছে। যে সকল তদন্তকারী রক্ষী ঐ বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের দ্বারা ঐ বিবৃতি আদালতে দাখিল করিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষীয় উকিলগণ আদালতে প্রদত্ত কোনও সাক্ষীর বিবৃতি কনট্রাডিক্ট করে থাকেন। এইরূপ অবস্থায় পরে প্রয়োজন হলে সোপর্দ্দক এবং তদন্তকারী অফিসারগণ ঐ সাক্ষীর থার্ডপারশেনে লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ব্যবহার করতে পারবেন। থার্ডপারশেনে লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতির নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"অদ্য ১২ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা সাতটায় ফরিয়াদী শ্রীধর মল্লিক ও সাক্ষী হরিসাধন রায় ও মতিরাম, আসামী সুখেন রাওকে ধৃতিকৃত অবস্থায় এই থানায় এনে তার বিরুদ্ধে ৫নং F. I. R.-এ উক্ত ভাঃ-দঃ-বিঃ-র ৩৭৯ মতে এক মামলা রুজু করিল।

ফরিয়াদী শ্রীধর মল্লিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে অবগত হলাম যে তিনি ১২ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ৭টায় কালীঘাটগামী এক ট্রামের আরোহী ছিলেন। গাড়ীটী জগুবাবুর বাজার বরাবর পৌছলে তাঁর সার্ট-জামার

ডান পকেটে এক টান অনুভব করেন। এই সময় সাক্ষী হরিসাধনবাবুকে বলতে শুনেন ঐ পকেট মারলে। এর পর পিছন ফিরে তিনি দেখলেন যে তাঁর পকেটে গিনিসহ চামড়ার ব্যাগ নাই। মুখ তুলে তিনি দেখলেন যে সাক্ষী মতিরাম ট্রামের গেটের কাছে আসামী অমুককে ধরে রেখেছে। আসামীর ডান হাতে তাঁর ব্যাগটি দেখে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে যান এবং তিনি তৎক্ষণাৎ উহা সর্ব্ব সমক্ষে ভিতরে রাখা গিনির কথা বলে সনাক্ত করে দাবী করেন। তিনি আরও বলেন যে ঐ গিনিটি ঐ দিন প্রাতে অমুক দোকান হতে অতো টাকা মূল্যে তিনি ক্রয় করেছেন। এই সম্পর্কে তিনি সেই দোকানের এতৎসহ সংযুক্ত রসিদটিও দেখিয়েছেন। এই সাক্ষীর সম্পূর্ণ দীর্ঘ পৃথক বিবৃতি এই ডায়েরীর পরিশেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। আসামীকে ইতিপূর্ব্বে তিনি কখনও দেখেন নি।

হরিসাধন রায়, ২নং দেব লেন এবং মতিরাম, ১০০নং রতন ষ্ট্রীট, এই দুইজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা উপরিউক্ত সাক্ষীর বিবৃতিতে তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সবটুকুই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া উহা পুরাপুরি সমর্থন করিল।

উপরোক্ত ফরিয়াদী প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদ্বয়ের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে আমি তদন্তের কারণে ফরিয়াদী ও আসামীসহ ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।”

কোনও কোনও প্রদেশে সময় সংক্ষেপের জন্য আরও সংক্ষিপ্ত নোটের আকারে ডায়েরীটি লেখা হয়। উহাকে বলা হয় ‘কেস্ ডকেট’। এবার কিরূপ প্রণালীতে ডায়েরী বা স্মারকলিপি লেখা হয়ে থাকে তা বলব।

প্রথমে প্রাথমিক সংবাদ পাওয়া মাত্র উহা যথাযথভাবে নির্দ্ধারিত

নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করে নিতে হবে। যদি ফরিয়াদী প্রথমে থানায় এসে বিবৃতি দেয় তা'হলে উহাই হবে প্রাথমিক সংবাদ। প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করার পর মুহূর্তেই ফরিয়াদীসহ ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। এই সম্পর্কে প্রতিটী কার্য্যের সময় ও তারিখ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে রক্ষিগণ বাধ্য। ফরিয়াদী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার পর, যদি আসামী হাজির থাকে তা'হলে তারও বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। এতে সুবিধে এই যে মামলা সম্পর্কীয় স্থানীয় তদন্তের সহিত আসামীর বিবৃতিটিও একই সঙ্গে যাচাই করে নেওয়া যায়।

ঘটনাস্থলে এসে রক্ষিগণ দুই শ্রেণীর সাক্ষীর বিবৃতি গ্রহণ করে থাকেন, যথা—পসেটিভ সাক্ষী ও নেগেটিভ সাক্ষী। যে সকল ব্যক্তি ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত তাদের বলা হয় পসেটিভ সাক্ষী এবং যারা ঘটনা সম্বন্ধে কোনও কিছুই অবগত নয় তাদের বলা হয় নেগেটিভ সাক্ষী। রক্ষীদের উচিত এই উভয় শ্রেণীর সাক্ষীদের নামধামসহ বিবৃতি গ্রহণ করা। অন্যথায় তাদের কিরূপ বিপাকে পড়তে হয় তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"এই দিন তদন্তকারী অফিসাররূপে সাক্ষ্য দেবার সময় আসামী পক্ষীয় উকিল আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, আদালতে আগত এই কয়জন সাক্ষী ছাড়া স্থানীয় অন্য কাউকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, 'আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু তারা ঘটনার সময় উপস্থিত না থাকায় ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানে না বলেছিল।' এর পরই ঐ উকিল ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কৈ দেখান তো আপনার ডায়েরীতে তাঁদের নাম কয়টা।' এরা নেগেটিভ সাক্ষী বিধায় আমি এদের কারুরই নাম লিপিবদ্ধ করি নি। এই হতে ধরে নেওয়া

হয় যে আমি ঘটনাস্থলে অপর আর কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করি নি। এর পর আমাকে বিপক্ষ পক্ষ হতে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আচ্ছা ঐখানকার রাস্তার মোড়ের মনিহারী দোকানীকে এবং তার পাশের মুদীকে কি এই অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন?' বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রতিটী প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতে হয়েছিল, 'আজ্ঞে না' বা 'মনে নেই', ইত্যাদি। এরপর বিপক্ষ.পক্ষীয় হতে বলা হয় যে ঐ সকল ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে এমন সব কথা তারা বলতো যাতে তাঁর মক্কেল সসম্মানে মুক্তি পেতে পারতো।"

"যে মাছটা পালিয়ে যায় সেইটাই বড় মাছ ছিল" বলে যে প্রবাদ আছে, এক্ষেত্রেও উপরোক্ত সত্য বিশেষরূপে প্রযোজ্য।

স্মারকলিপিতে প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করে ফরিয়াদী ও উপস্থিত সাক্ষীর জবানী লিখে নিতে হবে। এর পর আসামী উপস্থিত থাকলে তারও জবানী লিখে নিয়ে, পরিশেষে লিখতে হবে যে তদন্ত ব্যপদেশে অকুস্থলে রওনা হওয়া গেল। এর পর তদন্তের পরিশেষে প্রত্যাবর্ত্তনের বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করে ঘটনাস্থলের একটি পূর্ণ বিবরণ লিখতে হবে। নিম্নে এই লিখন পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো।

"শ্রীসুধীর রায়, ৬ নং বেলতলা রোড থানায় এসে খবর দিল যে করপোরেশন অফিসের সে জনৈক কেরাণী। অদ্য প্রাতে ১০ ঘটিকায় অফিস যাবার সময় সে একটি মুণ্ডহীন দেহ অমুক বাড়ীর সম্মুখে দেখতে পায়। মৃতদেহটী সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা না করে সে সোজা থানায় এসে এই খবর জানাচ্ছে।

উপরোক্ত সংবাদদাতার পৃথক সম্পূর্ণ বিবরণ F.I.R. রূপে গৃহীত হয়ে এতৎ ডায়েরীতে সংযুক্ত করা হ'ল। উপরোক্ত সংবাদ ষ্টেশন ডায়েরীতেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই সকল করণীয় কার্য্যের পরিশেষে যথাসম্ভব

আমি, দারোগা অলি বোস, হেড কনেষ্টবল রতন সিংএর সহিত তদন্তের কারণে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হলাম।

উপরোক্ত সংবাদ সম্পর্কীয় তদন্ত কার্য্যের পরিশেষে উপরোক্ত কর্ম্মচারীদের সহিত থানায় ফিরে ঘটনা সম্পর্কে এক্ষণে স্মারকলিপি লিখছি।

ঘটনাস্থল অমুক ও অমুক দুই রাস্তার সংযোগস্থল বা চৌমাথার পূর্ব্বদিকে একটী উন্মুক্ত স্থান। উহার সম্মুখে কেবল মাত্র ২ নং অমুক ষ্ট্রীটের একটী দ্বিতল বাটি অবস্থিত। আশেপাশে আর কোনও বাড়ী নেই।"

এইরূপে ঘটনাস্থলের বিবরণ দেবার পর মৃতদেহটী কিরূপ ভাবে কোথায় শায়িত আছে তা লিখে উহার খুঁটী-নাটী প্রতিটী বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং এই সকল বিবরণের সহিত ঘটনাস্থলে কোনও সাক্ষী পাওয়া গেলে তাদের কিরূপে ও কোথায় পাওয়া গেল—তা লিখে তাদের বিবৃতি পূর্ব্ব বর্ণিত পদ্ধতিতে লিখে নিতে হবে। হত্যা প্রভৃতি সাংঘাতিক মামলার ঘটনাস্থল কোনও বাটী হলে উহার প্রতিটী কক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তির বিবৃতি গ্রহণ করা উচিত, তা তারা কেউ ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত থাকুক বা না থাকুক।

এরপর আসামীর বিবৃতি অনুযায়ী কোথায় গেলে বা কোনও স্থান বা বাটী তল্লাস করে বা দ্রব্যাদি উদ্ধার করতে সমর্থ হলে—ঐ সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই সম্পর্কে করণীয় কার্য্য সকল এই পুস্তকের ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে। বিদেশী রাষ্ট্রে ও স্মারকলিপিতে প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর সমূহ লিপিবদ্ধ করার রীতি আছে। নিম্নে উহার একটী নমুনা লিপিবদ্ধ করা হলো।

"প্রঃ—আচ্ছা, আপনার কয় পুত্র ও কয় কন্যা। এই কন্যাটী ব্যতীত অপর কোনও পুত্র বা কন্যা ইতিপূর্ব্বে কি মারা গিয়েছে?

উঃ—আজ্ঞে, আমার ছয় পুত্র ও তিন কন্যা। এই কন্যার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার দুই পুত্র ও একটী কন্যাও মারা গিয়েছে।

প্রঃ—তাই যদি হয়, তা'হলে মাত্র এই কন্যার মৃত্যুর প্রমাণরূপে আপনি একটী ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলেন, অথচ পূর্ব্বতন পুত্র-কন্যাদের মৃত্যুর প্রমাণরূপে অনুরূপ কোনও ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন নি, কেন? আপনার এই কন্যার কি কোনও জীবন-বীমা করা ছিল?

উঃ—আজ্ঞে না। আমার পুত্র-কন্যার কাহারই কোনও জীবন-বীমা নেই। পূর্ব্বতন পুত্র-কন্যা কলকাতায় মারা যায় এই জন্য ডেথ সার্টিফিকেটের কোন প্রয়োজন হয় নি, কিন্তু আমার এই সপ্তদশী অনূঢ়া কন্যা মারা গিয়েছে কাশীতে, তাই একটা ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে রেখেছি।"

এদেশে অবশ্য এই প্রশ্নোত্তর লিপিবদ্ধ করার কোনও রীতি নেই। এই স্মারকলিপি সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য এই যে প্রতিটী কার্য্য সম্পর্কীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সময় উহার পাশে পাশে তারিখ এবং সময় ও তৎসহ কোন সময় হতে কোন সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য করা হলো তাও লিপিবদ্ধ করতে রক্ষিগণ আইনতঃ বাধ্য।

বড় বড় ডায়েরী পৃথক পৃথক খণ্ডে ভাগ করে প্রতিটী খণ্ডের প্রতিটী পাতা নম্বরী করে উহাদের সহিত একটী সূচীপত্রও সংযুক্ত করতে হবে। যাতে কোনও খণ্ডের কোন্ পাতায় কোন্ সাক্ষীর বিবৃতি তা খুঁজে বার করা যেতে পারে। এ'ছাড়া প্রতিটী খণ্ডে বিষয়বস্তু ও সাক্ষ্য প্রমাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণও লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে, যাতে বুঝা যায় কার বিরুদ্ধে—কিরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের ইতিহাস

ভারতীয় পুলিশ সম্পর্কীয় ইতিহাস আলোচনা করতে হলে উহাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে, যথা—হিন্দু আমল, মোসলেম আমল, এবং ইংরাজ আমল।

প্রথমে আমি হিন্দু আমলের 'পুলিশ' সম্বন্ধে আলোচনা করবো। সুদূর প্রাচীনকাল হতেই দেখা যায় যে ভারতবর্ষে নগর পুলিশ ও গ্রাম পুলিশ দুইটি বিভিন্ন ধারায় গড়ে উঠেছিল। গ্রাম পুলিশের ভার অর্পিত ছিল গ্রাম্য-প্রধানের ও তাঁহার লোকজনদের উপর এবং নগর পুলিশের ভার অর্পিত ছিল একজন বিশেষ কর্ম্মচারী এবং তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের উপর। এই সকল কর্ম্মচারি সাধারণ ভাবে শান্তি রক্ষা কার্য্য করে এসেছেন। এঁরা অপরাধীদের পাকড়াও করে যথাক্রমে শহরে ধর্ম্মাধিকরণ এবং গ্রামে গ্রাম্য-প্রধানের নিকট হাজির করতেন। তবে প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে গুরুতর অপরাধ সমূহের বিচার এঁরা নিজেরা না করে রাজ্যের রাজার নিকট বিচারের জন্য তাদের পেশ করেছেন। এইরূপ কথিত আছে যে ঐ সময় একদল দস্যুর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হলে কোনও এক গ্রাম্য-প্রধান নিজে তাদের বিচার না করে বিচারার্থে তাদের ঐ রাজ্যের রাজার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানে রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে গণতন্ত্রের প্রচলন ছিল। এই সকল গণতন্ত্রী রাজ্যের কয়েকটিতে এক চমৎকার শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হয়। এই শাসন ব্যবস্থায় এমন একদল কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল, যারা কোনও অপরাধী-মন্য ব্যক্তি সত্যই অপরাধ করেছে কি'না তা জানবার জন্যে রীতিমত তদন্ত কার্য্য করতো। এই সম্পর্কে তাদের সাক্ষীর সহিত অপরাধীদেরও বিবৃতি

(বক্তব্য) গ্রহণ করতে হয়েছে। যদি তারা তদন্ত দ্বারা অবগত হতো যে ঐ অপরাধী-মন্য ব্যক্তি নির্দ্দোষ তা'হলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাদের মুক্তি দিতেন। কিন্তু তদন্তে সেই ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁরা নিজেরা তাদের শাস্তির ব্যবস্থা না করে তাদের তাঁরা বিচারের জন্য একদল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিতে (আইন) প্রাজ্ঞ কর্ম্মচারীদের নিকট পেশ করতেন। এই সকল রাজকর্ম্মচারী বিষয় বস্তুর পর্য্যালোচনা করে যদি বুঝতেন যে তারা নিরপরাধী তা'হলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু যদি তাঁরা বুঝতেন যে তারা সত্য সত্যই দোষী তা'হলে তাঁরা সাতজন প্রধানের এক সংস্থার (Court) নিকট তাকে বিচারের জন্য প্রেরণ করতেন। এই সংস্থা তাকে নির্দ্দোষ বুঝলে মুক্তি দিতেন এবং তাঁরা তাকে দোষী সাব্যস্ত করলে, তাকে পরিশেষে রাজ্যের নির্ব্বাচিত উপরাজা ও পরে রাজার নিকট পাঠানো হতো। এরপর ঐ রাজা তাকে দোষীরূপে বুঝলে তৎকালীন প্রচলিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ দণ্ডবিধি মতে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী তাদের লঘু বা গুরু দণ্ড প্রদান করতেন।

উপরোক্ত শাসন ব্যবস্থার সহিত বর্ত্তমান কালীন থানা পুলিশ, নিম্ন আদালত ও উচ্চ বা দায়রা আদালতের বিচার ব্যবস্থার তুলনা করা চলে। এই প্রাচীন তথ্য হতে আরও বুঝা যায় যে লিপিবদ্ধ আইনকানুন মত ঐ সময়কার বিচার কার্য্য সমাধা হয়েছে।

খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্রের পুলিশ প্রধানকে বলা হতো নগরক। কবি কালিদাসের শকুন্তলা ও মৃচ্ছকটিকা নাটকে দেখা যায় যে শহরের পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের প্রধানকে বলা হতো নগরিকা এবং তাঁহার অধীনস্থ সাধারণ রক্ষীদের বলা হতো 'রক্ষিন্'। যতদূর বুঝা যায় মৌর্য্য পুলিশের উপর নগর ও উহার

শান্তি রক্ষার ভার তো অর্পিত ছিলই, তা ছাড়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা পুলিশের ন্যায় তাঁদের নগরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও উহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (conservancy) সম্পর্কীয় ব্যবস্থাও পরিচালিত করতে হয়েছে। মৌর্য্য পুলিশের বিবিধ করণীয় কার্য্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কার্য্যগুলিও সমাধা করতে হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

(১) অগ্নি প্রতিরোধ সম্পর্কীয় বিধি নিষেধ যেন কেহ অমান্য না করে। (২) সূর্য্যাস্তের দুই ঘণ্টা পর হতে সূর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্ব্বের মধ্যবর্ত্তীকালে কেহ প্রদীপ ব্যতীত পথ চলাচল না করে। (৩) মারপিট ও দ্যূতক্রিয়া যাতে নিবারিত হয়। (৪) সাধুর বেশে অপরাধ-মুখী বা অপরাধ-প্রবণ যুবকদের খুঁজে বার করা। (৫) সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিদের অপরাধের সময়ে বা উহার পূর্ব্বে ধৃতিকৃত করা। (৬) আয়ের চেয়ে কেউ ব্যয় বেশী করে কিনা তা দেখা, ইত্যাদি।

ঐ যুগের পুলিশ বা রক্ষিন্ (রক্ষিগণ) নির্দ্ধারিত এক প্রকার উর্দ্দীও (uniform) পরিধান করতেন, বিশেষ করে এইজন্য তারা সকলে একই প্রকার চিহ্নযুক্ত শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতেন। কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি Vol. I. পৃ: ১৭৮ Rhya Davidsএর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মৌর্য্যদের সময় গ্রাম্য পুলিশ ছিল। একজন গ্রাম্য প্রধানের অধীনে ঐ সকল রক্ষিগণ সারা রাত্রি গ্রাম পাহারা দিত। এ'ছাড়া তারা গ্রামে নবাগতদের আগমন ও প্রত্যাবর্ত্তন এবং সন্দেহমান ব্যক্তিদের আগমন সম্বন্ধে গ্রাম্য প্রধানদের সংবাদ প্রদান করতো। এই সকল গ্রাম্য পাহারাদার চৌকিদার তাদের প্রাপ্য অর্থ বা শস্য গ্রামের প্রতিটি ব্যক্তি বা পরিবারের নিকট হতে নিজেরাই আদায় করতো, এইজন্য তারা গ্রামের প্রতিটি ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিল।

উপরোক্ত ব্যবস্থা ব্যতীত সম্রাট স্বয়ং তাঁর খাস বিভাগের অধীনে একটি বিরাট গুপ্তচর বাহিনী পোষণ করতেন। এই সকল গুপ্তচর গোয়েন্দা পুলিশেরও কার্য্য করেছে বলে মনে হয়। এই চরদের কার্য্যকরণ সম্বন্ধে পুস্তকের সপ্তম খণ্ডের গুপ্তচর নিয়োগ শীর্ষক নিবন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচিত করা হয়েছে। এক্ষণে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সময় রাজকীয় গুপ্তরক্ষী বিভাগ গুপ্তসঙ্কেত লিপি এবং উহা বহনের জন্য সুশিক্ষিত পারাবত পর্য্যন্ত ব্যবহার করেছেন। এই সম্পর্কে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র Book II. Ch. 34 দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন ভারতে বহু অপকার্য্য অপরাধরূপে স্বীকৃত হয়েছিল এবং উহাদের সংজ্ঞাও আইন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। মনু সংহিতা এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠে ইহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। ঐ যুগে অপরাধসমূহ দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, যথা—সাহস ও চৌর্য্য। যে সকল অপরাধে বল প্রকাশ করা হতো, তাহাকে বলা হতো সাহস, যথা—ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি। এবং যে সকল অপরাধ অলক্ষ্যে বা বিনা বলপ্রয়োগে সমাধা হতো উহাকে বলা হতো চৌর্য্য, যথা—চুরি, চামারি, ইত্যাদি। নিম্নোক্ত অপরাধ সমূহের জন্য শাস্তি প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল,—

"চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, জাল হিসাব, রাজস্ব অপহরণ, অনধিকার প্রবেশ, নিরীহ পশুকে হত্যা, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা, অগ্নি প্রদান, রাজপথে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ, শহরের ভিতর মৃত পশু নিক্ষেপ, অন্যায় চুক্তি করা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, মিথ্যা অভিযোগ করা, নারী নির্য্যাতন, সাধারণের ব্যবহার্য্য বাটীর অংশ বা পথ ঘাট অবরোধ, অপরের ভূমি হরণ, সীমানা অতিক্রমণ বা উহার বিলোপ সাধন, অন্যায় ও বিধিবিরুদ্ধ বিবাহ, ও ঐরূপ পুনর্বিবাহ,

অপরের বাসস্থানের ক্ষতিকরণ, হত্যা, অন্যায় রূপে কর্ম্মচারী বরখাস্ত, ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা সুবিধা বা দ্রব্য গ্রহণ, মানহানি, প্রহার, সিঁদেল চুরি, ভ্রূণহত্যা, মুদ্রা জাল, বিষ প্রয়োগ, রাহাজানিতে সাহায্য করা, নারীহরণ, মিথ্যা গুজব প্রচার, হত্যাকারীকে সাহায্য করা, রাজদ্রোহ, রাজাকে অপমান করা, নপুংসকরণ, বলাৎকার, ইত্যাদি।"

বর্ত্তমান কালের ন্যায় প্রতিটি অপরাধের আইনগত সংজ্ঞাও সেই যুগের দণ্ডবিধি সমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চৌর্য্য অপরাধীর কথা বলা যেতে পারে। চুরি অপরাধের সংজ্ঞা প্রাচীন হিন্দুগণ নিম্নোক্তরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন, যথা—

(১) অপহৃত দ্রব্য এমন এক দ্রব্য হওয়া চাই, যাহার মালিক এমন এক ব্যক্তি যিনি—ঐ দ্রব্য ইচ্ছামত ব্যবহার করতে সক্ষম এবং ঐরূপ ব্যবহার দ্বারা তাঁকে কোনও শাস্তি পেতে হবে না।

(২) অপহারক ঐ দ্রব্য অপহরণের কালে জ্ঞাত থাকবেন যে ঐ দ্রব্যের মালিক সে নিজে নয়, বস্তুতঃ পক্ষে ঐ দ্রব্যের মালিক অপর আর এক ব্যক্তি।

(৩) অপহারক ঐ দ্রব্য অপহরণের উদ্দেশ্যেই যদি অপহরণ করে তা'হলেই মাত্র উহাকে চুরি আখ্যা দেওয়া যেতে পারবে।

(৪) অপহারক ঐ দ্রব্যের অপহরণের জন্য কোনও না কোনও এক প্রচেষ্টা করবে, যে প্রচেষ্টা দ্বারা ঐ দ্রব্য সত্য সত্যই অপহৃত হবে।

এক্ষণে বর্ত্তমান ভারতীয় দণ্ডবিধিতে প্রদত্ত চুরির সংজ্ঞা তুলনা মূলক আলোচনার কারণে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাক। বলা বাহুল্য যে চুরির এই সংজ্ঞা ইংরাজশাসকগণ ইঙ্গস্থানীয় আইন-কানুন হতে সংগ্রহ করে-ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে এই উভয় দেশীয় চুরির সংজ্ঞার

মধ্যে বহু সাদৃশ্য আছে। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ৩৭৯ ধারা মতে চুরি মামলার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ :—

যদি কেহ অপরের অধিকারভুক্ত কোনও অস্থাবর সম্পত্তি ঐ ব্যক্তির বিনানুমতিতে অপহরণের উদ্দেশ্যে অপসারিত করে তা'হলে উহাকে চুরি অপরাধ বলা হবে।

প্রাচীন ভারতের ঐ যুগের দণ্ডবিধিতে অপহৃত দ্রব্যের কম বেশী মূল্যানুসারে কম বেশী শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এই যুগেও বিচারকগণ শাস্তি প্রদানের সময় অপহৃত দ্রব্যের কম বেশী মূল্য সম্পর্কেও বিবেচনা করে থাকেন।

এই সম্পর্কে তৎকালীন অপর একটি অপরাধের আইনগত সংজ্ঞা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাক। ইহাতে বলা হয়েছে যে মিথ্যাচরণ অপরাধ বাক্য ও ব্যবহার এই উভয় প্রকারেই সমাধা হয়। এবং এই সকল কার্য্য যদি জ্ঞানতঃ বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় তা'হলে তাকে বলা হয় মিথ্যা প্রচার। এই অপরাধের সংজ্ঞাতে নিম্নোক্ত কয়টি বিষয় যুক্ত থাকা চাই, যথা—

(১) অপরাধী ব্যক্তির বচন ও কার্য্য মিথ্যা হওয়া চাই। (২) উহা বিভ্রান্ত বা বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমাধা হবে। (৩) অপরাধীর অসৎ-ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা চাই। (৪) সংশ্লিষ্ট পক্ষীয়ের ইহা অবগত হওয়া চাই। (৫) ইহা অপরাধীকে স্বয়ং সমাধা করতে হবে।

উপরোক্ত বিষয় কয়টী একত্রে সমাধা হলে তবে ঐ অপরাধকে তৎকালীন আইন অনুযায়ী মিথ্যা প্রচার অপরাধ বলা হতো।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন আইন প্রণেতাগণ এ'ও বলেছেন যে যদি ঐ ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রচারে প্ররোচিত করে এবং ঐরূপে প্ররোচিত হয়ে কোনও ব্যক্তি যদি পত্র প্রেরণ করে কিংবা প্রাচীর গাত্রে লিপিকা

লিখে মিথ্যা প্রচার করে তা'হলে ঐ প্ররোচক ব্যক্তির অপরাধ প্ররোচিত ব্যক্তি কৃত অপরাধের সমতুল্য বিবেচিত হবে।

বর্ত্তমান ব্রিটিশ ভারতীয় দণ্ডবিধিতেও আমরা দেখতে পাই যে প্ররোচকরাও প্ররোচিত ব্যক্তিদের ন্যায় অপরাধী বিবেচিত হয়েছে। এ'ছাড়া উহাতে আমরা আরও দেখি যে পত্র-লিপি ও ইঙ্গিত দ্বারাও অপরাধ সমাধা করা যায়।

এই সকল দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত অপরাধের জন্য বিবিধ দণ্ডেরও উল্লেখ আছে। এই সকল দণ্ড কোনও ক্ষেত্রে অতীব কঠোর ছিল। শাস্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা অপর অপরাধীমন্য ব্যক্তিদের মনে ভীতি সঞ্চার করার জন্যেই এই সকল শাস্তি দেওয়া হতো। অন্য এক প্রবন্ধে এই সকল বিবিধ প্রাচীন শাস্তি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব। তবে সম্রাট অশোকের রাজ্যকালে (খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) দেখা যায় যে, শাস্তি সমূহে নিষ্ঠুরতা বা প্রতিশোধের মনোবৃত্তি ছিলনা। বিচারক কর্ত্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে এই সময় তিন দিন ও তিন রাত্রি বিশ্রাম দেওয়া হতো ; যাতে বিচারক এই চরম শাস্তি সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে পুণর্বিবেচনা করতে পারেন এবং অপরাধীও এই সময়ে দান ধ্যান ও প্রার্থনা দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করতে পারে। মহারাজ অশোকের আদেশে কোনও ব্যক্তিকে বিচারের পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা বা কারাগারে (Jail) আবদ্ধ করার রীতি ছিল না। এই সময় বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তবে নাগরিককে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হতো।

অর্থ ও নীতি শাস্ত্র সমূহে দেখা যায় যে, একশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীর কথা বলা হয়েছে যাদের উপর হাট বাজার, রাস্তা, জনস্বাস্থ্য, শান্তিরক্ষা প্রভৃতির ভার অর্পিত ছিল। সহজবোধ্যরূপে ইহারা বর্ত্তমান পুলিশেরই স্থলাভিভুক্ত ছিলেন বলে মনে হয়।

এতদ্ব্যতীত দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উৎকীর্ণ একটি চোল দেশীয় অনুশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ সময় দক্ষিণ ভারতের রাজপথে পাহারায় নিযুক্ত একশ্রেণীর কর্ম্মচারীর ভরণ-পোষণের জন্য সম্রাট কুলতুঙ্গের আদেশে স্থানীয় প্রজাদের নিকট হতে এক প্রকার কর আদায় করা হতো! আমরা নিঃসন্দেহে এই সকল রাজকর্ম্মচারীদেরও বর্ত্তমান কালীন পুলিশই মনে করতে পারি।

প্রাচীন ভারতের পুলিশি কর্ম্মনীতি সম্বন্ধে "মহাবীর চরিত", সর্গ ১১, ১-১১০, লোহাকুবা এবং বেহীগ নামক তুইজন চোরের কাহিনী পাওয়া যায়। এই কাহিনী হতে তৎকালীন পুলিশি-কর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কথঞ্চিত আভাষ পাওয়া যাবে। এই সম্পর্কে ঐ কাহিনী হতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"রাজগৃহের নিকটে ভৈভববাসী এক চোর রাজধানীতে চুরি-চামারী সুরু করেছিল। নাগরিকগণ স্থানীয় রাজাকে নালিশ জানালে তিনি নগর কোটালকে ডেকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'তোমাদের কি আমি অকারণে বেতন দিয়ে নিযুক্ত করেছি, এইরূপ চোরের উপদ্রব নিবারণ করতে তোমরা অক্ষম কেন?' এর পর স্থানীয় রাজার আদেশে সহরের চারিদিক ঘিরে রক্ষীদলকে মোতায়েন করা হয়। এবং এর ফলে চোর ঐ ফাঁদে পা' দেওয়া মাত্র রক্ষিগণ তাকে গ্রেপ্তার করে ফেললে। গ্রেপ্তারের পর রাজসকাশে তাকে হাজির করে রক্ষী প্রধান জানালেন, 'মহারাজ চোর চোরাই-দ্রব্য সমেত ধরা পড়ে নি, এইজন্য প্রমাণের অভাবে তাকে শাস্তি প্রদান করা যায় না। তবে কার্য্যকরণ সম্পর্কে তদন্ত করে প্রমাণ পাওয়ার পর তাকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।' এর পর রাজা নিজে অপরাধী-মন্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে এইরূপ এক বিবৃতি প্রদান করে—'আমার নাম দুর্গাচাঁদ, কালী নামক গ্রামে আমার নিবাস, ব্যবসায়

সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি এই শহরে আসি। পরে শহর দেখার বাসনায় আমি একটী মন্দিরে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। এর পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রাক্ষসের মতন নগর রক্ষিগণ আমার গতিরোধ করে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে। এরপর আমি তাদের এই আকস্মিক ব্যবহারে ভীত হয়ে নগর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করি। কিন্তু নগর রক্ষীদের এড়াতে পারলেও প্রাচীরের বাহিরে অপেক্ষারত সৈন্যবাহিনী আমাকে ধরে ফেলে। আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে চোরের ন্যায় হস্ত-বদ্ধ অবস্থায় এরা আপনার নিকট এনেছে।' এর পর স্থানীয় রাজা ঐ চোরের এই বিবৃতি শুনে তাকে সাময়িকভাবে কারারুদ্ধ করে এক ব্যক্তিকে ঐ চোরের গ্রামে তার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্যে প্রেরণ করেছিলেন।"

উপরোক্ত প্রাচীন কাহিনীটী কাহিনী মাত্র হলেও উহা হতে প্রাচীন ভারতের পুলিশি-শাসন ব্যবস্থার একটী সম্পূর্ণ প্রকৃত চিত্র পাই। প্রকৃত পক্ষে আধুনিককালের পুলিশি কার্য্যকরণ ও তদন্তরীতির সহিত উহার বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই।

[প্রাচীন ভারতে সম্রাট্ বা রাজ চক্রবর্ত্তীর অধীনে প্রদেশে প্রদেশে শাসনকর্ত্তা বা করদ রাজা ছিলেন। এই সকল করদ রাজার অধীনে ছোট ছোট রাজা ও ভূস্বামী থাকতো। এইরূপ প্রতীত হয় যে, গ্রাম্য প্রধানের মাধ্যমে গ্রাম্য পুলিশ এই সকল ছোট ছোট রাজা বা ভূস্বামীদের অধীন ছিল এবং নগর-পুলিশ উহাদের উর্দ্ধতন রাজা বা শাসকদের খাস বিভাগরূপে তাঁহাদের অধীনে পরিচালিত হতো। শাস্ত্রীদের সাহায্যার্থে যে সৈন্যবাহিনী তলব করারও রীতি ছিল তা'ও উপরের কাহিনী হতে বুঝা যাবে।]

পরবর্ত্তী যুগের হিন্দু রাজত্বকালে সাধারণভাবে পুলিশ প্রধানকে বলা

হতো কোটাল। বলাবাহুল্য 'মোগল যুগীয় কোতোয়ালের' সহিত এই নামের কোনও সম্পর্ক নেই। ভারতীয় উপকথা সমূহে আমরা দেখেছি যে, 'রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, ও কোটালপুত্র' সমপর্য্যায়ে একত্রে ঘুরা-ফিরা করতেন। এই হতে বুঝা যায় যে মর্য্যাদার দিক হতে রাজ্যের মন্ত্রীর পরই কোটালের স্থান ছিল।

পুলিশি ব্যবস্থা—মোসলেম আমল

হিন্দু আমলের পুলিশি কর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার মোসলেম আমলের পুলিশি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। মোসলেম শাসকগণের যা কিছু প্রতিপত্তি তা দেশের ও প্রদেশের রাজধানী সমূহে নিবদ্ধ ছিল। এ'ছাড়া কয়েকটী প্রধান মহাকুমার শহরাঞ্চলে তাঁরা ঘাঁটি স্থাপন করে একজন ফৌজদার নিযুক্ত করেছিলেন। এইখানকার নগর-পুলিশ-সমূহ তাঁহাদের নিযুক্ত একজন পুলিশ প্রধান বা কোতোয়ালের অধীন ছিল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে গ্রাম্য পুলিশ নবাব বা করদ রাজার অধীনস্থ রাজা বা জমিদারদের অধীন ছিল। শহরের অপরাধীদের বিচারের জন্য কাজী নিযুক্ত থাকলেও দেশের গ্রামাঞ্চলে এবং জমিদারদের ছোট শহরে গ্রাম্য পঞ্চায়েতই বিচার কার্য্য সমাধা করতো। এই কারণে মোসলেম আমলে জমিদারদের অধীনে একটী পৃথক ধারায় পুলিশি কর্ম্মকৃত্য গড়ে উঠেছিল। বড় বড় জমিদারগণ বা অধীন রাজারা কোনও ফৌজদার বা কাজীর সহিত সম্পর্ক রহিত ছিলেন। তাঁদের স্ব স্ব রাজ্যে বা জমিদারীতে মোসলেম আমলে ও বৃটিশ আমলের প্রারম্ভে তাঁরাই সর্ব্বেসর্ব্বা শাসকরূপে বিরাজ করতেন। পূর্ব্বতন পরিচ্ছেদে পাহারা-ব্যবস্থা শীর্ষক প্রবন্ধে ঐ সময়কার

পুলিশি কর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে আমি সবিশেষ আলোচনা করেছি। এক্ষণে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সকল গ্রাম্য পুলিশের বেতন গ্রামবাসিগণ বা জমিদারগণ প্রদত্ত জমি-জমা বা কর হতে প্রদান করা হতো। রাষ্ট্র এদের ব্যয়ভার কখনও বহন করে নি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৎসরান্তে গ্রামবাসিগণই এদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছে।

পাঠান রাজত্বকালে বিশেষতঃ শের শার সময়ের পুলিশি কর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। শের শা হিন্দু আমল হতে প্রচলিত গ্রাম্য পুলিশি ব্যবস্থায় কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নি। এই সময় গ্রাম্য প্রধানগণই অপরাধ নিরোধ ও নির্ণয় এবং স্থানীয় অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের যা কিছু ব্যবস্থা তা সমাধা করতেন। মহারাষ্ট্র এবং অন্যান্য প্রদেশের যে সকল গ্রামে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল, সেই সকল গ্রামে সমগ্র গ্রাম্য সমাজই তাদের স্ব স্ব গ্রামের পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই সকল স্থানে চৌকিদারগণকে উৎপন্ন শস্যের একটী নির্দ্দিষ্ট অংশ বেতনরূপে প্রদান করা হতো, পাঠান সম্রাট শের শা (১৫৫৪ খৃঃ) উপরোক্ত বংশানুক্রম গ্রাম্য পুলিশি ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়ে অধিকন্তু এক অভিনব উপায়ে তাদের কার্য্যের উপর খবরদারীর ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি—জমিদার বা স্থানীয় প্রধানদের এলাকায় কোনও অপরাধ সঙ্ঘটিত হলে তাদের উপরই চাপ দিবার ব্যবস্থা করেন। অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে বা অপহৃত দ্রব্যাদি উদ্ধার করতে অসমর্থ হলে সেইজন্য তাদের ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য করা হতো কিংবা নানা প্রকার শাস্তি দেওয়া হতো। এইজন্য এই সকল প্রধানরা স্থানীয় অবস্থা ও ব্যবস্থার উপযোগী একটী শক্তিশালী পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিল। এই সময় গ্রাম্য চৌকীদাররা শস্যের উপরও পাহারা দিয়েছে এবং নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে পত্রাদিও পৌছিয়ে দিয়েছে। তবে

বড় বড় দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রতিরোধ করার ভার স্থান বিশেষে ফৌজদার এবং অনান্য স্থানে জমীদার রূপে যাদের শাসন কার্য্যের জন্য বাহাল করা হতো তাদের সিপাহী শাস্ত্রীদের উপরই অর্পিত ছিল।

মোগল আমলে শহর সমূহে এবং ফৌজি ক্যাম্পে একটী সুগঠিত কোতোয়ালীর প্রধানকে শহর কোতোয়াল এবং তাঁর অধীনে কার্য্য করবার জন্য বর্শা ও যষ্টি সম্বলিত একদল শাস্ত্রী নিয়োগ করা হতো। এঁরা অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য শহর-কাজীর নিকট পেশ করতেন। এই সকল শহর কোতোয়ালগণের উপর নিম্নোক্ত কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল। যথা—

(১) রাত্রে এঁদের শহরে পাহারা ও টহল দিতে হতো। (২) প্রতিটী গৃহের একটী তালিকা এঁদের রাখতে হতো। (৩) যে সকল রাজপথ তাঁরা অতিক্রম করলেন তার একটী হিসাবও রাখতে হতো। (৪) একটী রেজেষ্টারী বহিতে বিবিধ তথ্যাদি তাঁদের লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে। (৫) অপরাধ নির্ণয় ও নিরোধ এঁদের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। (৬) দাঁড়ীপাল্লা ও ওজনের বাটকারাদি এঁরা পরীক্ষা করতেন। (৭) বেওয়ারিশ মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করতেন। (৮) এঁরা অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে কাজীর নিকট পেশ করতেন। (৯) রাজনৈতিক ঘটনা সমূহেরও এঁরা খবর রাখতেন।

এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার আরও তিন শ্রেণীর রাজ-কর্ম্মচারী নিয়োগ করতেন। যথা—(১) ওয়াকী নবীশ, (২) সোয়ানা-নিগার, (৩) কুফি-নবীশ এবং (৪) হরকরা। প্রথম তিন ব্যক্তি লিখিত রিপোর্টে বিবিধ সমাচার বাদশা সমীপে পেশ করতেন। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি গোয়েন্দা রূপে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে পরে ফিরে এসে মৌখিক রিপোর্ট প্রদান করতেন। এ'ছাড়া মুহতসিব (Muhtosib) নামক একজন

কর্ম্মচারী প্রধানকে বাহাল করা হতো। এঁর কাজ ছিল মোসলেম ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কোনও কাজ কোথাও করা হলে এবং নীতিবহির্গত কোনও কার্য্য জনসাধারণ করলে তা নিবারণ করা। পরবর্ত্তী কালে জাল-ওজন এবং খাদ্যের অধিক মূল্য সম্পর্কীয় অপরাধ নিবারণের ভারও কোতোয়ালের নিকট হতে উঠিয়ে নিয়ে এঁর উপরই অর্পিত হয়েছিল।

নগর-কোতোয়ালকে পুলিশি কার্য্য ছাড়া আরও বহুবিধ কার্য্য সমাধা করতে হতো; অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে কাজীর কাছে বিচারের জন্য ইনিই তাদের পেশ করতেন এবং কাজীর প্রদত্ত শাস্তি সমূহ ইনিই অপরাধীদের প্রদান করতেন। বর্ত্তমান জেলারের কার্য্যও এঁকে করতে হয়েছে, অধিকন্তু এঁকে সরকারী প্রচারকের কার্য্যও করতে হয়েছে। তাঁর কাছারীর সম্মুখে অবস্থিত উঁচু মঞ্চকে বলা হতো কোতোয়ালী ছবুত্রা। এই ছবুত্রার উপর সরকারী আদেশ জনসাধারণের অবগতির জন্য টাঙিয়ে রাখা হতো। এবং এইখানে মালিকদের দ্বারা সনাক্তকরণের জন্য উদ্ধার করে আনা চোরাই দ্রব্যাদি সাজিয়ে রাখা হতো। জনসাধারণকে সতর্ক করবার জন্য দস্যু ও বিদ্রোহীদের ছিন্ন মুণ্ড ও হস্তাদিও এইখানে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। কাজী কাহাকেও বেত্রাঘাতের আদেশ দিলে তাহা এইখানেই প্রদান করা হতো। ছোটখাটো অপরাধের অপরাধীদের মধ্যযুগীয় য়ুরোপের ন্যায় এইখানে একত্রে জড় করে রাখা হয়েছে। এই সময় দস্তরী রূপে কোতোয়ালীকে দান করার জন্যে পথচারী কসাইরা এক প্রস্থ মাংস এই ছবুত্রার উপর রেখে চলে যেত। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ইহা ঘুষ রূপে বিবেচিত হওয়ায় এই প্রথা রহিত করে দেওয়া হয়েছিল।

সম্রাট আকবরের এক লিখিত ফরমানে কোতোয়ালের করণীয় কার্য্য-রূপে কয়েকটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল। নিম্নে ঐ আদেশের একটী অনুলিপি উদ্ধৃত করা হলো।

'কোতোয়াল একটী রেজিষ্টারী বহিতে তাঁর কেরাণীদের সাহায্যে শহরে কতোগুলি বাড়ী তার একটা সঠিক হিসাব রাখবে। এবং এই সকল বাটীর প্রতিটী বাসিন্দার বিবিধ তথ্য ঐ বাড়ীর সম্পর্কে লিখে রাখতে হবে। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে কে যোদ্ধা, কে বাজারি, কে দরবেশ, কে শিল্পী ইত্যাদি অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির পেশাও তাদের লিখে রাখতে হবে। এই সকল বাড়ীর বাসিন্দাদের সৎ ব্যবহারের জন্ম প্রয়োজনানুসারে তাঁরা জামিন গ্রহণ করবেন। এ'ছাড়া কোতোয়ালকে শহরটীকে কয়েকটী মহল্লাতে বিভক্ত করে প্রতিটী মহল্লায় জনসাধারণের ভিতর হতে একজন করে মহল্লা সর্দ্দার নিযুক্ত করতে হবে। এই সকল মহল্লা সর্দ্দারদের পরামর্শ অনুসারে কোতোয়ালগণ তাঁদের করণীয় কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করবেন। গুপ্তচর সমূহ প্রতিটী মহল্লার ঘটনার সংবাদ দিবা-রাত্র কোতোয়ালের নিকট বহন করে আনবে এবং কোতোয়াল ঐ সকল সংবাদ তৎক্ষণাৎ বহিতে লিপিবদ্ধ করে ফেলবেন। কোনও গৃহে কোনও অতিথি বা নবাগত এলে সেই সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ মহল্লা সর্দ্দারকে জানিয়ে দিতে হবে। কোতোয়ালকে নাগরিকদের আয় ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে কেহ আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় না করে; কারণ এইরূপ অবস্থাতে মানুষ অর্থের অভাবে অন্যায় কার্য্য করতে বাধ্য হয়।

এই সকল কোতোয়ালের লোকেরা প্রতিদিন বিভিন্ন মহল্লায় টহল দিয়ে আসতো। এই সময় তারা ঝাড়ুদার বা হালাল-খোরদের নিকট হতে অপরাধ সম্পর্কীয় বহু সংবাদ সংগ্রহ করে আনতো।

পাঠানদের ন্থায় মোগলরাও হিন্দু আমল হতে প্রবর্ত্তিত গ্রাম্য পুলিশ ব্যবস্থা সম্পর্কে কখনও হস্তক্ষেপ করে নি। প্রকৃত পক্ষে প্রতিটী গ্রাম্য-মণ্ডল ও জমীদারগণ শাসন সম্পর্কে স্বাধীন সংস্থার ন্থায়ই কার্য্য করে এসেছে।

[এই সময় খোঁজী নামে এক বংশগত সম্প্রদায় গোয়েন্দা পুলিশের কার্য্য করতো। প্রয়োজন বোধে শাসকগণও এদের সাহায্য গ্রহণ করেছে। মুঘল রাজত্ব কাল হতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য কাল পর্য্যন্ত এরা এইরূপ গোয়েন্দার কার্য্য করে এসেছে। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে লর্ড লরেন্স যখন পাঞ্জাবের গুরগাঁও জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময় তিনি কয়েকবার এদের অপরাধ নির্ণয়ার্থে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। এই পাঞ্জাবী খোজী সম্প্রদায়ের অনুরূপ খোজী (Searcher) সম্প্রদায়ের কথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও শুনা গিয়েছে।]

সপ্তদশ শতাব্দীর এই পুলিশি ব্যবস্থা মারাঠা রাজত্ব কালেও প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু মারাঠাদের সময় এই গ্রাম্য চৌকিদার ও প্যাটেলদের অপরাধ নির্ণয়ে ও নিরোধে সাহায্য করার জন্য সিরাবন্দি ও মামলতদার নামক একদল পদাতিক সৈন্যও মজুত রাখা হতো।

মুসলিম আমলের পুলিশি কর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে বহু বিষয় আইন ই আকবরি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থ হতে আমরা তিনটি বিশেষ সরকারী পদ সম্বন্ধে জানতে পারি। যথা—(১) মীর-ই-আদল; অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি, ইনি বোধ হয় কাজি অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ছিলেন, কারণ কাজির রায়-এ ইঁহার অনুমোদন প্রয়োজন হত; (২) শান্তি স্থাপন ও পুলিশ রক্ষার নিমিত্ত ফৌজদার; এবং (৩) কোতোয়াল, অর্থাৎ নগরের হেড পুলিশ। বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে ইংরাজ কোম্পানীকে দেওয়ানী সনন্দ প্রদানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে যে সকল বিচার ও শাসন সম্পর্কীয় কর্ম্মচারী ছিলেন নিম্নে তাঁদের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

(১) নাজিম—ইনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধীদিগকে বিচার কালে স্বয়ং প্রধান বিচারপতিরূপে অধ্যক্ষতা করতেন।

(২) দেওয়ানি—ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কিত মোকর্দ্দমার বিচারভার ইঁহার হস্তে ছিল; কিন্তু ইনি খুব কম সময়ই স্বয়ং এই ক্ষমতা পরিচালনা করেছেন।

(৩) দারগা-আদালত-আল্‌আলিকা অর্থাৎ ফোজদারী আদালতের নাজিমের প্রতিনিধি—ইনি বিবাদ ঝগড়া ও গালাগালির এবং ভূ-সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্যান্য প্রকার সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকর্দ্দমার বিচার করতেন।

(৪) দারগা-ই-আদালত দেওয়ানি—অর্থাৎ দেওয়ানি আদালতের দেওয়ানের প্রতিনিধি।

(৫) ফৌজদার—ইনি পুলিশের প্রধান নিয়ন্ত্রণ-কর্তা ছিলেন, অধিকন্তু প্রাণদণ্ডের যোগ্য নহে এইরূপ যাবতীয় মোকর্দ্দমার বিচার করতেন।

(৬) কাজি—ইনি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মোকর্দ্দমার বিচার করতেন।

(৭) মুক্তাসিব—ইঁহার হস্তে মাতলামি এবং সুরা ও অন্যান্য নেশার জিনিষ বিক্রয় সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমার বিচার এবং কৃত্রিম বাটখারা ও কাঠাপালি প্রভৃতি পরিমাপ যন্ত্রগুলির তদন্তের ভার ছিল।

(৮) মুফতি—ইনি কাজির নিকট আইনের ব্যাখ্যা করতেন এবং উহাতে একমত হলে তদনুসারে মীমাংসা করতেন। কিন্তু তিনি ভিন্নমত হলে নাজিমের নিকট তাহা নিবেদন করা হত, এবং নাজিম অন্যান্য বিচারকদিগকে নিয়ে একটি সভা করতেন।

(৯) কানুনগো—অর্থাৎ ভূমির রেজিষ্ট্রার। সময় সময় ইঁহার নিকট ভূমিঘটিত মোকর্দ্দমার বিচার ভারও অর্পণ করা হত।

(১০) কোতয়াল—অর্থাৎ নিশা কালের শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারী। ইনি ফৌজদারের অধীন ছিলেন।

[এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, রাজধানীর বাহিরে ফৌজদার এবং জমীদার এই উভয় প্রধানের দারগা নামক এক কর্ম্মচারীর অধীনে

এক এক অঞ্চলের শাস্তিরক্ষার জন্য একদল রক্ষী বাহাল ছিল। অন্তঃশত্রু দমন ব্যতীত মধ্যে মধ্যে ইহাদের বহিঃশত্রু দমনের জন্যও নিযুক্ত করা হত। ইংরাজদের বাংলায় তথা হুগলীতে প্রথম আগমনের পর কোনও এক কারণে হুগলীর ফৌজদার ইংরাজ প্রধান চার্ণককে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। এই সময় হুগলীর ফৌজদার কলিকাতার নিকট শিবপুরের মুকুয়া থানার থানাদারকে ইংরাজের জাহাজ ধরবার জন্য আদেশ পাঠিয়ে ছিলেন।* তবে মাত্র কয়েকটি বিশেষ ঘাঁটিতে একজন হিন্দু কিংবা মুসলমান ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু প্রদেশের বাকী অঞ্চলে জমিদারদের অধীনস্থ দারগাদের দ্বারাই শান্তিরক্ষা হত।]

মোগল ভারতীয় পুলিশি কর্ম্মকৃত্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে (১৭৮৮ খৃঃ পর্য্যন্ত) চালু রাখা হয়েছিল।

পুলিশি ব্যবস্থা—ব্রিটিশ আমল

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রথম উপলব্ধি করেন যে এই দেশে প্রচলিত পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, তিনি এই সময় স্যার উইলিয়াম জোনসের সাহায্যে এই সম্পর্কে একটী খসড়াও প্রণয়ন করেন। ইহার পর একটী কমিশন এই বিষয়ে আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান করে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটী রিপোর্ট দাখিল করেন, কিন্তু উহাদের প্রস্তাব ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কর্ণওয়ালিশ কোডে

* এই সময় গঙ্গার এপার হতে ওপার পর্য্যন্ত লম্বিত লৌহ-শিকল দ্বারা পর্টুগীজ দস্যু-জাহাজ আটকানো হত। মকুয়া থানার দারোগা এই উপায় অবলম্বন করা সত্বেও ব্রিটিশ জাহাজ উহা ভেদ করে চলে যায়।

লিপিবদ্ধ হয়ে কার্য্যে পরিণত হয়। এই সময় পর্য্যন্ত বাংলার পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের ভার ছিল জমিদারের উপর। এই নূতন ব্যবস্থায় জমিদারদের নিকট হতে পুলিশের কার্য্য সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করে জমিদারদের পুলিশ বাহিনী ভেঙ্গে দিবার আদেশ দেন। এই নূতন ব্যবস্থানুসারে প্রতি ৪০০ স্কোয়ার মাইলের জন্য একটী করে থানা স্থাপন করে উহাদের ভার এক একজন দারোগার উপর ন্যস্ত করা হয়। জমিদারদের বদলে পুলিশ বাহিনী একজন করে য়ুরোপীয় পুলিশ সুপারের অধীন করা হয়। কিন্তু পূর্ব্বতন দারোগা ও চৌকিদারের পদগুলি নূতন ব্যবস্থায় বহাল রাখা হয়েছিল।

ইহার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর এই নূতন পুলিশি কর্ম্মকৃত্যে কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মফস্বল পুলিশ টাউন এক্ট (XX of 1856) পাশ হওয়ার পর তদনুযায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট বাংলার শহর, নগর, ষ্টেশন, শহরতলী এবং বাজার সমূহে কার্য্য করবার জন্য পুলিশের বিভিন্ন পদের জন্য লোক নিয়োগের অধিকার পান।

[ইতিপূর্ব্বে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে স্যার জেমস আউটরাম যিনি সিপাহী বিদ্রোহে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, ভিল জাতীয় লোকদের দিয়ে ট্রেজারী ও জেল পাহারা দেবার জন্য একদল শাস্ত্রী গঠন করেছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে স্যার চার্লস নেপিয়ার এই শাস্ত্রী দলকে ইঙ্গস্থানের 'পিল্স রিফর্ম' অনুযায়ী উন্নত করেন। এইরূপ ব্যবস্থা অন্যান্য প্রদেশে চালু হবার সময় সিপাহী বিদ্রোহ এই ব্যবস্থা বানচাল করে দেয়।]

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার একটী কমিশন নিয়োগ করেন এবং উহার প্রস্তাবানুযায়ী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পুলিশি ব্যবস্থা (Act V of 1861) সম্পর্কীয় আইন রদ করে নূতন এক আইন পাশ করেন। এই নূতন আইন অনুসারে প্রদেশীয় সরকারের অধীনে একজন ইন্সপেক্টর জেনারেল

অব পুলিশ নিয়োগ করা হয়। এবং প্রতিটী জেলার পুলিশ সুপার-ইন-টেনডেণ্টদের তাঁর অধীনস্থ করে বর্ত্তমান পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের সৃষ্টি করা হয়।

ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশি ব্যবস্থা পরে আরও কয়েকটী সর্ব্বভারতীয় ও প্রদেশীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পুলিশ এক্ট (V of 1861) গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারা আরও কয়েকটী প্রদেশে ইহা চালু করা হয়। এ'ছাড়া প্রাদেশিক সরকার স্ব স্ব প্রদেশের জন্য কয়েকটী আইন প্রণয়ন করেন।

নূতন পুলিশি ব্যবস্থা চালু করা হলেও পূর্ব্বতন গ্রাম্য পুলিশ ব্যবস্থা একেবারে উঠিয়ে দেওয়া হয় নি। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০নং রেগুলেশনের ২১ ধারাতে উহা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে এই আইনের ঐ ধারা উঠিয়ে দিয়ে উহার পরিবর্ত্তে গ্রাম্য চৌকিদারী এক্ট (Beng. Act of 1870) প্রবর্ত্তন করা হয় এবং পরে (Act 1 of 1871) আইনে চৌকিদারদের নিয়োগ রীতি ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা হয়।

ইহার পর কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরের জন্য বিশেষ ক্ষমতাপন্ন প্রেসিডেন্সি পুলিশের (Act XIII of 1856) আইন অনুসারে সৃষ্টি করা হয়। এই Act পরে Act XL VIII of 1860 দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল। পুলিশ Act of 1861 কলিকাতার শহরের উপর কার্য্যকরী করা হয় নি। উপরোক্ত এক্ট সমূহের পরিবর্ত্তে পরে কলিকাতা পুলিশ এক্ট (Beng Act of 1866) প্রণয়ন করা হয়। এই আইনানুসারে কমিশনার অব্ পুলিশকে কলিকাতা পুলিশের সর্ব্বেসর্ব্বা রূপে নিযুক্ত করা হয়। এই আইনে কলিকাতা পুলিশ কমিশনার বাহাদুরের অধীনে কলিকাতা পুলিশকে প্রদেশীয় পুলিশ হতে স্বতন্ত্ররূপে

প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ করা হয়। এই আইনে প্রদেশ পুলিশের ইন্‌সপেক্টার জেনারেলের কলিকাতা পুলিশের উপর কোনও প্রকার কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হয় নি।

ইহার পর লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক নিযুক্ত ১৯০১-২ সালের পুলিশ কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে ভারতের প্রতিটী প্রদেশে একটী করে গোয়েন্দা বিভাগ (C. I. D.) স্থাপিত হয়।

উপরে মূলতঃ ভারত ও বাংলার প্রদেশীয় পুলিশের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রবর্ত্তিত পুলিশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে কলিকাতার নগর পুলিশ এবং বাংলার প্রদেশ পুলিশ সুরু হতেই পৃথক ভাবে গড়ে উঠেছে এবং আজও পর্য্যন্ত তারা পৃথক পুলিশ রূপেই বর্ত্তমান। বাংলার প্রদেশীয় পুলিশ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হল, এইবার কলিকাতা পুলিশের ইতিহাস সম্বন্ধে বলবো।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জব চার্নকের সময় কলিকাতা সুতানটী ও গোবিন্দপুরের গ্রাম সমষ্টির জন্য কোনও পৃথক পুলিশ ছিল না। এই সকল স্থানের পুলিশি শাসন ব্যবস্থা তখনও পর্য্যন্ত পূর্ব্বতন জমিদারের উপরই অর্পিত ছিল। পরে ইংরাজ ব্যবসায়ী অধ্যুষিত এই গ্রাম কয়টীর পুলিশি কার্য্যের ভার ইংরাজ বণিক সভার প্রেসিডেন্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে ইংরাজ বণিক সভা জমিদার আখ্যায় ভূষিত একটী পদ সৃষ্টি করে কলিকাতার পুলিশি কার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করলেন। ইনি দেওয়ানী, ফৌজদারী ও পুলিশি কার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় শাসন কার্য্যের জন্য দায়ী ছিলেন।

১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ একজন মেয়র এবং নয়জন অল্ডারম্যানের পদের সৃষ্টি করে তাহাদের হস্তে ইংরাজ অধ্যুষিত কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু সাধারণ শাসন কার্য্যের

ভার তখনও পর্য্যন্ত ঐ জমিদার নামধেয় ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত থাকে। এই জমিদারের অধীনে পুলিশি কার্য্যের জন্য ১৪৩ জন পাইক নিয়োগ করা হয়। [এই সকল পাইকগণের একদল রাত্রে শহরের কয়েকজন বাসিন্দাদের বাটীও চৌকি দিত। এই সকল পাইক বা পুলিশ-ম্যানদের মাহিনা ছিল মাথা পিছু মাসিক দুই টাকা।

[১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার জমিদারী শাসনের অনুকরণে কলিকাতা শাসনের জন্য সর্ব্বপ্রথম (স্টার্নডেল সাহেবের মতে) গ্রীক নামক একজন ইংরাজকে জমিদাররূপে নিযুক্ত করা হয়। বিখ্যাত জেকালিস হলওয়েল সাহেবও এই জমিদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি জাতিতে একজন আইরিস ছিলেন বলে জানা যায়। এই জমিদারের পদের সৃষ্টিকাল ১৭২০ হতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—গোবিন্দরাম মিত্র নামক একজন বাঙালী ভদ্রলোক এই জমিদারদের দেওয়ান অর্থাৎ প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করতেন। প্রকৃত পক্ষে কলিকাতার পুলিশি কর্ম্মকৃত্য ইনিই ঐ সময় সৃষ্টি করে' তাহা পরিচালনা করেন। ঐ সময়ের পুলিশি পদের দেশীয় নামগুলি হতে তাহা বুঝা যায়।

পূর্ব্বতন প্রদেশীয় বাঙালী জমিদারদের ন্যায় ইংরাজ অধিকৃত কলিকাতার ইংরাজ জমিদারেরও একটি ফৌজদারী কাছারি ছিল। ইনি ঐ সকল বাঙালী জমিদারদের ন্যায়ই প্রজাবিলি, খাজনা আদায়, বিচার ও পুলিশের কার্য্য, কারারুদ্ধ, বেত্রাঘাত প্রভৃতি দণ্ডবিধান করতে পারতেন। এই জমিদারদের বেতন ছিল মাসিক দুই হাজার টাকা।]

১৭৭৮ সালে এই কলিকাতা পুলিশের পাইকদের সংখ্যা বাড়িয়ে ৭৩০ করা হয় এবং জমিদারের স্থলে একজন সুপারিনটেনডেণ্ট নিয়োগ করা হয়। এ ছাড়া পাইকদের উপর খবরদারী করা এবং অন্যান্য কার্য্যের জন্য তাঁর অধীনে ৩১ জন থানাদার এবং ৩৪ জন নায়েব নিয়োগ করা হয়।

বলা বাহুল্য বাংলার পূর্ব্বতন জমিদার শাসকগণ প্রবর্ত্তিত পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের অনুকরণে প্রাচীন কলিকাতার এই পুলিশ বিভাগ তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ছোটখাটো একটি মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। উহার কমিশনারগণ মিউনিসিপ্যাল কার্য্য, টেক্স ধার্য্য ও আদায় প্রভৃতির সহিত পুলিশি বিভাগেরও খবরদারী করতেন। পরে Act of 1793 অনুযায়ী ব্রিটিশ বাসিন্দাদের কয়েকজনকে 'জাস্‌টিস্‌ অব পিস্‌' নিযুক্ত করে এঁদের সংস্থার উপর উপরোক্ত দুই বিভাগীয় কার্য্যের ভার দেওয়া হয়। এই 'জাস্‌টিস অব পিস্‌দের' ম্যাজিষ্ট্রেটও বলা হতো। যতদূর বুঝা যায় যে এই সময় কলিকাতার জন্য এবং ঐ শহরের চতুর্দ্দিকের প্রদেশীয় এলাকার জন্য পৃথক পৃথক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছিল।

কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের বা 'জাস্‌টিস অব পিসের' অধীনে এই সময় যে পুলিশ বিভাগ ছিল তাহা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা—(১) থানাদারী পুলিশ, (২) বাউণ্ডারী পুলিশ, (৩) রিভার পুলিশ এবং টাউন গার্ড পুলিশ।

'জাস্‌টিস অব পিস্‌' বিভিন্ন থানাদারদের নিকট হতে যাবতীয় সংবাদ প্রতিদিন শুনে প্রয়োজনীয় হুকুম জারী করতেন। বিষয়বস্তু পর্য্যালোচনা করার পর এঁরা অপরাধীদের বিচারের জন্য বিচারকমণ্ডলীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। সাধারণতঃ দুইজন 'জাস্‌টিস অব পিস্‌' নিয়ে এই বিচারকমণ্ডলী সমূহ গঠিত ছিল। কয়েকটি মামলা এঁরা নিজেরা বিচার করে বাকী গুরুতর মামলা তাঁরা বিচারের জন্য সুপ্রিম কোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের সময় ১২ জন ইংরাজ নাবিকও কনেষ্টবল রূপে কলিকাতা পুলিশে নিযুক্ত ছিল। এঁরা প্রয়োজন হলে য়ুরোপীয়দের সম্পর্কিত বিষয়ে থানাদারদের সাহায্য করতেন। এই সময়

সমগ্র কলিকাতা শহর এক এক জন থানাদারের অধীনে ৪০টি থানায় বিভক্ত ছিল। প্রতিটি থানায় থানাদার ব্যতীত একজন নায়েব এবং ২০ হতে ৩০টি পর্য্যন্ত পাইক নিযুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত রাতে টহল দেবার জন্য প্রতিটি থানায় দুইজন নায়েব এবং ১২জন চৌকিদার সম্বলিত আরও তিনটি দল মোতায়েন থাকতো। প্রত্যূষে চৌকিদারগণকে ফিরে এসে থানাদারদের নিকট তাদের কার্য্যের খবরাখবর জানাতে হতো। থানাদারগণকে ১৬ টাকা, নায়েবদের ১০ টাকা এবং চৌকিদারদের ৪ টাকা মাসিক বেতন দেওয়া হতো।

শহরের চতুর্দ্দিক ঘিরে পাহারা দিতো বাউণ্ডারী বা সীমানা পুলিশ। শহরের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার সীমানার উপর এই বিশেষ পুলিশের ২২টী সিদালি থানা ছিল। এই প্রতিটী সিদালি থানার জন্য একজন নায়েব এবং ৮ হতে ১৬ জন সশস্ত্র দেশবালী বরকন্দাজ মোতায়েন থাকতো। রাত্রে কেহ শহরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে তার দেহ তল্লাসের জন্য এদের ক্ষমতা দেওয়া ছিল।

রিভার বা জল পুলিশের সংস্থার জন্য সরকার, ১৮ জন পিওন এবং ৯২ জন নৌকা চালক বা মাঝি-মল্লা ছিল। টাউন গার্ড পুলিশে একজন মেজর, চার জন সার্জ্জেণ্ট এবং বহু বরকন্দাজ বা সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন থাকতো। প্রয়োজন বোধে থানা ও জল পুলিশের সাহায্যার্থে এদের ডেকে পাঠানো হতো। এই পুলিশ ব্যতীত এক জন জমাদার, নয় জন নায়েব, ৭২ জন গিরদার পাইক সম্বলিত একটী অতিরিক্ত পুলিশ দলকে শহরের প্রধান হাকিমের অধীনে জরুরী কার্য্যের জন্য মোতায়েন রাখা হতো। এই সময় কলিকাতা শহরে তিনটী হাজত বা বন্দিশালা ছিল। যথা—সংশোধনাগার, টাউন হাজত এবং জেনানা হাজত।

ইহার পর লর্ড ডালহাউসির (১৮৪৫ খৃঃ) শাসন কালে এই পুলিশের

নানাবিধ উন্নতি সাধন করা হয়। এই সময় শহরের পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বহু আইন-কানুনেরও সৃষ্টি করা হয়। এই সময় বরকন্দাজদের মাসিক বেতন ৫ টাকা এবং দারোগার মাসিক বেতন ৫০ টাকা করা হয় এবং তাহাদের পরবর্ত্তী পদোন্নতিরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ইহার পর Act 132 of 1856 অনুযায়ী সুপার-ইন-টেনডেণ্টের অধীনে পুলিশ বিভাগ এবং জাসটিস-অব-পিসের অধীনে বিচার বিভাগ বিলাতী ব্যবস্থা অনুযায়ী সম্পূর্ণ রূপে পৃথক করা হয়। এবং এই পুলিশ সুপার-ইন-টেনডেণ্টদের একজন পুলিশ কমিশনারের অধীনে বহাল করা হয়। এই সময় হতে পুলিশ বিভাগ পুলিশ কমিশনার এবং বিচার বিভাগ ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ হয়ে যায়। এই ব্যবস্থানুযায়ী কলিকাতার জন্য G. T. Cockburte. I. C. S. সর্ব্বপ্রথম পুলিশ কমিশনার নিযুক্ত হন। ইঁহার পর পরবর্ত্তী পুলিশ কমিশনার হন অপর এক ইংরাজ, Mr. Wattchope। ইঁহার কর্ম্মকাল ছিল ১৮৫৭-১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ইহার পর গভর্ণমেণ্টের আদেশে একই ব্যক্তি পুলিশ এবং মিউনিসিপালটীর কর্ম্মকর্ত্তা হন। Mr. Schatel সর্ব্বপ্রথম এই যুক্ত পদের অধিকারী রূপে ১৮৪৪ খৃঃ হইতে ১৮৬৬ খৃঃ পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকেন। ইহার পর ১৮৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত স্যার ষ্টুটি হগ্ এই যুক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর ১৮৮১ খৃঃ হইতে ১৮৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত স্যার হোরী হ্যারিসন নামক অপর এক ইংরাজ এই যুক্ত পদে আসীন থাকেন। ইহার পর ১৮৮৯ সালের ১লা এপ্রিলে এই যুক্ত পদ ভাঙিয়া দুইটী পৃথক পদের সৃষ্টি করা হয়। যথা—(১) কমিশনার অব্ পুলিশ, (২) চেয়ারম্যান অব্ করপোরেসন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কমিশনার অব্ পুলিশকে সাহায্য করার জন্য মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে একজন ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। এই সময় কলিকাতা পুলিশে একজন পুলিশ কমিশনার, একজন ডেপুটি কমিশনার,



কনেষ্টবল, কলিকাতা পুলিশ ১৮৪৯ খৃঃ



কনেষ্টবল, কলিকাতা পুলিশ ১৯৪৮ খৃঃ

তিনজন সুপার-ইন-টেনডেন্ট, মাসিক ৭০৲ হইতে ১৫০৲ পর্য্যন্ত বেতনে ৩০ জন ইনেসপেকটার বা সার্জ্জেন্ট, ৪৫ জন সার্জ্জেণ্ট, ২০৲ হইতে ৫০৲ টাকা বেতনে এক জন দারোগা, ৯৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা মাসিক বেতনে ৩২ জন হাবিলদার, ৫০৲ টাকা হতে ৬০৲ টাকা বেতনে ২৫ জন য়ুরোপীয় কনেষ্টবল এবং ১,৩১৫ জন ভারতীয় কনেষ্টবল বহাল ছিল। ইহা ছাড়া কলিকাতা পুলিশে ৬ জন ঘোড়সওয়ার, জল (River) পুলিশের জন্য ১১৬ জন ব্যক্তি এবং ১৮৩ জন সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন ছিল।

কলিকাতা পুলিশের ১৯১০-১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাবতীয় নথি-পত্র বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হত। থানাতে একটী বহনযোগ্য মোটা বাঁধান কেতাব রক্ষিত থাকতো। এই কেতাব বা পুস্তককে বলা হত—কেস বুক এবং ইহাতে যাবতীয় সংবাদ, মামলা এবং রিপোর্টাদি লিপিবদ্ধ করার রীতি ছিল। এই পুস্তকটি কখনও থানা হতে অন্যত্র সরান হয়নি। সন্ধ্যার পর ইহা হতে উল্লেখযোগ্য ও প্রয়োজনীয় মামলার রিপোর্ট বা সংবাদের সংক্ষিপ্তসার ইংরাজিতে তর্জ্জমা করে উহা একটি ইংরাজি কেতাবে লিপিবদ্ধ করে উহা বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে প্রেরণ করা হত। এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উহা দেখবার পর পুনরায় থানায় পাঠান হত। এই সময় বর্ত্তমান কালীন ডেপুটি ও অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার এই উভয় ব্যক্তির কার্য্য এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণই পরিচালনা করতেন। এই সময় একজন মাত্র ডেপুটি কমিশনার পুলিশ কমিশনারকে সাহায্য করবার জন্য হেডকোয়ার্টারে বাহাল ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পুলিশের কাজকর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ইংরাজিকরণ করা হয়। ইহার ফলে উপরোক্ত বাংলা কেসবুক উঠিয়ে দিয়ে উহার স্থলে ক্রাইম রেজিষ্টার, জেনারল ডায়েরি প্রভৃতি সরকারী নথির প্রচলন করা হয় এবং এই সময় হতেই এই সকল পুস্তকের যাবতীয় বিষয় ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হতে থাকে।

ইহার পর ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ত্তমান কলিকাতা পুলিশের সৃষ্টি হয়। এই সময় পর্য্যন্ত একজন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যকে পুলিশ কমিশনারের পদে বহাল করা হত। কিন্তু এই পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী এই সময় হতে ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের এক ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত করা হতে থাকে।

১৯৩১ সালে কলিকাতা পুলিশের অধীনস্থ এলাকা হয়, ১১, ৬০, ৪১০ নগরবাসী সহ ৩০·৮ স্কোয়ার মাইল। এই বৎসর ৫৭৪৭ জন অফিসার এবং সিপাহী ও জমাদার সম্বলিত কলিকাতা পুলিশের জন্য ব্যয় হয় বৎসরে ৪৬,৩২,৩০৫৲ টাকা।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা পুলিশে নিম্নোক্ত সংখ্যক অফিসার মোতায়েন ছিল।

(১)	পুলিশ কমিশনার (নগরপাল)	...	১ জন
(২)	ডেপুটি কমিশনার (উপনগরপাল)	...	৭ ”
(৩)	এসিস্‌টেন্ট কমিশনার (সহ নগরপাল)	...	১০ ”
(৪)	ইনস্‌পেক্টার (মহারক্ষা)	...	৬৫ ”
(৫)	সাব ইনস্‌পেক্টার (সহ আরক্ষা)	...	১১৬ ”
(৬)	সার্জ্জেণ্ট (সঙ্গারক্ষা)	...	২ ”
(৭)	এসিস্‌টেন্ট সাবইনস্‌পেক্টার	...	১৫২ ”

(৮)	হেড কনেষ্টবল	...	৪৩৩ জন
	(রক্ষীপুঙ্গব)		(৫ম সওয়ার সহ)
(৯)	কনেষ্টবল	...	৪,৬৫৪ "
	(সাধারণ রক্ষী বা রক্ষী)		(৪৮ জন সওয়ার সহ)

স্বাধীনতার পর কলিকাতা পুলিশকে যুগোপযোগী করে নূতন রূপে গড়ে তোলা হয়। ট্রাফিক, কনট্রোল রুম, বেতার ও যানবাহন বিভাগ ইহার এখন একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এই পুলিশের সংখ্যা বর্দ্ধিত তো হয়েছেই, তা ছাড়া এর প্রতিটি বিভাগ উন্নততরও হয়েছে। এবং ইহার সহিত প্রয়োজনানুসারে বহু নূতন বিভাগও যুক্ত করা হয়েছে। দক্ষতার দিক হতে বিচার করলে এই পুলিশ আজ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুলিশ।

বর্ত্তমান কলিকাতা পুলিশের যুগোপযোগী পুনর্গঠনের যা কিছু কৃতিত্ব তা দুই ব্যক্তির। বর্ত্তমান পুলিশ কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষচৌধুরী I. P. J. P. এবং হেড কোয়াটারের ডেপুটি কমিশনার শ্রীপ্রণব সেন I. P. J. P. অনাগত কালের মানুষ এঁদের দুইজনকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করবে।

অনুরূপ ভাবে বাংলা প্রদেশীয় পুলিশ ও উহার গোয়েন্দা এবং সীমান্ত পুলিশ সহ বহুল রূপে উন্নততর হয়েছে। আজ এই পুলিশবাহিনীও দক্ষতা ও সংগঠনের দিক হতে সারা ভারত ও এশিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পুলিশের বহুবিধ উন্নতি প্রদেশ পুলিশের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীহীরেন্দ্র সরকার I. P. J. P. মহোদয়ের আপ্রাণ প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। অনাগত কালের বংশধরগণ এঁকেও এইজন্য শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করবে।

নিয়োগ পদ্ধতি—রক্ষীবাহিনীতে

বংশানুক্রমে একই পেশা অবলম্বন করা ভারতবর্ষের এক সনাতন প্রথা। এই বিশেষ প্রথা প্রচলন থাকায় পুরাকালে নাগরিকগণ তাদের শিক্ষা-দীক্ষার্থে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল ছিল না। স্ব স্ব জাত ব্যবসায়, শিল্পকার্য্যাদি এবং পেশা সম্পর্কীয় পরিজ্ঞান তারা তাদের পিতা, পিতামহ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও খুল্লতাতগণের নিকট শিক্ষা করেছে। এই সকলের জন্য তাদের কোনও এক শিক্ষা নিকেতন বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হতে হয় নি। পুরাকালে সাধারণ বা পুঁথিগত শিক্ষার জন্য কয়েকস্থানে বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান থাকলেও অনুরূপ কোনও কৃষি বা শিল্প বিদ্যালয় বা পেশা সম্পর্কীয় শিক্ষানিকেতনের কথা শুনা যায় নি। এই সময় প্রত্যেক শিল্পী পরিবারের স্বগৃহেই তাদের সন্তান সন্ততিদের শিল্প শিক্ষা দেওয়া হতো। বলা বাহুল্য আপন পুত্রকে তার অভিজ্ঞ পিতার পক্ষে যেরূপ সযত্নে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব বাহিরের কোনও ব্যক্তির পক্ষে তাহা কদাচ সম্ভব হবে না। এ'ছাড়া এই সম্পর্কে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে মানুষ হওয়ায় শিশুকালে চিত্ত প্রস্তুতির কারণে এই জাত ব্যবসায়ের প্রতি তাদের বিশেষ এক আগ্রহও জন্মে থাকে। পুরাকালে ভারতবর্ষে এইরূপ শিল্পী পরিবার একত্রে একস্থানে বাস করে ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা ঐ স্থানটিকে একটি বিরাট কেন্দ্রীয় শিল্পী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থলাভিষিক্ত করে তুলতো। এইরূপ ভাবে শিল্প স্পৃহা সহজাত রূপে অনুসৃত হওয়ায় তারা পৃথিবী ব্যাপী সুনাম অর্জ্জন করতে পেয়েছে।

এই পরিবেশজাত স্পৃহা বংশানুক্রমতা দ্বারা পিতা হতে পুত্রে সংক্রামিত হওয়াও ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভব নয়। ইহা এক পুরুষে সম্ভব

না হলেও বহুপুরুষ একই কার্য্যে রত থাকায় ঐ কার্য্যের স্পৃহা কয়েক পুরুষ বাদে বীজকোষকে প্রভাবান্বিত করে বলে মনে হয়।

য়ুরোপে কয়েকজন পণ্ডিত প্রমাণ করেছেন যে অভ্যাস (Habit) এবং শিক্ষা দীক্ষা পিতা হতে পুত্রে বংশানুক্রম দ্বারা সংক্রামিত হওয়া সম্ভব। য়ুরোপে Pavlov সাহেব এই সম্পর্কে ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করেন। ইনি কয়েকটি শ্বেত ইঁদুরকে এমন ভাবে শিক্ষা দেন যাতে তারা ঘণ্টাধ্বনি শুনা মাত্র খাদ্যের জন্য খাঁচা হতে বেরিয়ে আসতো। এইরূপ অভ্যাস তাদের মধ্যে এনে দিতে তাঁকে তাদের তিনশত বার শিক্ষা দিতে হয়েছিল। এর পর এই সকল ইঁদুর ও ইঁদুরীর মিলন দ্বারা তাদের সন্তান, সন্ততির সৃষ্টি তিনি করতে থাকেন। এবং সেই সঙ্গে বংশানুক্রমে তাদের ঐ একই শিক্ষায় শিক্ষিতও করতে থাকেন। প্রথম পুরুষে তাদের ঐ কার্য্যের জন্য যতবার শিক্ষা দিতে হয়েছিল, দ্বিতীয় পুরুষে তাদের ঐ কার্য্যের জন্য আরও কমবার শিক্ষা দিতে হয়েছে। উহাদের পঞ্চম পুরুষীয় শ্বেত ইঁদুরদের ঐ একইরূপ অভ্যাসে শিক্ষিত করে তুলতে তাঁকে মাত্র ত্রিশটি বার শিক্ষা দিতে হয়েছিল। হার্ব্বাডের Me Dougall ধেড়ে ইঁদুরের সাহায্যে অনুরূপ সুফল পেয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে ঐ সকল ইঁদুরদের বংশানুক্রমে বিদ্যুৎ সংযুক্ত মঞ্চে অবতরণ না করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এ'ছাড়া প্রোফেসর হ্যারিসনও অনুরূপ উপায়ে এক প্রকার মক্ষিকাকে (saw flies) কয়েক পুরুষের পর অপর আর এক প্রকার গাছের পাতায় ডিম্ব রক্ষা করতে অভ্যস্ত করাতে পেরেছিলেন।

উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সাতপুরুষের জাত-ব্যবসায়ীর পুত্র যত সহজে তার পিতৃ ব্যবসা আয়ত্ত করতে পারবে তত সহজে অন্য কোনও ব্যবসায়ী বংশের পুত্র উহা আয়ত্তে করতে পারবে না। সংগৃহীত অভ্যাস (Acquired habit) যদি সত্যই বংশগত হয় তা'হলে উহার

ফলাফল যে সুদূর প্রসারী তা নিশ্চিত রূপে বলা যেতে পারে। বংশগত গুণাগুণ ঐ একই রূপ পরিবেশে বর্দ্ধিত হয়ে উহাকে আরও যে শক্তিশালী করবে তাতে আর বিচিত্র কি আছে।

এই কারণে পূর্ব্বকালে পণ্ডিতের ছেলে, ভালো পণ্ডিত এবং কামারের ছেলে, ভালো কামার এবং চাষীর ছেলে, ভালো চাষী হওয়া স্বাভাবিক ছিল। অধিকন্তু এই বংশগত প্রথা জাত-ব্যবসায়ের প্রতি একটা স্বাভাবিক দরদ ও মায়া এবং তৎজনিত এই ব্যবসায়ের উন্নতির প্রচেষ্টা এদের মধ্যে স্বভাবতঃই এসে গিয়ে থাকে। এই একই পদ্ধতিতে পূর্ব্ব-কালে ভারতবর্ষে সৈন্য ও রক্ষীবাহিনীও সৃষ্টি করা হতো। এরা বংশানুক্রমে সৈন্য ও রক্ষীর পেশা গ্রহণ করায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এরা একটী বিশেষ সামরিক ঐতিহ্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ এরা একটা পেশাগত ইনিস্‌টিঙট বা সহজাত প্রেরণা সহজেই অর্জ্জন করতে পেরেছে। সামরিক শিক্ষা-দীক্ষা বা রক্ষীগিরির জন্য এদের কোনও সামরিক বিদ্যালয় বা ট্রেনিং কলেজের দরকার কমক্ষেত্রেই হয়েছে। সেকালের খোঁজি সম্প্রদায় বংশানুক্রমে কিরূপ সুন্দরভাবে গোয়েন্দা পুলিশের কাজ করতো তা ইতিপূর্ব্বেই আমি বিবৃত করেছি। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক পৃথিবী যে টিপবিদ্যা ও পদচিহ্নের জন্য গর্ব্ব অনুভব করে তা এই সকল কারণে এই দেশে বহুপূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হতে পেরেছিল। ইহা এই সকল সম্প্রদায় বিশেষের বংশানুক্রমে অধীত বিদ্যার সুফল। পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে টিপবিদ্যা ও পদচিহ্নবিদ্যা সম্পর্কীয় প্রবন্ধে ইহা বিশদরূপে বলা হয়েছে। তবে প্রতিবেশী ভিন্ন পেশার পরিবারের কোনও পুত্র অপর এক ব্যবসায় সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উহা গ্রহণ করলে এজন্য কেহ আপত্তিও করেনি। বংশপরম্পরার ন্যায় গুরুপরম্পরায় সেই যুগে বহু বিদ্যা আয়ত্ত করা হতো। এইক্ষেত্রে শিক্ষা-গুরু তাদের নিকট

ছিল ধর্ম্মপিতা। এই জন্য সেই যুগে আমরা সৈন্যবাহিনীতে ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় অপরাপর সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদেরও বহুল সংখ্যায় যোগদান করতে দেখেছি। কিন্তু ইহাও দেখা গিয়েছে যে, ক্ষত্রিয় বংশীয়দের মধ্যে যে যুদ্ধ স্পৃহা শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অন্যান্য বংশীয়দের মধ্যে তা মাত্র ১০টি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। আজন্ম বাক-প্রয়োগ দ্বারা কোনও শিশু-বালকের মন যে কোনও একটি পেশার প্রতি আকৃষ্ট করা অতীব সহজ। এইক্ষেত্রে এইরূপ বাক-প্রয়োগের স্থলাধিকার করে থাকে পারিবারিক আদর্শ, এই যা তফাৎ। এই কারণে কি হিন্দু রাজাদের আমলে, কি মুসলমান রাজত্বকালে অন্ততঃ সাধারণ রক্ষী বা শাস্ত্রী এবং গোয়েন্দা পুলিশ নিয়োগ প্রধানতঃ একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা শ্রেণীর বা গোত্রীয় মনুষ্য গোষ্ঠির মধ্য হতে করার রীতি ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে এবং বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে প্রাথমিক শান্তিরক্ষার ভার ছিল স্থানীয় জমিদারদের উপর এবং এইজন্য তাদের একটী সুগঠিত পুলিশবাহিনীও সৃষ্টি করতে হয়েছে। এই সম্পর্কে জমিদাররা বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের জমির উপসত্ত্ব ভোগ করতে দিয়ে বিনিময়ে তাদের সন্তান সন্ততিদের স্বল্প বেতনে বা বিনা বেতনে রক্ষীগিরীর কার্য্যে বহাল করতেন। ইংরাজ রাজত্বকালে জমিদারী সমূহের মালিকানা অদল বদলের কারণে কিংবা বংশগত রক্ষী প্রথার অবসানের ফলে এদের অনেককেই কর্ম্মচ্যুত হতে হয়। এর ফলে এদের কেউ কেউ পরবর্ত্তীকালে যে ডাকাতদের তারা দাবিয়ে রাখত তাদেরই দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়।

সুচতুর বৃটিশ শাসকগণ এদেশীয়দের মনের এই বিশেষ গঠন সম্বন্ধে সুপরিচিত ছিল। এই কারণে যখনই সম্ভব হয়েছে তাঁরা পুলিশ বিভাগে বিশ্বস্ত পুলিশ কর্ম্মচারীদের সন্তান সন্ততিদের সর্ব্বাগ্রে নিয়োগ করেছেন। বহুক্ষেত্রে বিশস্ত কর্ম্মচারিগণ অবসর গ্রহণ করলে বা তাদের কারুর মৃত্যু

ঘটলে, তাঁরা তাদের কোনও একটী পুত্রকে এই বিভাগে নিয়োগ করার জন্যে যেচে সম্মতি জানিয়েছেন, বহু স্থলে এমনও ঘটেছে যে সহসা এদের কেউ মারা গেলে বিভাগীয় বড়কর্ত্তা তাদের পৈতৃক গ্রামে লোক পাঠিয়ে খবর নিয়েছেন এই বিভাগে বহাল হবার মত উপযুক্ত কোনও নিকট আত্মীয় তার আছে কিনা, এমন কি সেই দিন পর্য্যন্তও কর্ম্মচারী নিয়োগ-কালে পূর্ব্বতন অফিসারদের পুত্রদের বিশেষ সুবিধে দেওয়ার রীতি ছিল। এই সম্পর্কে ইষ্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর কথা বলা যেতে পারে। বৃটিশগণ ইহাকে পুলিশের অন্তর্ভুক্ত একটি বিভাগরূপে নিয়োগ করে-ছিলেন। এই সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা একটি ফ্যামেলী-ব্যারাকে স্ত্রী-পুত্রাদিসহ বাস করতো, এবং তাদের কোনও পুত্র উপযুক্ত হওয়ামাত্র তাকে এই বাহিনীতে ভর্ত্তি করে নেওয়া হয়েছে। তিন পুরুষ এই পন্থায় নিয়োগ করার পর দেখা যায় যে দক্ষতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও আনুগত্যের দিক হতে পৃথিবীর উহা এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

এইরূপ নিয়োগ প্রথা দ্বারা রক্ষী বিভাগের দক্ষতার মান যে বর্দ্ধিত হতো তাতে দ্বিমত থাকার কোনও কারণ নেই। কারণ, পুলিশ বিভাগ এমন একটি বিভাগ যাহার সদস্যদের পেশাগত সহজাত বুদ্ধি অর্জ্জনের বিশেষ প্রয়োজন, অন্যথায় মামুলি কাজ চালানো ছাড়া তাদের পক্ষে এই বিভাগে বিশেষ রূপ দক্ষতা দেখানো অসম্ভব, এবং এই পেশাগত সহজাত বুদ্ধি ও প্রেরণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ একটি বিশেষ পরিবেশ ও ঐতিহ্যের মধ্যে মানুষ হলে সহজে অর্জ্জন করতে পারে। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে সামরিক ও পুলিশ বিভাগে যার পিতা নিম্নপদ হতে উচ্চ পদে উন্নীত হয়েছে, তার পুত্র ও পৌত্রও ঐ বিভাগে নিম্নপদ হতে অনুরূপভাবে উচ্চ-পদে উন্নীত হয়েছে। একপুরুষে যেমন সকলের পক্ষে বিরাট ধনদৌলতের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়নি, তেমনি এক পুরুষের চেষ্টায় সকলের পক্ষে

ট্রাডিসন বা ঐতিহ্যের অধিকারী হওয়া সহজ সাধ্য হয়নি। তবে উহা যদি গুরু পরম্পরায় বা গোত্রানুক্রমে (Atavism) অর্জ্জন করা হয়ে থাকে তা'হলে সে কথা স্বতন্ত্র। এ'কথা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে বৃটিশ শাসকদের নিয়োগ প্রণালী এবং শিক্ষা-দীক্ষা দক্ষতার দিক হতে ভারতীয় পুলিশ বাহিনীকে ব্রিটিশ নেভি ও জার্ম্মান আর্ম্মির সমতুল করে তুলেছিল। যদি কেহ মনে করে যে তার অবর্ত্তমানে তার পুত্র সহজে এই বিভাগে প্রবেশ করতে পারবে তা'হলে সে এই বিভাগটিকে তার এক অন্তরের জিনিষ মনে করতে এবং পুলিশি কার্য্যে বারে বারে আপন জীবন বিপন্ন করতে কুণ্ঠিত হবে না। এইরূপ এক বোধ তাকে সর্ব্বদা সততার সহিত সুনাম রক্ষা করে কর্ত্তব্য কার্য্যে রত থাকতে যে প্ররোচিত করবে তা সহজেই অনুমেয়। অপর দিকে এই সকল পুলিশ কর্ম্মচারিগণের পুত্রগণের কেহ কেহ ভবিষ্যতে ঐ বিভাগে তাদের নিয়োগের সম্ভাবনা থাকায় বাল্য-কাল হতে তারা তাদের চিত্ত এই বিভাগের উপযোগী করে প্রস্তুত করে নেয়। বাল্যকাল হতে পিতার কর্ম্মস্থলে বাস করায় এই বিভাগের প্রতি তারাও যে আকৃষ্ট হয়ে উঠবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। পিতার নিকট হতে পুলিশ বাহিনী সুলভ কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা এবং সপরিশ্রম অধ্যবসায় তারা শিশুকাল হতেই শিক্ষা করে থাকে। বংশগত পুলিশ অফিসারদের জাত-পুলিশ বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তারা মাতৃগর্ভ হতেই পুলিশি কার্য্য শিক্ষা করে, কেহ কেহ এই জন্য তামাসা করে তাদের মহাভারতোক্ত 'অভিমন্যু' বলেছে। পূর্ব্বতন অফিসারদের এই সকল বংশধর এই বিভাগে প্রবেশ করে প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই তাদের পিতা ও পিতামহের ঐতিহ্য ও সুনাম রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়ে থাকে। পুলিশি পরিবেশের মধ্যে শিশুকাল হতে মানুষ হওয়ায় এদের মস্তিষ্কের তথা মনের গঠন (set up) পর্য্যন্ত পুলিশি

হয়ে গিয়ে থাকে। এই জন্য বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে বংশানুক্রমে নিযুক্ত অফিসারগণ কার্য্য-দক্ষতায় এই বিভাগে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে এসেছে। সামরিক ও পুলিশ বিভাগে তিন চার পুরুষ যাবৎ কার্য্যরত কয়েকজন অফিসারের জীবনী পর্য্যালোচনা করে আমি এই সুচিন্তিত অভিমতে উপনীত হয়েছি।

তৎকালীন বৃটীশ শাসকগণের হয় তো এইরূপ পন্থায় কর্ম্মচারী নিয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একদল অনুগত (Loyal) নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সৃষ্টি করা, হয় তো সহজে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এইরূপ এক ব্যবস্থার প্রচলন তাঁরা করে থাকবেন। পূর্ব্বতন ভারতীয় স্বাধীন নৃপতিরাও হয় তো তাদের বংশগত রাজসিংহাসন রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঐরূপ পন্থানুসারে নিয়োগ কার্য্য করে এসেছেন। কিন্তু এতদ্বারা যে অপরাধ-নির্ণয় ও নিরোধের সম্পর্কেও তাঁরা একদল সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী সৃষ্ট করতে পেরেছিলেন তা বিশেষরূপে স্বীকার্য্য।

এই সম্পর্কে অপর একটি সত্য সম্বন্ধে না বললে বর্ত্তমান নিবন্ধটি নিরর্থক হবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে পুলিশ অফিসারের পুত্র পুলিশ অফিসার হতে চায়নি। এর কারণ তার পিতামাতা এবং আত্মীয়েরা কয়েকটী কারণে তাকেও পুলিশে কার্য্য করতে দেওয়া পছন্দ করে নি। এই জন্য শিশুকাল হতে তাকে বাক্-প্রয়োগ (Suggestion) দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে সে যেন ভুলক্রমেও পুলিশে প্রবেশ না করে। প্রাণপণে এঁরা অন্য কোনও এক পেশার প্রতি তাকে আকৃষ্ট করে তুলতে তার বাল্যকাল হতেই চেষ্টা করে এসেছেন। এ ছাড়া এই সকল বালকদের কেহ কেহ মাতৃকুলের ব্যক্তিদেরও গুণাগুণ পরিবৈশিক কিংবা বংশগত কারণে অর্জ্জন করে থাকে। উপরন্তু এই সকল সন্ততিদের কেহ কেহ পুলিশ বিভাগে প্রারম্ভেই উচ্চপদ

না পাওয়ায় উহার কোনও নিম্নপদে বহাল হওয়া পছন্দ করেন নি। এ ছাড়া বিপরীত পরিবেশ ও শিক্ষা দীক্ষা এবং গোত্রানুক্রমের কারণে এই সব কর্ম্মচারীদের সব কয়টি পুত্রের মনোবৃত্তি একই রূপ না'ও হতে পারে। এবং এদের কর্ম্মে বহাল হবার বহু পূর্ব্বে কারও কারও পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করায় পিতার সংগৃহীত গুণ বংশগত হতে পারে নি।

ভারতীয় পুলিশ ও সেনা বাহিনীতে আজও এমন সুদক্ষ অফিসার বা কর্ম্মচারী দেখা যায় যারা তিন চার পুরুষ যাবৎ এই বিভাগদ্বয়ে বহাল আছে। অধুনা যুগেও অবশ্য সুদক্ষ কর্ম্মচারীদের পুত্রদের মধ্যে কেহ উপযুক্ত ব্যক্তি থাকলে তাদের এই বিভাগে নিয়োগ হবার দাবী কথনও কথনও স্বীকৃত হয়ে থাকে। পিতার বিগত ভালো কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপও কথনও কথনও এই বিভাগের একটি পদ তার পুত্রকে দেওয়া হয়েছে। অন্ততঃ পুলিশ ও সেনা বিভাগ সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থার কথঞ্চিৎ স্বীকৃতি বিজ্ঞান সম্মত হবে বলে কেহ কেহ আজও মনে করেন।

কিন্তু এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা মনে করেন যে বর্ত্তমান যুগে ও পরিস্থিতিতে এইরূপ বংশানুক্রমে নিয়োগ প্রথা একান্ত রূপে অচল। কোনও এক রাষ্ট্রিয় বিভাগে কোনও এক বংশের পুত্রদের কায়েমী স্বার্থ কোনও প্রকারেই কাম্য হতে পারে না। এ ছাড়া অধুনাকালে শিক্ষাদীক্ষা নাগরিকগণ স্ব স্ব পিতামাতার নিকট কদাচিৎ পেয়েছে। বরং তারা প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষা আধুনিক বিদ্যালয় সমূহে পেয়ে থাকে। অধিকক্ষেত্রে তারা পিতা অপেক্ষা শিক্ষকের মনোবৃত্তির অধিকারী হয়ে থাকে। বর্ত্তমান সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাত ও পরিবর্ত্তিত পরিবেশ এই যুগের বালকদের বরং পিতামাতার মনোবৃত্তি হতে তাদের প্রতিদিন বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে। বহুক্ষেত্রে পরিবৈশিক শক্তি বংশগত

গুণাগুণকে নিউট্রালাইজ্‌ড্‌ করে আরও বহু দূরে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। এবং পেশাগত বংশ বা বংশগত পেশা এ'দেশ হতে এমনিই বহু পূর্ব্বে উঠে গিয়ে উহা কাহিনীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে এক এক পুরুষে এক এক প্রকার পেশা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। গণতন্ত্রীয় যুগে এই প্রথার প্রয়োজনও অত্যল্প, কারণ এখানে মানুষের আনুগত্য থাকে সমগ্র জাতি বা রাষ্ট্রের প্রতি, কোনও এক বিশেষ রাজ পরিবার বা বংশের প্রতি নয়। এইরূপ নিয়োগ প্রথা জাতিভেদ বহুল এইদেশে ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হলে নিশ্চয়ই ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। এ'ছাড়া সুদক্ষ পুলিশ অফিসারদের কয়জন পুত্র পৌত্রই বা এই বিভাগে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয় গুণাগুণের অধিকারী।

উভয় পক্ষীয়দের মতামত বিবেচনা করে এইরূপ বলা যায় যে কর্ম্মরত অফিসারদের মনে আশার সঞ্চার করার কারণে এবং মৎ-বিশ্লেষিত উপরোক্ত কারণ সমূহের জন্য কার্য্যরত দক্ষ অফিসারদের উপযুক্ত পুত্রদের কাউকে কাউকে সুবিধা মত এই বিভাগে নিয়োগ করা সমীচীন হবে।

এদেশে কর্ম্মকৃত্য সমূহে দুই প্রকার উপায়ে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়ে থাকে, যথা—প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা এবং মনোনয়ন দ্বারা। দুই প্রকার নিয়োগ পদ্ধতির পক্ষে ও বিপক্ষে বহুলোকে বহু কথা বলে থাকে।

কেহ কেহ বলে থাকেন যে, যে সকল বিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করার জন্য আবেদকগণ প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে থাকেন তাহা পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের ন্যায় একটি বিভাগের কার্য্যে একান্ত রূপে নিষ্প্রয়োজন। একজন ভালো ঐতিহাসিক, কিংবা অর্থনৈতিক গণিত বিশারদ বা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হলেই যে তিনি একজন ভালো পুলিশ অফিসার হতে পারবেন তার নিশ্চয়তা কোথায়? বরং পাঠকার্য্যে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করার জন্য এই বিভাগের উপযোগী

মন ও স্বাস্থ্য তাঁদের কেহ কেহ হারিয়ে ফেলেছেন। অবশ্য যাঁরা তা হারান নি, তাদের পক্ষে এ'কথা স্বীকার্য্য নয়। এ'ছাড়া প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া বা না হওয়া বহুক্ষেত্রে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। এমনও দেখা গিয়েছে যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে পাণ্ডিত্যের দিক হতে অতুলনীয়। অপর দিকে মনোনয়ন প্রথা দ্বারা প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা সহ সদবংশীয় স্বাস্থ্যবান পরিশ্রমী ও দীর্ঘদেহী যুবকদের বহু সংখ্যায় এই বিভাগে নিযুক্ত করা সম্ভব। এঁদের মতে পুলিশ বিভাগে প্রয়োজন হয় একত্রে শিক্ষা-দীক্ষার সহিত সহজাত বুদ্ধি (instinct), সাহস ও শক্তির, তা না হলে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়ে থাকে। সমর বিভাগের ন্যায় কেবল মাত্র শস্ত্র প্রয়োগ রীতি শিক্ষা করলেই এদের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। কোনও দেশ জয় করা এবং উহা শাসন করা এক বিষয় নয়। এই বিভাগে শিক্ষা করতে হবে 'সামথিঙ্‌ অব্‌ এভরিথিঙ্‌, এভরিথিঙ্‌ অব্‌ সামথিঙ্‌ নয়। কেবল মাত্র একটি দুইটি বা তিনটি অধীত বিদ্যায় পারদর্শী হলেই একজন সুদক্ষ পুলিশ অফিসার হওয়া সম্ভব হয় না।

উপরোক্ত মতবাদের বিরোধী পক্ষীয়েরা বলে থাকেন যে যারা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিতে সাহসী হয় তাদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভরতার উন্মেষ হয়েছে, এবং তাদের স্নায়ুর শক্তি (মানসিক) স্বভাবতঃই প্রবল। এ'ছাড়া যারা মেধাবী ও সুশিক্ষিত তাদের মনের উৎকর্ষতাও অধিক থাকে এবং তাদের মনের গতিও থাকে আধুনিক কালের উপযোগী। মনোনয়ন প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা আরও বলেন, মনোনয়ন কার্য্যে ধরাধরি এবং সুপারিশের প্রাদুর্ভাব হওয়া সম্ভব এবং মনোনয়নকারীদের ব্যক্তিগত পছন্দও সুমনোনয়ন কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত যুবকদের মধ্যে যারা স্বাস্থ্যবান

বিভাগে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই কারণে কর্ম্মকৃত্যের উচ্চ নিম্ন কর্ম্মচারীদের মধ্যে কর্ম্মগত কোনও হিংসার উদ্রেক হওয়া উচিত হবে না। বরং সকলেরই মনে করতে হবে যে স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থেকে উভয় শ্রেণীর অফিসাররা একই দেশ-মাতৃকার সেবায় নিযুক্ত আছেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রতিটী নাগরিকের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। উপযুক্ত হলে অধস্তন অফিসাররা প্রথমেই উহার সম্মুখীন হতে পারতেন। তা যখন তাঁরা সাহস করেন নি তখন তাঁদের স্ব স্ব পদেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যে যেরূপ ভাগ্য করে আসে সে সেইরূপ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন। অতএব এই সম্পর্কে নীরব থাকাই ভালো। এ'ছাড়া নিম্নপদসুলভ পেশাগত মলিনতা সরাসরি উচ্চপদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কম ক্ষেত্রেই বর্ত্তিয়ে থাকে এবং সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণের সহিত সংযোগ না থাকায় তাদের মনও থাকে একান্তরূপে নিরপেক্ষ। এই সকল কারণে সেরিমনিয়েল বা আনুষ্ঠানিক ঐতিহ্য রক্ষা করে তাঁরা জনসাধারণের সম্মুখীন হতে সক্ষম। এ'ছাড়া এই কর্ম্মকৃত্যে দুই প্রকার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে, যথা—(১) সাধারণ পুলিশি, (২) পলিশি নির্দ্ধারণ। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে প্রমোটেড্ অফিসাররা সাধারণ পুলিশি কার্য্যে দক্ষতা দেখালেও পলিশি (policy) নির্দ্ধারণ সম্পর্কে কম ক্ষেত্রেই দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন। এই শেষোক্ত জ্ঞানের উপর রাষ্ট্রের প্রকৃত মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। এই জন্য উচ্চ পদসমূহে সরাসরি কর্ম্মচারী নিয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন। এ'ছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে বাহির হতে সরাসরিরূপে নিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই অতীব সুদক্ষ ও সৎ দেখা গিয়েছে।

উপরোক্ত মতবাদের বিরোধী পক্ষীয়রা প্রত্যুত্তরে বলে থাকেন যে, একজন ইতিহাসের বা কেমিষ্ট্রির ভালো ছাত্র হলেই যে সেই ব্যক্তি

একজন ভালো রক্ষীপুঙ্গব হবে তা কখনই হতে পারে না। এই বিভাগে যাঁরা বহুকাল যাবৎ বহাল থাকেন মাত্র তাঁদেরই পুলিশি-বিদ্যা অর্জ্জনের সুবিধা আছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা স্বকীয় কাযকর্ম্মে প্রত্যেকেই এক একজন উচ্চশিক্ষিত, তাঁদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রসূত বিদ্যা লিপিবদ্ধ হলে উহা যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার একমাত্র পাঠ্য পুস্তক হতে পারে। এইরূপ এক বয়োজ্যেষ্ঠ সুশিক্ষিত ব্যক্তির শিরোপরি একজন স্বল্পবয়স্ক যুবককে বসিয়ে দেওয়া নিরর্থক। এইক্ষেত্রে এদের অধিকাংশের উপরের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা উৎসাহবিহীন হয়ে গতানুগতিকভাবে কোনও প্রকারে চাকুরী বজায় রাখে মাত্র। দুই তিন বৎসর মাত্র চাকুরীতে বহাল হয়ে কারও পক্ষে ছাব্বিশ বৎসরের এক চাকুরীয়কে করণীয় কার্য্যে উপদেশ দেওয়া যায় না। আপন বিদ্যা বুদ্ধি ও বিবেচনায় এই তরুণ নবাগতরা যা ভালো মনে করেছেন, অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে তা পরীক্ষা করে দেখলে তাই অবিবেচনার কার্য্যরূপে প্রতীত হতে পারে। এ'ছাড়া নিম্নপদ হতে উচ্চপদে পদোন্নতি দ্বারা অধিষ্ঠিত হলে এরা অধীনস্থ অফিসারদের সুবিধে অসুবিধে যেমন অনুধাবন করতে সক্ষম, তেমন তাদের যা কিছু গল্‌তি তা বুঝে নেওয়াও এদের পক্ষে সহজ। এই কারণে অধীনস্থ বাহিনীর লোকদের মধ্যে কোনও অহেতুক বিরাগ এদের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে নি। যে অসুবিধা তারা একদিন নিজেরা ভোগ করেছেন, অধস্তন অফিসারদের সেই সকল অসুবিধা সম্পর্কে তাঁদের পক্ষে সচেতন থাকা স্বাভাবিক। এ'ছাড়া নিজেরা একদিন অধস্তন অফিসাররূপে বহাল থাকায় ঐ সকল অফিসারদের প্রতি তাদের একটি বিশেষ অনুরাগ বর্ত্তমান থাকে এবং এই কারণে তাঁরা নিজেদের একটি সুখী পরিবারের প্রধান কর্ত্তা রূপে বিবেচনা করে থাকেন। এমন দেখা গিয়েছে যে সরাসরিরূপে নিযুক্ত একজন অফিসার তাঁর একজন

অফিসারকে দু'ঘন্টার মধ্যে কোনও এক কার্য্য সমাধা করতে আদেশ দিলেন, কিন্তু সেইরূপ অসম্ভব আদেশ একজন প্রমোটেড্ অফিসার তাঁর অধস্তন অফিসারকে দিতে পারেন নি, কারণ—তাঁরা নিজেরা নিম্নপদে বহাল থাকাকালীন ঐটুকু সময়ের মধ্যে সেই কার্য্য কখনও সমাধা করতে পারেন নি। এঁরা আরও বলেন যে অধুনাকালে যখন সকল শ্রেণীর কর্ম্মকৃত্যে সমগোষ্ঠীয় সমশিক্ষিত যুবকদের এমনি নিযুক্ত করা হচ্ছে, তখন কর্ম্মকৃত্যে তিনটি বিশেষ শ্রেণী করা নিস্প্রয়োজন। এঁদের মতে নিম্নপদ হতে পর পর পদোন্নতি দ্বারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়া সহজ সাধ্য নয়। একমাত্র যারা বিশেষরূপে প্রতিভাবান তাদের পক্ষেই ঐরূপে পদোন্নতি করা সম্ভব এবং এই সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক হলেও অভ্যাসজনিত যুবকগণ অপেক্ষা অধিক সাহসী ও কর্ম্মঠ হয়ে থাকেন এবং কর্ম্মজীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তারা কর্ম্মদক্ষতার উচ্চমান একইরূপে রক্ষা করতে পেরেছেন। এক কথায় এঁরা পুড়ে পুড়ে খাঁটী সোনা হয়ে তবে সর্ব্বোচ্চ পদসমূহ অধিকার করে থাকেন, এঁদের অনেকে ত্বরিতগতিতে পদোন্নতি করাতে নিতান্ত অধিক বয়স্কও হয়ে পড়েন নি। এই কারণে যৌবনোচিত ভাবধারা ও আদর্শ এবং পরিকল্পনা প্রসূত মন তাঁরা তাঁদের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ধরে রাখতে পেরেছেন। অপরদিকে সরাসরি উচ্চপদে বহাল অফিসারদের কেহ সমধিক উপযুক্ত বিবেচিত না হলেও তাদের ঐ সকল পদ হতে সহসা সরানো বা নিচের পদে নামিয়ে দেওয়া যায় নি।

এই উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিদের পরস্পর বিরোধী মতামত অনুধাবন করলে প্রতীতি হবে যে উভয়বিধ মতবাদের মধ্যেই সুযুক্তি আছে। এইরূপ অবস্থায় পুলিশি কর্ম্মকৃত্যে অর্দ্ধেক সংখ্যক ব্যক্তিদের প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দ্বারা সরাসরিরূপে এবং অর্দ্ধেক সংখ্যক ব্যক্তিদের পদোন্নতি দ্বারা সর্ব্বোচ্চ পদ সমূহে নিয়োগ করা উচিত হবে। কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তি নিম্ন

পদসমূহে না পাওয়া গেলে উঁহাদের একজনকেও উচ্চতম পদে নিযুক্ত না করাই ভালো। এইরূপ ক্ষেত্রে বরং সরাসরি বাহির হতে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করে এই সকল পদে বাহাল করা উচিত হবে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ অফিসারের পদগুলিতে মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য পরিবারের শিক্ষিত যুবকদের এবং সাধারণ শাস্ত্রী পদ-গুলিতে মধ্যবিত্ত কৃষক ও শ্রমিক পরিবারের স্বল্প শিক্ষিত যুবকদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। আধুনিককালে অবশ্য সাধারণ শাস্ত্রীপদেও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত যুবকদের নিয়োগ করা হচ্ছে। উচ্চপদ-গুলিতে যে পরিবার ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সুশিক্ষিত যুবকদের গ্রহণ করা উচিত সেই সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নেই। কিন্তু সাধারণ শাস্ত্রীপদে কোন শ্রেণীর যুবকদের নিয়োগ করা উচিত সেই সম্পর্কে মতভেদ আছে।

কেহ কেহ বলেন, সাধারণ শাস্ত্রীদের পদে উচ্চশিক্ষিত যুবকদের নিয়োগ না করাই ভালো। ইহার কারণ স্বরূপ তাঁরা বলেন যে বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাগ পড়াবার জন্যে একজন এম্, এ, পাশ যুবকের নিয়োগে কোনও সুফল ফলে না বরং উহা নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি করে। এ'ছাড়া অধিক বিদ্যা অধ্যয়ন মানুষকে কিছুটা পরিমাণে সাধারণ শাস্ত্রীর পদের অনুপযোগী করে তুলে। উচ্চাভিলাষী শিক্ষিত একদা অবস্থাপন্ন যুবকগণ সাধারণ শাস্ত্রী সুলভ স্বল্প বেতনে যে স্বভাবতঃই সন্তুষ্ট থাকবে না তা সহজেই অনুমেয়। জীবন মান রক্ষার্থে এদের কেহ কেহ অসাধু উপায়ে অর্থাগম অভিলাষীও হয়ে উঠতে পারেন। অপর দিকে স্বল্প শিক্ষিত ও মজদুর শ্রেণীর ব্যক্তিদেরও সরকার বাহাদুর তাদের শিক্ষা-দীক্ষানুযায়ী উপযুক্ত চাকুরীর সংস্থান করে দিতে বাধ্য এবং এই সকল সাধারণ রক্ষীপদ তাদের মানসিক এবং দৈহিক গঠনের সবিশেষ উপযোগী।

এই সম্পর্কে বিরোধী পক্ষীয়েরা বলে থাকেন যে রাষ্ট্রীয় সরকার সকল

শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য সকল শ্রেণীর সরকারী পদ উন্মুক্ত রেখে থাকেন। যে যে-কাজে উপযুক্ত জাতি ধর্ম্ম ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে তাকে সেই কাজের জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আধুনিক যুগে শ্রমের মর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। কোনও নিম্নপদে একজন উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুবকের নিয়োগে ফল উত্তমই হবে। দৈহিক বল ও সাহস মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে অর্জ্জন করে, শ্রেণীগতভাবে আজ আর তা তারা করে না। য়ুরোপে দেশ বিশেষের রাজপুত্রকেও প্রথমে একজন সাধারণ নাবিকের পদ হতে সামরিক জীবন সুরু করতে হয়েছে। প্রায় প্রতি দেশেই আজকাল সুশিক্ষিত যুবকগণ কর্ম্মকৃত্য সমূহের সর্ব্বনিম্নপদে বহাল হয়ে ধীরে ধীরে উচ্চপদসমূহ অধিকার করে থাকেন।

গ্রামাঞ্চলে মাত্র একটি প্রদেশীয় ব্যক্তিরাই বসবাস করে, এইজন্য স্বভাবতঃ তাদের স্বপ্রদেশীয় ব্যক্তিদেরই গ্রাম্য পুলিশে অধিকক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতের কয়েকটি পাঁচমেশালী শহরে এইরূপ পন্থায় কর্ম্মচারী নিয়োগ উচিত হবে না। এদেশের বড় বড় শহরে বিভিন্ন প্রদেশীয় বিভিন্ন জাতীয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন ভাষাভাষী নাগরিকগণ বসবাস করে। এরা মূলতঃ একজাতীয় মানুষ হলেও প্রদেশ ও সম্প্রদায় ভেদে এদের আচার বিচার, জীবনযাপন পদ্ধতি এবং স্বভাব চরিত্র বিভিন্ন রূপের হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলিকাতা, বোম্বাই, বেনারস, দিল্লী প্রভৃতি শহরের কথা বলা চলে। এই সকল শহরে ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের এবং পৃথিবীর সর্ব্বদেশের মানুষ নানা কার্য্য ব্যপদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকে। এইজন্য এই সকল নগরের পুলিশ বাহিনীর মিশ্ররূপ হয়ে থাকে। এইজন্য নগর পুলিশ সমূহে শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্যে সকল শ্রেণীর মানুষদের নিয়োগ করার রীতি আছে।

কর্ম্মকৃত্য সমুহে লোক নিয়োগ একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। কোনও একটি বিভাগে কর্ম্মের জন্যে যতো লোক প্রয়োজন হয় তদপেক্ষা কিন্তু অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। কারণ মৃত্যু, অবসর, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও ছুটি ইত্যাদি কারণে লোক সংখ্যা কমে গেলে এই বাড়তি লোকবল হতে ঐ কারণে সঙ্ঘটিত ঘাটতি সমূহ পূরণ করা যেতে পারবে।

পুলিশি তদন্ত—উপকরণ

অপরাধের তদন্তে দুই প্রকার উপকরণের প্রয়োজন হয়ে থাকে, যথা—সাজসরঞ্জাম এবং মানসিক গঠন। প্রথমে সাজসরঞ্জামের বিষয় বলা যাক। তদন্তে বহির্গত হওয়ার সময় নিম্নলিখিত দ্রব্য ও যন্ত্রাদি সহ একটি বহন যোগ্য ব্যাগ বা বাক্স রক্ষীদের সঙ্গে থাকা উচিত।

(১) ক্ষুদ্র সংস্করণের আইন পুস্তক ; (২) একদিস্তা লেখার কাগজ, ব্লটিং ও টিস্যু পেপার, কারবণ পেপার ও নোটবুক ; (৩) প্রয়োজনীয় ছাপাফর্ম্ম, সার্চ্চলিষ্ট, ডাইরী বই ইত্যাদি ; (৪) কয়েকটি ছোট বড় লেফাপা থাম ; (৫) কলম, পেনসিল, কালী, আঠা বা লেই ও গালা, শীলমোহর, মোমবাতি ; দেশলাই ইত্যাদি ; (৬) ট্রেসিঙ পেপার ও ট্রেসিঙ কাপড়, বস্ত্রখণ্ড ইত্যাদি ; (৭) আতস কাঁচ, কাঁচি ও ছুরী, একজোড়া কম্পাস, স্কেল, মাপের ফিতা, ব্রুস এবং টিপ গ্রহণ ও পরীক্ষার সাজসরঞ্জাম ; (৮) এক বোতল প্লাসটার অব্ প্যারিস, তৈলাধার ও তৈল, প্যাকীংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় হাল্কা দ্রব্যাদি, সূতা ও দড়ি ইত্যাদি ; (৯) পরীক্ষার জন্য দুইটি টেষ্ট-টিউব, একটি সাবান, একটি ভালো ঘড়ি ; (১০) দড়ি, হাতকড়ি, আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রশস্ত্র।

সরঞ্জাম সম্বন্ধে বলা হল এইবার মানসিক গঠন সম্বন্ধে বলবো। পূর্ব্ব হতে কোনও একটি ধারণা (Preconceived) মনে রেখে রক্ষীদের তদন্তে যাওয়া উচিত হবে না। এইরূপ কোনও এক ধারণা মনে এসে থাকলে তা ঘটনাস্থলে এসে যাচাই করে দেখা দরকার।

সাধারণতঃ তদন্তকারীদের মধ্যে দুই প্রকার মনোবৃত্তি দেখা গিয়ে থাকে। এঁদের একদল কোনও একটি অভিযোগ শুনা মাত্র বিশ্বাস করেন যে উহা সত্য এবং পরে যাচাই করে দেখেন যে উহা সত্য কিনা ? এঁদের অপর দল যা কিছু শুনেন তা প্রথমেই মিথ্যা বলে বিশ্বাস করেন, এবং পরে তারা যাচাই করে দেখেন যে উহা মিথ্যা বা সত্য। বহুক্ষেত্রে বিগত দিনের বহু সত্য মিথ্যা ঘটনা তাঁদের এইরূপ চিত্ত প্রস্তুতির জন্য দায়ী। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে পুলিশ কোর্টের উকিলরা হাকিম হলে তারা 'কনভিকটিং' হয়। কারণ কর্ম্মজীবনে তাঁদের কেউ কেউ প্রমাণের অভাবে বহু দোষী ব্যক্তিকে মুক্তি পেতে দেখেছেন। জারের আমলের রুশ দেশে এক অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে পেনসনের পর পুলিশ অফিসাররা হাকিম হলে তাঁরা 'একুইটিঙ' হন। তাঁদের ধারণা হয় নিশ্চয় ঐ মামলার কোনও কোনও অংশ মিথ্যা। আমার মতে তদন্তের এবং বিচারের সময় সুধীজন মাত্রের থাকা উচিত নির্ব্বিকার ও কল্পনা শূন্য মন। অন্যথায় তাঁরা তাঁদের অজ্ঞাতে বিচারের নামে বহু অবিচার করে বসবেন। এইজন্য আত্মবিশ্লেষণের রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত থাকা উচিত।

তদন্তকারী অফিসারদের মন বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধিৎসুক হলে কত দুরুহ মামলার আশু সমাধান সম্ভব তা নিম্নের বিবৃতিটি হতে সম্যকরূপে বুঝা যাইবে।

"কালীঘাটের মন্দিরের প্রাঙ্গণ' হতে প্রায়ই জুতা চুরি যেতো। শেষে নাচার হয়ে ঐখানকার কয়েকজন ভবঘুরেকে গ্রেপ্তার করে থানায়

আনি। কিন্তু অতগুলো লোকের মধ্যে কোনজন যে জুতা চোর তা বুঝতে পারছিলাম না। এর পর আমি অফিসের মেঝেতে বিশ জোড়া জুতা রেখে নিকটে ঐ গুলির আসামীদের দাঁড় করিয়ে রাখি। এই সময় আমি লক্ষ্য করি এদের মধ্যে একব্যক্তি ঘন ঘন প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে বারে বারে জুতাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখছে। এই জুতা চোরটির জুতার দিকে মনোনিবেশ অভ্যাসের সামিল হয়ে উঠেছিল—এইজন্য তার মনের আকাঙ্ক্ষা মুখে প্রস্ফুটিত হতে দেরী হয় নি। অতগুলি জুতার পরিদর্শন তাকে স্বভাবতই প্রলুব্ধ করে তুলেছিল।"

[য়ুরোপে Bidder Schmidt Rlchet Pavlov সাহেব এই চিত্ত প্রস্তুতি সম্বন্ধে ভেক নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা করেছেন। তিনি এইরূপ বহু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাদের পাকস্থলীর রসপিণ্ড হতে রস নির্গত করে থাকে। চিত্ত প্রস্তুতির ক্ষমতা কিরূপ অসীম তা এই সকল পরীক্ষা হতে বুঝা যায়। এই চিত্ত প্রস্তুতি বংশগত পর্য্যন্ত হতে পারে। য়ুরোপে এই সম্পর্কে ইঁদুর নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা করা হয়েছে। ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরদের খাঁচা হতে খাদ্যের জন্য বাহিরে আসতে শিক্ষা দেওয়া হয়। পরে দেখা যায় যে এই অভ্যাস চিত্ত প্রস্তুতির মধ্যে উহাদের শাবকদের মধ্যে বংশগত হয়ে গিয়েছে। এই সম্বন্ধে 'নিয়োগ পদ্ধতি' শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা হয়েছে।]

মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে কিরূপ দুরূহ মামলার কিনারা করা সম্ভব তার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি ঐ জজসাহেবের বাড়ীতে তদন্তে এসে বাহিরে ঘরে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় লক্ষ্য করলাম যে বাড়ীর বহু ভৃত্যের মধ্যে একজন উড়িয়া ভৃত্য অকারণে বারে বারে ছুতায়-নাতায় আমাদের দেখে চলে

যাচ্ছে। আমি সন্দেহবশতঃ তাকে কাছে ডেকে বললাম, 'কি'রে! তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? তোকে তো আমরা ধরতে আসি নি। আয় আয় এধারে আয়।' আমার এই উক্তিতে যে প্রতিরোধ শক্তি (Resistance) আশু বিপদের সম্ভাবনায় তার মনে দানা বাঁধছিল তা অচিরে অপসারিত হলো। এইরূপ অভয় বাণী প্রথমে না পেলে তার প্রতিরোধ স্পৃহা বিনষ্ট হতো না বরং তা দানা বেঁধে উঠতো এবং এর ফলে আমাদের প্রশ্নবান সে সহজে এড়িয়ে অপরাধ অস্বীকার করতো। এইভাবে তার মনের প্রতিরোধ স্পৃহার অবসান ঘটিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিরে তোর দেশ কোথায়? ঘরে ছেলেপুলে আছে!—আহা আহা-হা-হা। তোর তো দেখছি মুস্কিল হলো।—ভয় নেই তোকে আমি বাঁচিয়ে দেবো। আহা অতগুলো ছেলেপুলে।' মনের প্রতিরোধ শক্তি ইতিপুর্ব্বেই বিনষ্ট হওয়ায় (তার কৃষ্টি অনুযায়ী) সে আমাদের সহানুভূতিতেই ভেঙে পড়ে অপরাধ স্বীকার করে বললো যে চোরই হারটি সে অমুক দোকানে বিক্রয় করে এসেছে। আমাদের বারংবার বাকপ্রয়োগে সে বিশ্বাস করেছিল যে এই স্বীকারোক্তি তার উপকারে আসবে। এইজন্য তার বিবেচনা শক্তি সাময়িক ভাবে সে হারিয়ে ফেলেছিল। এর পর সে আমাদের চিৎপুর রোডে এক স্বর্ণকারের দোকানে নিয়ে আসে, কিন্তু ঐ সময় ঐ দোকান বন্ধ ছিল। অপরাধীকে দূরে রেখে ছদ্মবেশে পার্শ্ববর্ত্তী দোকানীকে আমি বলি, 'মশাই ঐ দোকানীর মাতা তার দেশে অত্যন্ত পীড়িতা। ওর বাড়ীর ঠিকানাটা যদি দেন তা' হ'লে খবরটা দিয়ে আসি। প্রতিবেশী দোকানীও ছিল একজন 'বামাল গ্রাহক' সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলে সে কখনই তার স্বধর্ম্মীর ঠিকানা বাতলে দিত না। এইরূপে ঠিকানা সংগ্রহ করে ঐ দোকানীর বাসাবাড়ীতে এসে আমরা হাজির হই। এই বাড়ীতে বহু ভাড়াটিয়ার বাস। বহু ডাকাডাকি

সত্ত্বেও কেউ বলে না কার নাম অমুক। এই সময় একজনকে সম্বোধন করে চেঁচিয়ে বলে উঠি, 'মহাশয়, শীঘ্র অমুক বাবুকে ডেকে দিন, তার চিৎপুরের দোকানে আগুন লেগেছে, তাই তাকে খবর দিতে এসেছি। দোকানী ভদ্রলোক সাবধানী হওয়ায় ঘরে থেকেও এতক্ষণ কোনও উত্তর করে নি। আগুনের কথা শুনে, 'এ্যাঁ বলেন কি মশাই' বলে বেরিয়ে আসামাত্রই উড়িয়া ভৃত্যটী তাকে সনাক্ত করে বলে উঠলো, 'আজ্ঞে ওঁনার কাছেই আমি গহনাটী বেচেছি।' আমরা তৎক্ষণাৎ তাকে বাইরে বার করে এনে তার স্ত্রীকে বললাম, 'তাতে আর কি? ও' বেচেছে তাই কিনেছে। আলমারী থেকে দিন গহনাটা বার করে।' বলা বাহুল্য এই সকল বামাল গ্রাহকরা ভারি চোরাই গহনা দোকানে না রেখে তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে তা সরিয়ে রাখে। তদন্তের করণীয় কার্য্যগুলি ছদ্মবেশে ও বিদ্যুৎগতিতে করায় এদের কাহারও মনের প্রতিরোধ শক্তি দানা বাঁধবার সময় পায়নি। এইরূপ তদন্ত কার্য্যকে বলা হয় বিদ্যুৎগতি তদন্ত। মনোবিজ্ঞানে জ্ঞানের উপর ইহার সফলতা নির্ভর করে।"

এই প্রকার তদন্ত রীতি বিদ্যুৎগতিতে না হলে চোরাই দ্রব্য পাওয়া যায় না, সাক্ষ্য-প্রমাণও বিনষ্ট হয়ে যায়। এইরূপ তদন্ত সম্পর্কে অপর একটী বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"তদন্তকালে ঐ বাড়ীর একমাত্র ভৃত্যটীর হাব-ভাব হতে সে-ই বাসনগুলি চুরি করেছে, বলে আমার মনে হলো। অথচ ঐ ভৃত্যটী বাড়ী হতে অন্য কোথাও একটীবারও যায় নি। এই সময় বাটীর সংলগ্ন খিড়কির পুকুরে এসে আমি দেখি যে পুকুরের পাড়ের নিকট একস্থানে জলের মধ্যে একটী কঞ্চি পোতা রয়েছে। ঐ কঞ্চির নিকট জলে লোক নামালে সে ঐখান হতে কাপড়ে বাঁধা বাসন ক'খানি তুলে নিয়ে আসে।

বেশ বুঝা যায় ঐ ভৃত্যই ঐখানে বাসন ডুবিয়ে রেখে নিশানা স্বরূপ কঞ্চিটী পুঁতে রেখেছিল। ঐ কাপড়খানি ঐ ভৃত্যেরই পরিধেয় বস্ত্ররূপে সনাক্তকৃত হয়।”

তদন্ত কার্য্যে সকল প্রকার বিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য্য। কিন্তু কতগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ‘বিজ্ঞান’ প্রয়োজনমত সৃষ্টি করে নেওয়াও উচিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ‘ধূলি বিজ্ঞানের’ বিষয় বলা যেতে পারে। ধূলি তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) পথ ধূলি; (২) বায়ু ধূলি; (৩) খনিজ ধূলি। পথ ধূলি সাধারণতঃ পাদুকা ও পথে সংযুক্ত থাকে। বায়ু-ধূলি সাধারণতঃ মস্তকের চুলে, কানে, মুখে ও বস্ত্রে অলক্ষ্যে সংলগ্ন হয় এবং খনিজ ধূলি সাধারণতঃ ফ্যাক্টরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কার্য্যরত ব্যক্তিদের নখের নিম্নে, হস্তে, গাত্রে ও বস্ত্র প্রভৃতিতে সংলগ্ন থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গন্ধকের কারখানায় গন্ধকের কণা, লৌহের কারখানায় লৌহচুর ইত্যাদি অলক্ষ্যে শ্রমিকদের দেহে সংলগ্ন হয়।

অপরাধীরা ঘটনাস্থল হতে পালিয়ে এসে অন্যত্র ধরা পড়ার পর প্রায়ই সাফাই দেয় যে তারা আদপেই ঘটনাস্থলে যায় নি। এই ক্ষেত্রে অপরাধীর পাদুকা সংলগ্ন মাটি বা ধূলি সংগ্রহ করে উহার সহিত ঘটনাস্থল হতে সংগৃহীত মাটী বা ধূলি সংগ্রহ করে উহাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও তুলনা করে বলে দেওয়া যায় যে ঐ অপরাধী নিশ্চয়ই একবার ঐ স্থানে গমন করেছিল। একজন অপরাধী পালিয়ে এসে ধরা পড়ার পর তার পাদুকাতে গোবর ও পচা মাটী দেখা যায়। এর পর ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ঐখানেও ঐরূপ গোবর বা পচা মাটী ন্যস্ত আছে। বহু ক্ষেত্রে মোটরের চাকার তলায় ও উহার খাঁজে ঐরূপ দুর্ঘটনার স্থলের মৃত্তিকা ও ধূলি সন্নিবেশিত দেখা গিয়েছে।

[দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল হতে বহু দূরে সংশ্লিষ্ট মোটরগাড়ী পাকড়াও

করার পর উহার চাকার তলায় ও খাঁজে এবং অন্যান্য স্থানে কাদা, মাটী, ধূলি পরিদর্শন করা উচিত। এই কাদা মাটী ধূলি প্রভৃতির সহিত অবশ্য রক্তের দাগ, আহত বা নিহতের কাপড়ের অংশ, বা তন্তু, মাংস বা ছাল, এবং কেশ প্রভৃতিরও খোঁজ করা উচিত হবে। এ'ছাড়া আরও দেখতে হবে সংঘাতের স্থানে অপর শকটের রঙ সন্নিবেশিত হয়েছে কি'না এবং উহার কোন্ কোন্ অংশ কিরূপ বিকৃত বা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হয়েছে। গাড়ীর কোনও স্থানের কাঁচ ভগ্ন হলে উহাও সাবধানে পরিলক্ষ্য করতে হবে। এবং ঘটনাস্থল হতে সংগৃহীত কাঁচের টুকরা সংগ্রহ করে এনে দেখতে হবে যে ঐ সকল কাঁচের টুকরা ঐ গাড়ীর কাঁচের ভগ্ন টুকরা কি'না ?

বহুস্থলে মোটরগাড়ীর নম্বরের একটী দুইটী 'ডিজিট' ভুল করে টুকে নেওয়া হয়েছে। এই স্থলে ঐ গাড়ীর আকার (সিডন্ বডি ঢাকা বা খোলা, কি রঙের, ছোট না বড়, ইত্যাদি) জেনে নিয়ে নম্বরের ডিজিটের কমবিনেশন ও পরামুটেশন দ্বারা সম্ভাব্য বা প্রকৃত নম্বর বুঝে উহার সহিত গাড়ীর আকৃতি প্রভৃতির সহিত তুলনা করে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী শকটটী খুঁজে বার করা যায়।]

তদন্তকারী রক্ষীদের ফোরেন্সিক সায়েন্স সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তা' না হলে ঘটনাস্থলে এসে কোন্ কোন্ দ্রব্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য তারা গ্রহণ করবেন তা জানবেন কি করে ? কোনও এক পাঁচিলের উপরে ন্যস্ত কাঁটা তারের বেড়া ডিঙবার সময় অপরাধীর গাত্র ক্ষতবিক্ষত হওয়া স্বাভাবিক। ফোরেন্সিক সায়েন্সে অভিজ্ঞ হলে তদন্তকারী অফিসার নিশ্চয়ই ঐ স্থানে কাপড়ের তন্তু, রক্ত, মাথার কেশ বা গাত্র লোম, মাংস বা ছাল সংলগ্ন আছে কি'না তা খুঁজে দেখবেন। কারণ এই তন্তুর সহিত অপরাধীমন্য ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রের তন্তুর, এবং ঐ রক্ত, মাংস, ছাল, কেশ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উহার দেহ পরীক্ষা

করে, এবং উহার কেশ ও রক্ত প্রভৃতি তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করে ঐ ব্যক্তিই যে অপরাধী তা জানা যাবে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাবো যে তদন্তকারীদের কেবলমাত্র আইনজ্ঞ হলেই হলো না, তাদের বহুবিধ শাস্ত্র ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ হওয়া চাই। বহু ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহিত আলাপ আলোচনা করে তাঁদের মনের কথা জেনে নিতে হয়। এইরূপ আলোচনা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে হলে নিজেকে বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে, তা' না হলে আলাপ আলোচনা দ্বারা কাউকে বিমুগ্ধ করা অসম্ভব। সাহিত্যিকদের সহিত আলোচনাকালে যেমন বিবিধ দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে হবে তেমনি দার্শনিকদের সহিত আলোচনায় বিবিধ দর্শন ও বিজ্ঞানের অবতারণা করা চাই। এক কথায় পুলিশ অফিসারদের প্রতিটী শাস্ত্রেই প্রাথমিক জ্ঞান কিছু কিছু অর্জ্জন করে রাখতে হবে। এ'ছাড়া তাদের আরও হতে হবে বলিষ্ঠ, সাহসী, চরিত্রবান এবং কর্ম্মঠ। এদেশের সংস্কৃতি চায় যে দেশের রক্ষকগণ সাধুচরিত্রের হবে, তা না হলে তাদের প্রতি এদের বিশ্বাস কিছুতেই আসবে না। এইজন্যে একাধারে যৌনজ এবং অযৌনজ চরিত্র উত্তম রাখতে এদেশের রক্ষীরা বাধ্য।

রীতি নীতি—শাসন সম্পর্কীয়

শাসন সম্পর্কীয় কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করার উপর সমগ্র রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে থাকে। রক্ষী বিভাগে শাসন সম্পর্কীয় দক্ষতার প্রয়োজন যে সর্ব্বাধিক ইহা সর্ব্বতভাবে স্বীকার্য্য। পুলিশ বিভাগীয় অফিসারদের বহুবিধ কর্ত্তব্যের মধ্যে মানুষের সহিত ব্যবহার শিক্ষা অন্যতম। সাধারণতঃ রক্ষিগণকে তিন প্রকার মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়েছে, যথা—ফরিয়াদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, অপরাধী বা আসামী; এবং এই উভয়পক্ষীয় ব্যক্তিদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষিগণ। এতদ্ব্যতীত রক্ষিগণকে উর্দ্ধতন এবং অধস্তন অফিসারদের সহিত পারস্পরিক ব্যবহার সম্পর্কীয় রীতি-নীতিও সাবধানে শিক্ষা করা প্রয়োজন।

প্রথমে জনসাধারণের সহিত রক্ষীদের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে বলা যাক্। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে রক্ষীমাত্রেই কোনও ব্যক্তি বিশেষের ভৃত্য না হলেও সমগ্রভাবে দেশবাসীর সেবক।

খরিদ্দারগণ যেমন ব্যবসায়ীদের লক্ষ্মী তেমন পুলিশের লক্ষ্মী হচ্ছে পাবলিক। অর্থাৎ একের জন্যই অপরের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এইজন্য পাবলিককে পুলিশের প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে তাদের সহিত করতে হবে সুমধুর ব্যবহার। কিন্তু এই সম্পর্কে দুর্ব্বলতা দেখানো বা আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করলে ফল হবে বিপরীত। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষকে খুসী করতে গিয়ে সমগ্র দেশের তাঁরা অপকার করে বসবেন। রক্ষিগণ 'গার্জ্জন অব্ পাবলিক' নন বটে কিন্তু তাঁরা 'গার্জ্জেন অব্ পিশ'; জনতা সম্পর্কীয় এই দুইটী বিষয়ে সামঞ্জস্য আনতে রক্ষিগণ বাধ্য। সমাজকে রক্ষা করতে

হলে প্রয়োজনবোধে উহার দেহে অস্ত্রোপচার করতেও দ্বিধা করলে চলবে না। এইজন্য কঠোরতা অবলম্বন করলেও রক্ষীদের তা করতে হবে মৃদু (মৃদু+মিষ্টি) হাসির সহিত, যাতে জনতা বুঝতে পারে যেটুকু ব্যথা তাঁরা দিয়েছেন তা তারা বাধ্য হয়েই দিয়েছেন, এবং যতটুকু ব্যথা তাঁরা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী ব্যথা তাঁরা নিজেরাই পেয়েছেন।

জনতার সহিত রক্ষীদের ব্যবহার অবস্থাভেদে দুই প্রকারের হওয়া উচিত, যথা—(১) অসংশ্লিষ্ট জনসাধারণ, (২) মামলা সম্পর্কে যারা আগত। অসংশ্লিষ্ট জনসাধারণের সহিত মন খুলে মেলামেশা করা যেতে পারলেও মামলা সম্পর্কীয় লোকজনদের সহিত সেইরূপে মেলামেশা করলে চলবে না; কারণ এইখানে পরস্পর বিরোধী বিবিধ স্বার্থসম্বলিত ব্যক্তিদের তাঁদের সম্মুখীন হতে হয়। এই স্থলে একদলের সহিত অতিশয় বন্ধুত্বভাব উহাদের বিরোধী পক্ষীয় ব্যক্তিদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। এই ক্ষেত্রে বাকসংযমের এবং মনের ভাব গোপনের প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। এমন কি কোন পক্ষের মামলা তাঁরা বিশ্বাস করছেন এবং কোন পক্ষের পক্ষে তাঁরা রায় দেবেন তা রিপোর্ট দাখিলের শেষ দিন পর্য্যন্ত কোনও পক্ষকেই জানতে দেওয়া উচিত হবে না। তদন্তের প্রারম্ভে বা মধ্যপথে নিজেদের অভিপ্রায় প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ অভিযোগ মুখর হয়ে তদন্তকারীর বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা নালিশ জানিয়ে তাকে অপদস্থ করতে পারে। এইরূপ মামলার তদন্তে কোনও পক্ষের বাড়িতে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা বা অনুরোধে পড়ে চা পান করা উচিত হবে না। কিন্তু যদি অবস্থা গতিকে এইরূপ এক পরিস্থিতি ঘটে গিয়ে থাকে তাহলে তদন্তকারী রক্ষীর উচিত ঐথান হতে বেরিয়ে এসে বিপক্ষ পক্ষীয় ব্যক্তির বাড়িতেও ঠিক অতটুকু সময় অতিবাহিত করে তাদেরও আপ্যায়িত গ্রহণ করা। অন্যথায় এক পক্ষীয় ব্যক্তিদের ধারণা হতে পারে যে তদন্তকারী

অফিসারদের সহিত অপর পক্ষীয় ব্যক্তিদের অন্যায়রূপে বন্ধুত্ব স্থাপন হয়ে গিয়েছে। এতদ্ব্যতীত তদন্তকারী অফিসারদের সহিত যদি কারও বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা বা বাধ্যবাধকতা পূর্ব্ব হতেই হয়ে থাকে তাহলে তাদেরও উচিত হবে তাদের মামলার তদন্ত নিজেরা না করে অন্য এক অসংশ্লিষ্ট অফিসারকে সেই মামলার তদন্ত করতে বলা। অবশ্য এই মামলার দুইটী পক্ষ যদি নিরপরাধী শ্রেণীর মানুষ হয় তা'হলে এইরূপ ব্যবস্থা প্রযোজ্য। সাধারণ চোর ডাকাত সম্পর্কীয় মামলার ফরিয়াদির আনীত অভিযোগের তদন্ত সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

রক্ষীদের মনে রাখা উচিত যে মানুষ যখন থানায় বা পুলিশে আসে তখন সে কম বা বেশী দুঃখভারাক্রান্ত (agrieved) মন নিয়ে আসে। খুবই ব্যথা না পেলে বা অসুবিধায় না পড়লে বা বিশেষ রূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হলে কারও থানায় আসার প্রয়োজন হয় না। এইজন্য রক্ষীদের এই সকল ব্যক্তিদের রোগী রূপে গ্রহণ করে সান্ত্বনার বাণী শুনানো উচিত হবে। এদের কারও কারও পক্ষে রক্ষীদের ভুল বুঝে তাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করলেও করতে পারে, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও রক্ষীদের উচিত ডাক্তারদের ন্যায় তাদের রোগী মনে করা। আমরা জানি মানুষের মনের গাঁটে গাঁটে প্রতিরোধ স্পৃহা আছে। এই প্রতিরোধ স্পৃহার জন্য আমাদের অবচেতন মনের সব ইচ্ছা বাইরে প্রকাশ পায় না। কিন্তু মানুষ উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ, ভীত ও শোকে মোহাচ্ছন্ন হলে এই প্রতিরোধ শক্তির বিলোপ ঘটে। তারা তখন যা বলা উচিত বা যা করা উচিত নয় তাই তারা বলে বা করে বসে। কখনও কখনও এইরূপ ক্ষেত্রে তারা মস্তিষ্কের আদেশ ব্যতিরেকেও পরিচালিত হতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাদের মানসিক রোগী ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারেনা। এই সময় রক্ষীদের উচিত হবে চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের

সান্ত্বনা বাণীর দ্বারা নিরাময় করে, তাদের মনের যা কিছু ভয় ভাবনা অবিশ্বাস ও ভুল ধারণা দূর করে তাদের নিরাময় করা। কি কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অভিযোগকারী ব্যক্তিকে সমধিক সাহায্য করা গেল না তা আইনগত বিশ্লেষণ দ্বারা শুধু তাদের বুঝিয়ে দিলেই হলো না, সেই সঙ্গে তাদের এ'ও বলে দিতে হবে যে কোথায় ও কেমন করে তাদের সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে প্রয়োজনীয বা অপ্রয়োজনীয় সব কথা বলতে দিলে এবং ধৈর্য্যসহকারে সময় নষ্ট করে তা শুনলে মানুষের মন হাল্কা হয়ে যায় এবং সে খুশী হয়ে উঠে। আমার মতে সুযোগ ও সুবিধে থাকলে আইনের 'ওয়ার্ডিঙ্'-এর বদলে আইনের 'স্প্রিট্' বা উদ্দেশ্য গ্রহণ করাই সুধীমাত্রেরই উচিত হবে। এ'ছাড়া একটী আইন দ্বারা যা পারা যায় না—তা'ই অপর আইন দ্বারা পারা যায়। উদ্দেশ্য মহৎ থাকলে দোষও যে গুণ হয়ে যায় তা অনস্বীকার্য্য। তবে দেখতে হবে এর দ্বারা সত্য সত্যই সমাজ উপকৃত হচ্ছে কিনা, একটী অপরাধ নিরোধ করতে গিয়ে অপর একটী অপরাধ করা হচ্ছে কিনা এবং একজনের উপকার করতে গিয়ে অপর জনের কিংবা নিজের অপকার করা হচ্ছে কিনা।

রক্ষীদের ব্যবহার যেমন জনতার প্রতি মধুর হওয়া উচিত তেমনি মধুর ব্যবহার জনতারও রক্ষীদের প্রতি করা উচিত। জনতার বুঝা উচিত যে রক্ষীদের বহু পরস্পর বিরোধী স্বার্থসম্বলিত ব্যক্তির সহিত ব্যবহার করতে হয়, এইজন্য সকলকেই সকল সময় একত্রে ও একই রূপে খুশী করা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হতে পারে না। এ'ছাড়া তারা সাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে সাধারণকে রক্ষা তো করতেই পারে না এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে তাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেদেরও তারা রক্ষা করতে পারে নি। এইজন্য সুষ্ঠু শাসন কার্য্যের জন্য রক্ষীদের ন্যায় জনসাধারণেরও দায়িত্ব কম নয়। এ'ছাড়া রক্ষীদলও সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষের

ন্যায়ই তাদেরও স্ত্রী পুত্র, রোগ শোক, চিন্তা ভাবনা আছে। দিবা রাত্রি যাদের পরিশ্রম করতে হয় তাদের মেজাজ সব সময় ঠিক নাও থাকতে পারে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে তাদের বহু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে হয়। দৈবাৎ একজনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বসলে ঐ রক্ষী নিজে তা ভুলে যায়, কিন্তু ঐ ভুক্তভোগী ব্যক্তি জীবনে ঐ একদিনই হয়তো পুলিশের সংস্পর্শে এসেছে, এইজন্য সে তার ঐ খারাপ ব্যবহার জীবনভোর মনে রাখে এবং অযথা পুলিশমাত্রেরই নিন্দা করে বেড়ায়। সমষ্টিগত ভাবে পুলিশের নিন্দার যা কিছু কারণ তা এইখানেই। এই সকল বিষয় ভেবে জনসাধারণের বরং রক্ষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে তাদের সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করা উচিত। পৃথিবীর প্রতিটী দেশের পুলিশদলের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ তা নিম্নের একটী গণ-গল্প হতে বুঝা যাবে।

"এদের জীবনের সহিত অরণ্যবাসী একশ্রেণীর মনুষ্যগোষ্ঠির জীবনের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। এরা আত্মরক্ষার্থে ঐ গহন বনে মাচা বেঁধে তার উপর বসবাস করে। মশা প্রতিদিন দুই একটা তাদের কামড়াবেই, মাঝে দুই একটা কাঁকড়া বিছাও। কিন্তু এর জন্য তারা অধিক চিন্তিত নয়, তাদের বাঘে না খেলে ও কুম্ভীরে না ধরলেই হলো। দু'দশ বৎসরে একবার দু'বার সর্পাঘাত হতেও তাদের আত্মরক্ষা করতে হয়, ঝাড়ফুঁক করে বা ঔষধ লেপন করে। এ'ছাড়া সেখানে একপ্রকার অদৃশ্য বীজাণু আছে, তাকে বলে 'গোপন কীট', হয় তো এই বীজাণু আট বৎসর পূর্ব্বে কারুর দেহে ঢুকে বসে আছে, কিন্তু সে তা জানতেই পারে নি। আট বৎসর পর বিশেষ একটী আকাঙ্ক্ষিত দিনে বা ক্ষণে সে জানতে পারবে যে ঐ দিন হতে আট বৎসর পূর্ব্বে তার ফুসফুস ঐ বীজাণু বিকৃত ও ফোঁপরা করে দিয়েছে, জীবনে তার উন্নতির আর কোনও আশাই নেই।"

উপরের রহস্যোক্তি সম্পূর্ণ সত্য না হলেও রক্ষীদের যে কঠোর জীবন-যাপন করে পুড়ে সোনা হয়ে বার হতে হয়, সে কথা অতীব সত্য। এইরূপ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রক্ষিগণ সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়াই স্বাভাবিক। এই দিক হতে বিচার করলে রক্ষিগণ জনসাধারণের গর্ব্বের বস্তুই হওয়া উচিত।

জনতা ও রক্ষীদের পারস্পরিক ব্যবহারের কথা বলা হলো, এইবার ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন রক্ষীদের পারস্পরিক ব্যবহারের কথা বলা যাক। অধস্তন অফিসারদের প্রতি ঊর্দ্ধতন অফিসারদের কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলে থাকেন যে কি অধস্তন অফিসার এবং কি জনসাধারণ এই উভয়েরই নিকট একটী পোষাকী (Ceremonial) ভাব দেখানো উচিত হবে। অজানার প্রতি মানুষের যে ভয় ও ভক্তি থাকে জানা লোকের প্রতি তা স্বভাবতই কারুর থাকে না। এ ছাড়া জাঁকজমক ও পোষাকী ভাব এবং দূরত্ব প্রায়ই একটী সমীহ ভাবের সৃষ্টি করে থাকে। বাধ্যতা ও নিয়মতান্ত্রিক কারণে ইহার প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। কিন্তু অপর পক্ষীয়েরা বলে থাকেন যে অহেতুক ভীতি ও সমীহ প্রভৃতির কারণে অধস্তন অফিসররা ঊর্দ্ধতন অফিসারদের নিকট মনের কথা সকল সময়ে বলে না, এমন কি বহুক্ষেত্রে এইজন্য তারা বহু প্রয়োজনীয় সত্য গোপন করে গিয়েছে, তা যথাসময়ে কর্ত্তৃপক্ষকে জানায় নি। অবশ্য তাঁরা এ কথাও বলে থাকেন যে এই ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন অফিসারদের মধ্যবর্ত্তী কয়েকটী পদের সৃষ্টি করে এই অসুবিধা দূর করা যেতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে এই মধ্যবিত্ত অফিসাররা এই ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন অফিসারদের মধ্যে সংযোগের কার্য্য করতে পারবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করলে প্রতীত হবে যে এই সম্পর্কীয় তুইটী মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে রক্ষীদের

পারস্পরিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। কিন্তু প্রত্যেক অফিসারেরই স্মরণ রাখা উচিত যে উর্দ্ধতন অফিসারদের ধাপ্পায় ভুলানো সম্ভব হলেও অধস্তন অফিসারদের ঐরূপে ধাপ্পায় ভুলানো যায় না। একজন অফিসারের প্রকৃত এলেম, চরিত্র ও দক্ষতা উর্দ্ধতন অফিসারদের নিকট অজ্ঞাত থেকে গেলেও অধস্তন অফিসারদের নিকট তা ধরা পড়ে যায়। এইজন্য অধস্তন অফিসারদের নিকট সশ্রদ্ধ ও নিরবিচ্ছিন্ন আনুগত্য পেতে হলে শুধু অফিসার হিসেবে নয় মানুষ হিসেবেও শ্রেষ্ঠতর হতে হবে। উর্দ্ধতন অফিসারদের এইজন্য আত্মাকে বঞ্চিত করেও এমন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে যাতে কারুর তাদের প্রতি ঘৃণার বা সন্দেহের উদ্রেক না হয়, কেবলমাত্র এই উপায়েই তারা তাঁবেদার রক্ষীদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য আদায় করতে সক্ষম। এ'ছাড়া যে কার্য্য তাঁরা অধস্তন রক্ষীদের নিকট আশা করেন, সেই আদর্শ ও কার্য্য হতে নিজেকে একটি দিনও বিচ্যুত করলে চলবে না। অধস্তন অফিসাররা যদি বুঝে উর্দ্ধতন অফিসার তাদের মতই কঠোর, পরিশ্রমী, সময়জ্ঞানী ও নিয়মতান্ত্রিক তবেই কর্ত্তব্যচুতির জন্য যা কিছু ধমকাধমকি বা সাজা তারা মনে প্রাণে অনুমোদন করবে। এ'ছাড়া উর্দ্ধতন অফিসারদের আরও কয়েকটী গুণের অধিকারী হওয়া চাই। এই সকল গুণ একটী সুখী পরিবারের প্রধান ব্যক্তির অনুরূপ হওয়া উচিত। বহুক্ষেত্রে অধস্তন অফিসারগণ তাদের অভাব অভিযোগের কথা উর্দ্ধতন অফিসারদের জানাতে পারে নি। এইজন্য উর্দ্ধতন অফিসারদের উচিত হবে এই সকল অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে তা জেনে বা বুঝে নিয়ে যথা সত্বর তা অপসারিত করা। কারুর কারুর অভিযোগ ভুল ধারণা প্রসূত হলেও তা বার হয়ে আসতে দেওয়া উচিত। অভিযোগের মধ্যে মনের ব্যথা বার হয়ে এলে মন এমনিই

হাল্কা হয় এবং কোন লোকটী কি বা কে তা'ও অবগত হওয়া যায়। এইজন্য ঊর্দ্ধতন অফিসারদের উচিত হবে অধস্তন অফিসারদের অন্যায় অভাব ও অভিযোগ ধীর ভাবে শুনে যাওয়া এবং এমন এক অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করা যাতে সে তার মনে ক্ষোভ চেপে না রেখে নিঃসঙ্কোচে তা বার করে দিতে পারে। ঊর্দ্ধতন অফসারদের ভুলে গেলে চলবে না তাদের যা কিছু হাত বা পা তা এই অধস্তন অফিসারগণই এবং তাদের সকলের সমবেত চেষ্টা (Team work) ব্যতীত কোনও কার্য্যই সুষ্ঠু ভাবে সমাধা হতে পারে না। ঊর্দ্ধতন অফিসারদের ব্যক্তিগত একটী কার্য্যের মধ্যেও কোনও অধস্তন অফিসারকে টেনে আনা আদপেই উচিত হবে না। ইহা রক্ষীসুলভ নিয়মতান্ত্রিকতার অতীব ক্ষতিকর এবং ইহা একটী অপরাধও বটে। এ'ছাড়া ঊর্দ্ধতন অফিসারদের মন হওয়া উচিত নিরপেক্ষ ও গুণগ্রাহী, অধস্তন অফিসারদের প্রতিটী উত্তম কার্য্যের জন্য তাদের আগ্রহশীলও হতে হবে।

ঊর্দ্ধতন অফিসারগণের মন যদি বিকৃত (Perversed) হয় তা'হলে উহা রাষ্ট্রের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর। এইজন্য সময় সময় তাঁদের আত্ম-বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। নিম্নে এই সম্পর্কে একটী বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক অধস্তন অফিসারটীকে দেখলেই আমার যেন কেমন এক বীতরাগ আসতো। অথচ সে আমার কাছে কোনও অপরাধেই অপরাধী ছিল না। কাজকর্ম্মও যে তার খুব খারাপ তা'ও নয়। এই সম্পর্কে আমি নিজেই নিজের মনোবিশ্লেষণ করি। ধীরে ধীরে আমার মনে পড়ে পাঠ্যকালে কোনও এক ব্যক্তি আমাদের পরিবারের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে। এবং ঐ ব্যক্তির মুখাবয়বের সহিত আমার এই নির্দ্দোষ অফিসারটীর মুখাবয়বের কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

এইরূপ আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা আমি আমার অবচেতন মনের এই অহেতুক বিরাগ দূর করে ফেলেছিলাম।"

এইরূপ আর একটী বিকৃত মনের উদাহরণ স্বরূপ অপর একটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো—সৌভাগ্যের বিষয় ভারতীয় পুলিশ এইরূপ বিকৃত মনের পরিচয় কদাচ দিয়েছেন।

"অপরের মনে ভীতির উদ্রেক না করতে পারলে কেবলমাত্র প্রীতি ও ভক্তি নিরর্থক। যতক্ষণ না কেউ বুঝবে তুমি কামড়াতে পার, ততক্ষণ তারা তোমাকে মানবে না। যদি তুমি একদিন কারুর উপকার করো, তা'হলে পরদিন সে তোমার কাছে আবার এক উপকার চাইবে। এই উপকার প্রত্যাশার কোনও শেষ নেই। যেদিন হতে তুমি তার উপকার করা বন্ধ করবে সেইদিন হ'তে সেই ব্যক্তি নিন্দামুখর হয়ে তোমার ক্ষতি করতে সচেষ্ট হবে। অধিক সংখ্যায় কারুর উপকার করলে সে উহা উপকার মনে না করে সে উহা তার একটী ন্যায্য প্রাপ্য বা দাবী মনে করে। কিন্তু তুমি যদি সুবিধে পেলেই লোকের ক্ষতি করতে সমর্থ হও, তা'হলে তারা তোমাকে সর্ব্বদা ভয় করে চলবে। তারা কদাচ তোমার সামান্যমাত্র বিরাগ-ভাজন হতে সাহসী তো হবেই না বরং নানারূপে তারা তোমার আদেশ শুনতে ও উপকার করতে সচেষ্ট হবে; প্রতিদানে তারা তোমার নিকট হতে শুধু এইটুকু চাইবে যে তুমি যেন দয়া করে কোনও দিন তাদের কোনও ক্ষতি করে না বসো।"

এইরূপ মতবাদ এই যুগে আমি অচল বলে মনে করি। এই যুগে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সুদক্ষ ও সুখী একটী পরিবার। মধ্য যুগে ধারণা ছিল যে, যে যত বড় বুলিই (Bully) সেই ততো ভালো অফিসার। আধুনিক যুগে ইহা সর্ব্বত্রই পরিত্যাজ্য। কারণ অধস্তন অফিসারগণ উর্দ্ধতন

হাল্কা হয় এবং কোন লোকটী কি বা কে তা'ও অবগত হওয়া যায়। এইজন্য উর্দ্ধতন অফিসারদের উচিত হবে অধস্তন অফিসারদের অন্যায় অভাব ও অভিযোগ ধীর ভাবে শুনে যাওয়া এবং এমন এক অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করা যাতে সে তার মনে ক্ষোভ চেপে না রেখে নিঃসঙ্কোচে তা বার করে দিতে পারে। উর্দ্ধতন অফসারদের ভুলে গেলে চলবে না তাদের যা কিছু হাত বা পা তা এই অধস্তন অফিসারগণই এবং তাদের সকলের সমবেত চেষ্টা (Team work) ব্যতীত কোনও কার্য্যই সুষ্ঠু ভাবে সমাধা হতে পারে না। উর্দ্ধতন অফিসারদের ব্যক্তিগত একটী কার্য্যের মধ্যেও কোনও অধস্তন অফিসারকে টেনে আনা আদপেই উচিত হবে না। ইহা রক্ষীসুলভ নিয়মতান্ত্রিকতার অতীব ক্ষতিকর এবং ইহা একটী অপরাধও বটে। এ'ছাড়া উর্দ্ধতন অফিসারদের মন হওয়া উচিত নিরপেক্ষ ও গুণগ্রাহী, অধস্তন অফিসারদের প্রতিটী উত্তম কার্য্যের জন্য তাদের আগ্রহশীলও হতে হবে।

উর্দ্ধতন অফিসারগণের মন যদি বিকৃত (Perversed) হয় তা'হলে উহা রাষ্ট্রের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর। এইজন্য সময় সময় তাঁদের আত্ম-বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। নিম্নে এই সম্পর্কে একটী বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক অধস্তন অফিসারটীকে দেখলেই আমার যেন কেমন এক বীতরাগ আসতো। অথচ সে আমার কাছে কোনও অপরাধেই অপরাধী ছিল না। কাজকর্ম্মও যে তার খুব খারাপ তা'ও নয়। এই সম্পর্কে আমি নিজেই নিজের মনোবিশ্লেষণ করি। ধীরে ধীরে আমার মনে পড়ে পাঠ্যকালে কোনও এক ব্যক্তি আমাদের পরিবারের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে। এবং ঐ ব্যক্তির মুখাবয়বের সহিত আমার এই নির্দ্দোষ অফিসারটীর মুখাবয়বের কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

এইরূপ আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা আমি আমার অবচেতন মনের এই অহেতুক বিরাগ দূর করে ফেলেছিলাম।"

এইরূপ আর একটী বিকৃত মনের উদাহরণ স্বরূপ অপর একটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো—সৌভাগ্যের বিষয় ভারতীয় পুলিশ এইরূপ বিকৃত মনের পরিচয় কদাচ দিয়েছেন।

"অপরের মনে ভীতির উদ্রেক না করতে পারলে কেবলমাত্র প্রীতি ও ভক্তি নিরর্থক। যতক্ষণ না কেউ বুঝবে তুমি কামড়াতে পার, ততক্ষণ তারা তোমাকে মানবে না। যদি তুমি একদিন কারুর উপকার করো, তা'হলে পরদিন সে তোমার কাছে আবার এক উপকার চাইবে। এই উপকার প্রত্যাশার কোনও শেষ নেই। যেদিন হতে তুমি তার উপকার করা বন্ধ করবে সেইদিন হ'তে সেই ব্যক্তি নিন্দামুখর হয়ে তোমার ক্ষতি করতে সচেষ্ট হবে। অধিক সংখ্যায় কারুর উপকার করলে সে উহা উপকার মনে না করে সে উহা তার একটী ন্যায্য প্রাপ্য বা দাবী মনে করে। কিন্তু তুমি যদি সুবিধে পেলেই লোকের ক্ষতি করতে সমর্থ হও, তা'হলে তারা তোমাকে সর্ব্বদা ভয় করে চলবে। তারা কদাচ তোমার সামান্যমাত্র বিরাগ-ভাজন হতে সাহসী তো হবেই না বরং নানারূপে তারা তোমার আদেশ শুনতে ও উপকার করতে সচেষ্ট হবে; প্রতিদানে তারা তোমার নিকট হতে শুধু এইটুকু চাইবে যে তুমি যেন দয়া করে কোনও দিন তাদের কোনও ক্ষতি করে না বসো।"

এইরূপ মতবাদ এই যুগে আমি অচল বলে মনে করি। এই যুগে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সুদক্ষ ও সুখী একটী পরিবার। মধ্য যুগে ধারণা ছিল যে, যে যত বড় বুলিই (Bully) সেই ততো ভালো অফিসার। আধুনিক যুগে ইহা সর্ব্বত্রই পরিত্যাজ্য। কারণ অধস্তন অফিসারগণ ঊর্দ্ধতন

অফিসারদের ব্যক্তিগত কর্ম্মচারী নয়, বরং উভয় দলই সমানভাবে রাষ্ট্রের কর্ম্মচারী। রাষ্ট্রের তথা দেশের হিতাহিতের জন্য উভয়দলই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমানভাবেই দায়ী। এইরূপ মনোবৃত্তি যে কোনও দলই পছন্দ করে নি, তা কয়েকটী গণগল্প অনুধাবন করলে বুঝা যাবে। কোনও একটী বিশেষ ব্যবস্থা মানুষ অপছন্দ করলে সেই সম্বন্ধে মুখে মুখে বহু হাস্যকর গণগল্পের সৃষ্ট হয়। এই সকল গণগল্পের সৃষ্টির তারিখ সময় নির্দ্ধারণ করতে পারলে ঐ সময়কার জনগণের বিবিধ অসুবিধা ও সমস্যার বিষয় অবগত হওয়া যায়। এইরূপ একটী গণগল্প প্রমাণস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"প্রথম মহাসমরে মেসোপটিমিয়াতে আমি একজন সাধারণ সৈনিকরূপে গমন করেছিলাম। এইখানে ধীরে ধীরে আমার কয়েক ধাপ পদোন্নতিও হয়েছিল। একদিন আমরা কেমন কম্যাণ্ড করতে শিখেছি তা পরীক্ষা করার জন্যে একজন কর্ণেল সাহেব আমাদের শিবিরে এসে উপস্থিত হ'লেন। একটী ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে প্যারেড্ করানোর জন্য আদিষ্ট হয়ে আমি ভাবছিলাম কম্যাণ্ড কার্য্য কিরূপে সুরু করবো। এমন সময় এমন একটা মতলব আমার মাথায় এলো যাতে আমি পরীক্ষায় পাশ তো হ'লামই এমন কি উহাতে প্রথম স্থানও অধিকার করলাম। আমি প্রথমেই ছুটে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান একজন সিপাহীর টুঁটি চেপে ধরে বলে উঠলাম, 'এই উল্লুক কাঁহাকো! তুম শির হেলাতা, জানতা নেহি হাম্ কৌন? আভি তুহার আঁখ উখাড়কে শির তোড় দেঙ্গে। ঠিকসে খাড়া হও।' এর পর আমাকে আর একটী মাত্রও কম্যাণ্ড উচ্চারণ করতে হয় নি। অশ্বে উপবিষ্ট কর্ণেল সাহেব খুশী হয়ে বলে উঠলেন, "ঠিক হ্যায়, যাও পাশ।"

বহু ক্ষেত্রে মানুষ যা মুখে কাউকে বলতে সাহসী হয় না তা তারা

গণগল্প দ্বারা প্রকাশ করে থাকে। এই গণগল্পে থাকে প্রতিবাদের সুর। এইজন্য ইহা হাস্যকররূপে রচনা করা হয়। এই সকল গল্পগুলি ঐতিহাসিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। মনোবিজ্ঞানের ও সমাজ বিজ্ঞানের জন্য ইহাদের অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। এইগুলিকে নিছক গল্প বলে উড়িয়ে না দিয়ে উহাদের সাবধানে সংগ্রহ করা উচিত। নিম্নে এই সম্পর্কে একটী য়ুরোপীয় গণগল্প উদ্ধৃত করা হলো।

"জনৈক অষ্ট্রীয়ানের মাথার ঘিলু খারাপ হয়ে যায়। এইজন্যে চিকিৎসার্থে সে এক ডাক্তারের কাছে যায়। চিকিৎসক ভদ্রলোক খুলি অপারেশন করে ব্রেণটী বার করে নিয়ে তাকে বলেন, 'ব্রেণটী আমি মেরামত করে রাখবো, সাতদিন পরে এসে নিয়ে যেও।' এর পরে সাতদিন কেন সাত মাস অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু লোকটী আর আসে না। তারপর একদিন ভিয়েনার পথে লোকটীর সঙ্গে ডাক্তারের দেখা হয়ে যায়। ডাক্তার তার পথ আগলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি মশাই। আপনার ব্রেণটী সেরে রাখলাম, কিন্তু কৈ নিয়ে গেলেন না তো!' কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না ক'রে লোকটী উত্তর করেছিল, 'আজ্ঞে, ব্রেণের আমার আর তো দরকার নেই। আমি যে সৈন্য বিভাগে ঢুকে পড়েছি।"

নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের প্রারম্ভে তৎকালীন বৃহৎ বাঙ্গালায় ইংরাজ-পুলিশ-সাহেবদের আইন ও বাংলা শিক্ষা দিবার জন্যে ভাগলপুরে একটী পুলিশ ট্রেনিং কলেজ ছিল। কিন্তু এই সকল ইংরাজ-পুলিশ-সাহেবদের শিক্ষা দেওয়ার ভার ছিল তাহাদের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী দারোগাদের উপর। স্বভাবতঃই ঐ সময়কার দারোগা শিক্ষকদেরই আবার ঐ সকল পুলিশ সাহেবদের ট্রেনিং শেষ হবার পরই—তাঁদের ঐ পূর্ব্বতন ছাত্রদের অধীনে কার্য্য করতে হতো—এই কারণে সকল ক্ষেত্রে নিম্নপদস্থ

কর্ম্মচারীদের পক্ষে ঐ সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের শিক্ষাদানের সময় বাগে রাখা সম্ভব হতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়ার জন্য এই সকল দারোগা শিক্ষকদেরই প্রায়ই প্রিন্সিপ্যালের নিকট হতে ভর্ৎসিত হতে হয়েছে। ঐ একই নিয়মতান্ত্রিকতার কারণে প্রতিবাদ করে প্রকৃত তথ্য না জানাতে পারলেও প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁরা নিজেদের মধ্যে কয়েকটী গণগল্প চালু করেছিল। কিরূপ সুন্দরভাবে তাদের মনের ভাব এই গণগল্পের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে তা নিম্নে উদ্ধৃত একটী গণগল্প হতে বুঝা যাবে।

"উড়িষ্যা দেশে একজন করদ নৃপতির উত্তরাধিকারী বালককে শিক্ষা দিবার জন্য জনৈক গুরুমহাশয় নিযুক্ত হয়েছিলেন। পঠনকালে রাজপুত্র একটী স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকতো এবং পরিচারকগণ তার শিরে চামর ব্যজন করতো। এমতাবস্থায় গুরুমহাশয় সিংহাসনের পার্শ্বে হাঁটু গেড়ে বসে করজোড়ে মহারাজ কুমারকে অনুরোধ জানাতো 'মহারাজ ক' বলিতে আজ্ঞা হোক'।

আমাদেরও অবস্থা ঠিক অনুরূপ। এই সকল গণগল্প সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে 'সাবধান বাণী' বলা হয়। গণ-চিত্ত কোনদিকে প্রবাহিত তা এই সকল গণগল্প হতে বুঝা যায়। তাই রাষ্ট্র মাত্রেরই উচিত গণগল্পসমূহ আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করা।

[উর্দ্ধতন অফিসারদের এমন কোনও কার্জ বা উক্তি করা উচিত হবে না যাতে অধস্তন অফিসারদের আত্মসম্মানবোধ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। কারণ যার নিজের সম্মানবোধ নেই সে সহজেই অপরের আত্মসম্মানে আঘাত দিতে পারে। এইজন্য জনসাধারণের বা আত্মীয়স্বজনের সামনে কাউকে কোনও প্রকার রুক্ষ কথা বলা উচিত নয়। জনসাধারণ কিংবা তাঁবেদাররা (subordinates) যদি বুঝে যে, অমুক অফিসারের প্রকৃত অবস্থা

এইরূপ শোচনীয় তা'হলে তার পক্ষে ঐ জনতাকে বা তাঁবেদারদের বাগ মানানো আর কখনই সম্ভব হবে না। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ উর্দ্ধতন অফিসারের নিজেরও ক্ষমতা বহুল পরিমাণে কমে যাবে, কারণ তার শক্তির আকর অধস্তন অফিসারকে তিনি নিজেই নিস্তেজ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে তাঁর মান ইজ্জত ও ক্ষমতা রক্ষা করবে সেই তখন অসহায় হয়ে গিয়েছে। এইরূপ অবস্থায় তাঁদের নিজেদেরই বারে বারে প্রতিটী পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না। কাউকে কোনও রূঢ় কথা শুনাতে হলে ভদ্রভাষায় অপরের আড়ালে তা তাকে শুনানো উচিত। তাঁবেদার অফিসার কিংবা জনসাধারণ উপস্থিত থাকলে তাদের ঐরূপ কোনও কিছু বলা উচিত হবে না। এ'ছাড়া ধমকাধমকি ও রিপোর্ট একত্রে করা উচিত নয়। মুখেও বলবো, কলমেও মারবো, এই দুইটী একত্রে করা অনুচিত। এতদ্বারা অধস্তন অফিসারদের মন অকারণে বিষিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। এই অবস্থায় তারা তাদের প্রকৃত নিয়োগকর্ত্তা দেশের গভর্ণমেণ্ট তথা রাষ্ট্রের উপরও বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। উর্দ্ধতন অফিসারদের ভুলে গেলে চলবে না যে অধস্তন অফিসাররা তাদের ব্যক্তিগত বা অনুগত ভৃত্য নয়, অপর পক্ষে উর্দ্ধতন ও অধস্তন, এই উভয়বিধ অফিসারই একই রূপে একই সরকারের অনুগত ভৃত্য। তারা সকলে স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত থেকে সমগ্র দেশেরই সেবা করে থাকেন। এঁরা ব্যক্তিগত বা সামাজিকভাবে কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নন। এমনও হতে পারে যে, একজন অধস্তন অফিসারের সামাজিক মান, প্রতিপত্তি ও সম্মান একজন উর্দ্ধতন অফিসারের চেয়ে বহু উচ্চে অবস্থিত। তবে কারুর কাজে গাফ্‌লাতি দেখলে বা মিষ্ট কথায় কাজ না হলে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে। এই বিষয়ে নির্ম্মম হওয়াও ভাল কিন্তু দুর্ব্বল হওয়া আদপেই উচিত হবে না।

কর্মচারীদের পক্ষে ঐ সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের শিক্ষাদানের সময় রাগে রাখা সম্ভব হতো না। কিন্তু তা সত্বেও নিয়মতান্ত্রিকতা ক্ষুন্ন হতে দেওয়ার জন্য এই সকল দারোগা শিক্ষকদেরই প্রায়ই প্রিন্সিপ্যালের নিকট হতে ভৎ'সিত হতে হয়েছে। ঐ একই নিয়মতান্ত্রিকতার কারণে প্রতিবাদ করে প্রকৃত তথ্য না জানাতে পারলেও প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁরা নিজেদের মধ্যে কয়েকটী গণগল্প চালু করেছিল। কিরূপ সুন্দরভাবে তাদের মনের ভাব এই গণগল্পের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে তা নিম্নে উদ্ধৃত একটী গণগল্প হতে বুঝা যাবে।

"উড়িষ্যা দেশে একজন করদ নৃপতির উত্তরাধিকারী বালককে শিক্ষা দিবার জন্য জনৈক গুরুমহাশয় নিযুক্ত হয়েছিলেন। পঠনকালে রাজপুত্র একটী স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকতো এবং পরিচারকগণ তার শিরে চামর ব্যজন করতো। এমতাবস্থায় গুরুমহাশয় সিংহাসনের পার্শ্বে হাঁটু গেড়ে বসে করজোড়ে মহারাজ কুমারকে অনুরোধ জানাতো 'মহারাজ ক' বলিতে আজ্ঞা হোক'।

আমাদেরও অবস্থা ঠিক অনুরূপ। এই সকল গণগল্প সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে 'সাবধান বাণী' বলা হয়। গণ-চিত্ত কোনদিকে প্রবাহিত তা এই সকল গণগল্প হতে বুঝা যায়। তাই রাষ্ট্র মাত্রেরই উচিত গণগল্পসমূহ আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করা।

[ঊর্দ্ধতন অফিসারদের এমন কোনও কার্জ বা উক্তি করা উচিত হবে না যাতে অধস্তন অফিসারদের আত্মসম্মানবোধ ক্ষুন্ন হতে পারে। কারণ যার নিজের সম্মানবোধ নেই সে সহজেই অপরের আত্মসম্মানে আঘাত দিতে পারে। এইজন্য জনসাধারণের বা আত্মীয়স্বজনের সামনে কাউকে কোনও প্রকার রুক্ষ কথা বলা উচিত নয়। জনসাধারণ কিংবা তাঁবেদাররা (subordinates) যদি বুঝে যে, অমুক অফিসারের প্রকৃত অবস্থা

এইরূপ শোচনীয় তা'হলে তার পক্ষে ঐ জনতাকে বা তাঁবেদারদের বাগ মানানো আর কখনই সম্ভব হবে না। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ উর্দ্ধতন অফিসারের নিজেরও ক্ষমতা বহুল পরিমাণে কমে যাবে, কারণ তার শক্তির আকর অধস্তন অফিসারকে তিনি নিজেই নিস্তেজ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে তাঁর মান ইজ্জত ও ক্ষমতা রক্ষা করবে সেই তখন অসহায় হয়ে গিয়েছে। এইরূপ অবস্থায় তাঁদের নিজেদেরই বারে বারে প্রতিটী পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না। কাউকে কোনও রূঢ় কথা শুনাতে হলে ভদ্রভাষায় অপরের আড়ালে তা তাকে শুনানো উচিত। তাঁবেদার অফিসার কিংবা জনসাধারণ উপস্থিত থাকলে তাদের ঐরূপ কোনও কিছু বলা উচিত হবে না। এ'ছাড়া ধমকাধমকি ও রিপোর্ট একত্রে করা উচিত নয়। মুখেও বলবো, কলমেও মারবো, এই দুইটী একত্রে করা অনুচিত। এতদ্বারা অধস্তন অফিসারদের মন অকারণে বিষিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। এই অবস্থায় তারা তাদের প্রকৃত নিয়োগকর্ত্তা দেশের গভর্ণমেণ্ট তথা রাষ্ট্রের উপরও বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। উর্দ্ধতন অফিসারদের ভুলে গেলে চলবে না যে অধস্তন অফিসাররা তাদের ব্যক্তিগত বা অনুগত ভৃত্য নয়, অপর পক্ষে উর্দ্ধতন ও অধস্তন, এই উভয়বিধ অফিসারই একই রূপে একই সরকারের অনুগত ভৃত্য। তারা সকলে স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত থেকে সমগ্র দেশেরই সেবা করে থাকেন। এঁরা ব্যক্তিগত বা সামাজিকভাবে কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নন। এমনও হতে পারে যে, একজন অধস্তন অফিসারের সামাজিক মান, প্রতিপত্তি ও সম্মান একজন উর্দ্ধতন অফিসারের চেয়ে বহু উচ্চে অবস্থিত। তবে কারুর কাজে গাফ্‌লাতি দেখলে বা মিষ্ট কথায় কাজ না হলে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে। এই বিষয়ে নির্ম্মম হওয়াও ভাল কিন্তু দুর্ব্বল হওয়া আদপেই উচিত হবে না।

অধস্তন অফিসারদের প্রতি উর্দ্ধতন অফিসারদের ব্যবহারের কথা বলা হলো। এইবার উর্দ্ধতন অফিসারদের সহিত অধস্তন অফিসারদের ব্যবহারের কথা বলবো। অধস্তন অফিসারদের প্রধান গুণ আনুগত্য ও নিয়মতান্ত্রিক হওয়া। পারতপক্ষে তাদের এমন কোনও কাজ করা উচিত হবে না যাতে তাদের উর্দ্ধতন অফিসারগণ অসন্তুষ্ট হতে পারেন। প্রথমে তাদের বুঝে নিতে হবে উর্দ্ধতন অফিসাররা কি চান বা কি পছন্দ করেন। যদি তাহা অবৈধ না হয় তা'হলে সর্ব্বতোভাবে তাদের ইচ্ছামতই কাজ করা উচিত, ঠিক যেমন করে আর্টিষ্টগণ ডিরেক্টারের ইচ্ছামত কাজ করে থাকেন। কারণ তাঁর মাথায় কি আছে তা তারা জানে না। পরামর্শের সময় দশটা মাথা এক হলেও, প্রকৃত কাজ বা এ্যাকসনের সময় একটা মাথাই কাজ করে। অন্যথায় বিপর্য্যয় আসতে বাধ্য। কোনও এক স্কিম চালু করতে বললে প্রথমেই বলা উচিত নয় যে, উহা চলবে না। বরং তা চালু করে দেখতে হবে সত্যই উহা অচল কি'না। সম্ভব হলে উর্দ্ধতন অফিসারদের সময় সুবিধে ও মেজাজ বুঝে কোনও কাজ করা বা কোনও কথা বলা উচিত। হাকিম বা অফিসার যদি কারুর বিবৃতি লিখতে সুরু করেন তা'হলে তার উচিত হবে কলমের গতি লক্ষ্য করে থেমে থেমে কথা বলা।

জনসাধারণ প্রথমে অধস্তন অফিসারদের সংস্পর্শে আসে। এই জন্য পোষাকে কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে তাদের হওয়া উচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোনও থানার গেটম্যানের বিষয় বলা যেতে পারে। কেউ পুলিশে এলে প্রথমে তার দেখা হয় থানার গেটের পাহারাদারের সঙ্গে। এই ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদ ও ব্যবহারই তার মনে ফার্ষ্ট ইম্প্রেসনের কাজ করে। অধস্তন অফিসারদের ব্যবহারে ও কার্য্যে অনেষ্ট হওয়া সর্ব্বদাই উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের

দক্ষতাও অর্জ্জন করতে হবে। অনেষ্ট এবং ইন-এফিসিয়েন্ট অপেক্ষা ডিস্-অনেষ্ট এবং এফিসিয়েন্ট অফিসাররা তত ক্ষতিকর নয়। মহাযুদ্ধের সময় ইহা প্রমাণিত হয়েছে। ইনিসিয়েটিভ্‌নেস ও আদর্শ হারালে একেবারে চলবে না। অধিকন্তু নিজেদের দৈহিক 'ফিট্‌নেসও' অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার। কারণ এই অধস্তন অফিসাররাই রাষ্ট্রের প্রকৃত কাটামো।

[আদেশ দিবার সময় এমন আদেশ দেওয়া উচিত নয় যা তামিল করা সম্ভব নয়। অসম্ভব হুকুম জারি করলে তা প্রায়ই পালিত হয় না। অসুবিধাকর বা অন্যায় হুকুম দেওয়ার পর প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে কয়েকদিন পালিত হওয়ার পর এমনিই উহা পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। যা নিজে করতে অসুবিধা হয় তা অপরকে করতে বললে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্কের একটী ইউরোপীয় গণগল্প উদ্ধৃত করে বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করবো।

"মুসোলিনি একবার হিটলারকে রোমে এনে একটী উঁচু মিনারের তলায় ইটালীয় বাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখাচ্ছিলেন। প্যারেডের পরিশেষে মুসোলিনি হিটলারকে বললেন, 'এইবার আপনি আমাদের এই আর্ম্মির মনোবল পরীক্ষা করুন।'—'আচ্ছা বেশ তা'হলে', হিটলার তাঁকে বললেন, 'আপনি এদের কমাণ্ডারকে ঐ মিনারে উঠে নিচে লাফিয়ে পড়তে বলুন।' হিটলারের এই কথায় মুসোলিনিকে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে দেখে হিটলার বললেন, 'এই তো! আপনার নিজের উপরই নিজের বিশ্বাস নেই। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে ঐ আদেশ দিলে তা প্রতিপালিত না হতে পারে। কিন্তু দেখুন এইবার আমার সেনাবাহিনীর মর‍্যাল বা মনোবল।' এইরূপ উক্তি করে হিটলার তাঁর এক পার্শ্বচরকে হুকুম করা মাত্র সে সেলাম করেই তর তর করে মিনারের চূড়ার দিকে এগিয়ে চলল। পরে অবশ্য হিটলার অপর

আর একজনকে তার পিছু পিছু পাঠিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনিয়েছিলেন।"]

বিভিন্ন পদের কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার করণীয় কার্য্য ধার্য্য করে দেওয়া আছে। একের করণীয় কার্য্য অপরের করা উচিত হবে না। যেখানে একজন জমাদার পাঠালে চলে সেখানে দারোগার না যাওয়াই ভালো। কারণ যিনি একজন ভালো দারোগা তিনি একজন ভালো জমাদার না'ও হতে পারেন। এইজন্য যে কার্য্য একজন দারোগা সুষ্ঠু-রূপে করতে সক্ষম সে-কার্য্য একজন ডেপুটীর স্বহস্তে না করাই ভালো। যদি ঐ কার্য্যে অধস্তন অফিসারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আসে তা'হলে তার তদন্ত উর্দ্ধতন অফিসার করতে পারবেন, কিন্তু তিনি নিজে ঐ বিষয়ে জড়িয়ে পড়লে উহার তদন্ত করবেন বাহিরের কোনও এক ব্যক্তি। তবে যে সকল কার্য্য নিজে না দেখলে ভালো-রূপে সমাধা না হবার সম্ভাবনা তা স্বয়ং দেখা বা তা করা উচিত।

কোনও একটী ডায়েরী বা নথি একবার মাত্র পাঠ করে উহাতে কিছু নেই বা ঐ মামলা চলবে না তা কারুর বলা উচিত নয়। বরং উহা বারে বারে পাঠ করে ভেবে দেখতে হবে যে সত্যই উহাতে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যসাবুত আছে কি নেই। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

"আমি অমুক কোর্টের উকিল। ঐ দিন এক আত্মীয় আমার নিকট মামলার এক নথী আনলো। নথীটি একবার মাত্র উল্টে পাল্টে পড়ে আমি বলেছিলাম যে এই মামলা আদপেই টিকবে না। কিন্তু ঐ আত্মীয়ের আকিঞ্চনে পড়ে উহা আর একবার ভালো করে পড়ে দেখি এবং বলি, 'না হে! এতে এমন কয়েকটা পয়েণ্ট আছে যাতে মামলা টিকলেও টিকতে পারে। তুমি বরং এটা আমার কাছে দুই একদিনের

জন্য রেখে যাও।' পরদিন আরও ভালো করে ঐ নথীটি পড়ার পর আমি আরও কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান উহাতে পেয়ে আমার ঐ আত্মীয়কে ডেকে বলি, 'না হে, এ অতি ভালো মামলা এনেছো, আমি এ মামলা জিতবই।' প্রকৃতপক্ষে এই মামলায় আমাদের সহজেই জয় হয়েছিল।"

এমন কয়েকটী বিষয় আছে যা শাসন-তান্ত্রিক কারণে দেখেও না-দেখা (overlook) উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকজন শান্ত্রী গোলমাল করলো, কিন্তু তার পিছনে আরও বহু ব্যক্তি ভিড় করে দাঁড়ালো; এই সময় বিশেষ কড়া ব্যবস্থা না করে ধমকে বা মিষ্টি কথায় তাদের তখনকার মত সরিয়ে দেওয়া হলো। পরে ঘটনার উত্তেজনা কথঞ্চিৎ কমে গিয়ে থিতিয়ে গেলে এদের কয়েকজন নেতাদের বিরুদ্ধে বদলি প্রভৃতি দ্বারা ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু এমন কয়েকটী বিষয় আছে যাহা এড়িয়ে না গিয়ে প্রারম্ভেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভালো। সর্ব্বোপরি যাতে স্বল্প বেতনের কর্ম্মচারি-গণ সময় মত বেতন পায় তা সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত। পৃথিবীর বড় বড় বিদ্রোহ অনিয়মিত বেতন প্রদানের জন্যই সংঘটিত হয়েছে। সাধারণ ভাবে রক্ষীমাত্রেরই অযথা ঝামেলা এড়িয়ে চলা উচিত; যাতে তাদের বিরুদ্ধে কোনও কমপ্লেন না হয়। একটী বা দুইটী অভিযোগ সম্পর্কীয় ব্যাপারে তারা জয়ী হতে পারেন, কিন্তু একজনের বিরুদ্ধে যদি বারে বারে মিথ্যা অভিযোগও আসে তা'হলে তিনি 'ট্যাক্টলেশ' প্রতিপন্ন হলেও হতে পারেন। এইজন্য নিজের এবং-কর্তৃপক্ষ, উভয়েরই বৃথা এনার্জ্জি ও সময় নষ্ট হয়ে থাকে।

পূর্ব্বে যে অকারণে সাধারণের মন রক্ষীদের উপর বিরূপ ছিল, তা নবম এবং বিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট বহু হাস্যকর গণগল্প হতে বুঝা

যায়। এ সম্বন্ধে আমার মনে পড়ে যে একদিন একটী পূজা মণ্ডপে টেবিলে বসে আমরা দুই জন অফিসার ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় উদ্যোক্তাদের প্রদত্ত দুই প্লেট খাবার খাচ্ছিলাম। সহসা লক্ষ্য করলাম দুইটী শিশু অবাক হয়ে আমাদের খাওয়া পরিলক্ষ্য করছে। সহসা আমাদের কানে এলো এদের একজন অপরজনকে বলছে, "ও দাদা ঐ দেখ পুলিশ খাচ্ছে।" অর্থাৎ পুলিশ যেন খায় না। শিশু মনকেও আমাদের উপর কিরূপ বিষিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা আমরা সেই দিন উপলব্ধি করেছিলাম।* অপর আর একদিনের ঘটনা বলবো। এই দিন এক দুর দেশ হতে সাক্ষ্য দিয়ে ট্রেণে এই শহরে ফিরে আসছি। ট্রেণের মধ্যে একটী শিক্ষিত বাঙালী পরিবারের সহিত আলাপ আলোচনার মধ্যে বেশ হৃদ্যতা জমে উঠেছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী, পুত্রবধূ ও দুই কন্যার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বাড়ীতে আমাকে চা'এর নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করে বসলেন। বারে বারে অনুনয় করে তিনি আমাকে জানাচ্ছিলেন, আমি যেন শহরে পৌছবার পর-দিনই সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়ীতে এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করি। এর পর ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনের নিকটে এসে পৌছুলে তিনি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "আরে মিঃ অমুক! আপনি তো এখন আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেলেন, কিন্তু আপনি কি করেন তা তো জিজ্ঞাসা করলাম না!" ভদ্রলোকের অবচেতন মনে কি ছিল তা জানি না। 'আমি কি করি' তা শুনা মাত্র তাঁর মুখ দিয়ে বোধ হয় তাঁর নিজের অজ্ঞাতেই বার হয়ে এলো, "আরে, আপনি পুলিশ! আমি মনে

* স্বাধীনতার পর পূর্ব্বতন ঐ সকল শিশুরা যুবক হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তাঁদের কেহ কেহ তাঁদের পূর্ব্বেকার মিথ্যা ও ভুল ধারণা আজও পরিত্যাগ করতে পারেন নি।

করেছি ভদ্রলোক।" আমি তখন হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আজ্ঞে, তা'হলে এতো অনুনয় ও নিমন্ত্রণ সব কি বাতিল করে দিলেন।" এইরূপ আরও কয়েকটী ঘটনাও আমার মনে পড়ে। এ'ছাড়া এই সম্পর্কীয় বহু গণগল্পও আমি শুনেছি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে পুলিশ যদি কারো পায়ে ধরতে চাইতো তাহ'লেও তাদের ধারণা হতো বুঝিবা তারা জুতা জোড়াটা সরাবার মতলবে আছে। কিন্তু আমি পরে ভেবে দেখেছি যে ইহার একমাত্র কারণ তৎকালীন রক্ষীমহলের বহুল দোষ নয়; ইহার একমাত্র কারণ জন-সমাজে একতরফা প্রপাগাণ্ডা বা একমুখী প্রচার। সাধারণতঃ বিবিধ গণগল্প দ্বারা এইরূপ অন্যায় প্রচার মুখে মুখে বৎসরের পর বৎসর বিনা বাধায় চলে এসেছে। কাউণ্টার প্রপাগাণ্ডা বা প্রতিবাদ প্রচার দ্বারা ইহা প্রতিরোধ করার চেষ্টা ঐ যুগে করা হয় নি। নগণ্য সংখ্যক কতিপয় রক্ষীর দোষ এইভাবে প্রচার করা হয়েছে, কিন্তু অধিক সংখ্যক রক্ষীর গুণ সম্বন্ধে কোনও পক্ষ হতেই প্রচার করার চেষ্টা আদপেই করা হয় নি। ঐ সময় প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে ব্যক্তিগতভাবে যে কোনও একজন রক্ষী জনতার সহিত আলাপ করা মাত্র তার গুণে মুগ্ধ হয়ে তারা বলেছে, 'আচ্ছা আপনি তো চমৎকার লোক, ঠিক পুলিশের মত তো নয়।' এর একমাত্র কারণ তৎকালে রক্ষী মহলের সহিত জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মেলামেশার সুযোগ সুবিধা ছিল না। ইহারা পরস্পর পরস্পরের দোষের খবর রেখেছে, কিন্তু উহাদের বহুবিধ গুণের খবর রাখে নি। এইজন্য রক্ষীদিগের ও তাদের কার্য্যকলাপের সহিত জনসাধারণের নিবিড় সংযোগ থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা অফিসার মাত্রেরই ভুলচুক শুধরে নেওয়া উচিত এই সম্পর্কে—নিম্নের বিবৃতিটী বিশেষ রূপে প্রণিধান যোগ্য।

"আমি এই দিন অমুক জজসাহেবের এজলাসে জনৈক আসামীর জামীনের জন্য সুললিত ইংরাজী ভাষায় সওয়াল করছিলাম। সহসা জজসাহেব বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'ভালো ইংরাজী বললেই বুঝি ইত্যাদি।' উত্তরে আমিও বিরক্ত হয়ে, বললাম, 'হোয়েন ইংলিশ সিজ্‌ড্‌ টু বিই কোর্ট লেঙ্গোয়েজ' তা আমার জানা ছিল না, তাই ইংরাজীতেই বলেছি। এর পর আর দ্বিরুক্তি না করে আমি আদালত ত্যাগ করি। আমি আদালত হতে বার হয়ে আসার পর জজসাহেব নথী পত্রে 'আই এ্যাম নট্‌ ইন্‌ এ জুডিশিয়াল ফ্রেম্‌ অব মাইণ্ড টুডে' এই বাক্য কয়টি লিখে শুনানীর দিন একদিন পিছিয়ে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, 'দেখুন পাঠ্যকালে আমি একজন ভালো ছাত্র ছিলাম। বরাবর স্কলারশিপ্‌ পেয়েই পাশ করেছি। আমার ভালো ইংরাজী লিখবার ক্ষমতা অদ্বিতীয়, কিন্তু আমার ক্ষোভ এই যে আমি কোনও দিনই ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে পারিনি। সম্ভবতঃ এই সম্পর্কে আমার একটা ইন্‌ফিরিয়ার কম্‌প্লেক্সিটী ছিল, এইজন্যই হয়তো আপনার মুখে অতো ভালো ইংরাজী শুনেও আমি বিরক্ত হয়েছিলাম।"

জনতার সহিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ট্যাক্ট্‌ রক্ষীমাত্রেরই সাবধানে শিক্ষা করা উচিত। এই ট্যাক্ট্‌ কি বস্তু, তা বুঝবার জন্য কাবুলি—তেজারতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট একটি ব্যবহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"টাকা আদায় করার জন্য প্রায়ই দু'জন কাবুলী একত্রে খাতকের বাটী যায়। একজন লাঠি উঁচিয়ে কড়া মেজাজে কথা বলে, কিন্তু অপর জন তাকে থামিয়ে মিষ্টি কথায় বলে, 'থাক থাক ভাই, কিছু টাকা ও আজই দিয়ে দেবে।' বলাবাহুল্য যে এইরূপ অভিনয় তারা নিজেদের মধ্যে পূর্ব্ব-হতে পরামর্শ করেই করে থাকে।"

বিরোধী আইন ভঙ্গকারী জনতাকে হটিয়ে দেবার সময় এইরূপ নরম গরম মেজাজ্ দেখালে বা ব্যবহার করলে সময় সময় সুফল ফলে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ট্যাক্টের কারণে দ্বিমুখী মামলাও রুজু করা হয়ে থাকে। এই দ্বিমুখী মামলাকে ইংরাজীতে বলা হয় ক্রস্-কেস্? অর্থাৎ প্রথম মামলায় যাকে আসামী করা হয় দ্বিতীয় মামলায় তাকেই করা হয় ফরিয়াদী। সকল সময়ই এইরূপ মামলা কেবল মাত্র উহাদের বিচিত্র বিষয় বস্তুর জন্যই যে করা হয় তা নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ট্যাক্টের কারণে সুযোগ পাওয়া মাত্র ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে বিবাদের চিরঅবসান ঘটানো হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পক্ষপাত দোষের অভিযোগের দায় এড়ানোর জন্যও এইরূপ করা যেতে পারে কিন্তু অকারণে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা কখনও উচিত হবে না।

এই ট্যাক্ট্ বা প্রজ্ঞা অন্যায় ভাবে কখনও পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। কোনও বাড়ী হতে যদি কোন এক বাড়ীতে প্রতি রাত্রে ইঁট পড়ে তা'হলে গোপনে ঐ অপরাধীমন্য বাড়ীতে ইঁট ফেললে হয় তো সুফল ফলবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এইরূপ প্রতিনিষেধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা অনুচিত। কোনও একটি বাটীর মালিক অপর এক বাটীর রুগীর মঙ্গলার্থে স্ববাটীতে গীতবাদ্য বন্ধ করতে অস্বীকৃত হলে যারা রুগীকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে ঐ প্রতিবেশীর বাটীর সম্মুখস্থ স্ববাটীর বারান্দায় সারা রাত্রি জয়ঢাক পিটাবার ব্যবস্থা করেন তারাও ঐ একই রূপ অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় দেন। নিম্নে ঐ রূপ এক ট্যাক্টলেশ ট্যাক্টের বা প্রজ্ঞাহীন প্রজ্ঞার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো।

"একটী দ্বিতল বাটীতে জনৈক শাশুড়ী, তাঁর বধূমাতা ও ঐ বধূমাতার শিশু-পুত্র বাস করতেন। কিন্তু বহু মানা সত্ত্বেও তারা ঐ শিশুর বিষ্ঠা-সিক্ত বস্ত্রখণ্ড সমূহ পার্শ্ববর্ত্তী একতলা বাটীর প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই

নিক্ষেপ করতেন। এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত স্ত্রীলোক দুইটির সহিত পেরে না উঠে একতলা বাটীর বাসিন্দারা এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তাঁরা পাড়ার যাত্রাপার্টির এক ব্যক্তিকে গেরুয়া কাপড়, জটা ও দাড়ী-গোঁফ পরিয়ে স্ববাটীর প্রাঙ্গণে এনে উপস্থিত করলে। এর পর ঐ জটাজুটধারী ব্যক্তি খোকার বিষ্ঠাসিক্ত বস্ত্রখণ্ড কয়টী একত্রে প্রাঙ্গণে স্থাপন করে সেইখানে ধান দূর্ব্বা কুশ-পুত্তলি ও চন্দন কাষ্ঠ সাজিয়ে এক হোমের ব্যবস্থা করলেন। এর পর পূজান্তে, 'ওঁ সাহা ফট্ সাহা, খোকনো সাহা' এই মিথ্যা মন্ত্রোচ্চারণ করা মাত্র, বধূমাতা সহ শাশুড়ী ঠাকরুণ ছুটে এসে বলে উঠলেন, 'ওরে বাবা, এ মারণ যজ্ঞ, আর করো না। খোকার বিষ্ঠা আর একদিনও ওখানে পড়বে না। তোমরা এখন কাটান যজ্ঞ করে বাচ্চাকে আমার নীরোগ করে দাও। এই সুযোগে তারা ঐ স্ত্রীলোকদের নিকট কাটান যজ্ঞের জন্য বিশটী মুদ্রা চেয়ে বসলেন। স্ত্রীলোক দুটী চালের হাঁড়ি ও বাক্স হতে লুকানো রেজগী সমেত বিশ টাকা তাদের এনে দিলে তারা আরও কিছুক্ষণ ভণ্ডামী করে সেখান হতে সরে পড়েছিল।"

উর্দ্ধতন অফিসারদের অধস্তন অফিসারদের প্রতি ব্যবহার হওয়া উচিত অতীব সুষ্ঠু। অধস্তন অফিসারদের প্রতিটী ভালো কাজ উর্দ্ধতন অফিসার কর্ত্তৃক স্বীকৃতি (Appreciated) হওয়া চাই। কোনও কার্য্যে কৃতকার্য্য হলে রক্ষীদের পুরস্কৃত করার রীতি আছে। কিন্তু আমার মতে যদি কোনও রক্ষী তার করণীয় প্রতিটী কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে সমাধা করে তা'হলেও তাকে পুরস্কৃত করা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা চালু থাকলে কৃতকার্য্যের জন্য অন্যায় পথ অবলম্বন করতে রক্ষিগণ প্ররোচিত হবে না। কেউ কেউ বলে থাকেন যে কেউ খুব ভালো কাজ করলেও 'গুড্' না বলে 'বেটার' বলা ভালো। কারণ সরাসরি 'গুড্' বললে

তাদের উদ্যম কমে যেতে পারে। কিন্তু আমার মতে ভালো হলে বলা উচিত তাতে আরও ভালো করা যেতে পারে, ইত্যাদি। অধস্তন অফিসাররা সেলাম করলে হয় তাকে ঐরূপ এক লম্বা প্রতি-সেলাম দিয়ে তার সেলামকে সম্মান দিতে হবে, নয় মিষ্ট মধুর হেসে স্বল্প হাত তুলে বা তার সঙ্গে দুটী একটি কথা ক'য়ে তাকে খুশী করে দিতে হবে যাতে তার মনে না হতে পারে যে অবস্থাগুণে নিম্নপদে বাহাল হওয়ায় তাকে অবজ্ঞা করা হলো। সামাজিক ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন অফিসারদের সকল সময়েই মনে রাখা উচিত যে অধস্তন অফিসাররা সকল দিক হতেই তাদের সমতুল। কিন্তু তাই বলে উর্দ্ধতন অফিসারদের খুব বেশী সস্তা হওয়া উচিত নয় এবং তাদের উচিত স্বেচ্ছায় তাদের গতিবিধি একটি স্বল্পায়তন সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা, যত্রতত্র যাতায়াত করা বা যার তার সহিত মিলা মিশা করা তাদের উচিত নয়। অধিকন্তু তাদের উচ্চ বেতনের হার অনুযায়ী জীবনের মানও তাঁরা উচ্চ রাখতে বাধ্য; বিশেষ করে পোষাক পরিচ্ছদ ও যানবাহন ব্যবহারের দিক হতে।

সর্ব্বোপরি রক্ষী মাত্রেরই সুযোগ পাওয়া মাত্র জনসাধারণকে সাহায্য করা উচিত। গণগল্পের সাহায্যে এইরূপ ঘটনা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে রক্ষীদের বিশেষ করে জনপ্রিয় করে তুলবে। এ'ছাড়া জনসাধারণ সকল সময়ই রক্ষীদের 'ফিট্' দেখতে চায়। এইজন্য রক্ষীদের কেহ নিজেদের পরিশ্রান্ত বা অসুস্থ মনে করলে তার পক্ষে জনসাধারণের সম্মুখীন না হয়ে 'সিক্-রিপোর্ট' করাই ভালো।

কোনও রক্ষীর মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয়। পূর্ব্বতন রক্ষীদের কারুর কারুর মনে কুসংস্কার ছিল বলে শুনা গিয়েছে। আমার পিতামহ রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাদুর (১৮২২-১৯০৮) ব্রিটিশ সৃষ্ট পুলিশ বিভাগে প্রথম ভারতীয় এ্যাসিস্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ

লাভ করেন। পিতামহীর মুখে আমি শুনেছিলাম যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ হত্যাকারীদের ঐ যুগের রক্ষিগণ গ্রেপ্তার করতে চাইতেন না, পাছে তাঁরা 'তার ফাঁসী হওয়ার পর' ব্রহ্মহত্যার পাপে পাপী হয়ে পড়েন। এই যুগেও রক্ষীদের মধ্যে বহু প্রকার কুসংস্কারের কথা শুনা গিয়েছে। কলিকাতা পুলিশে একটি কুসংস্কার আছে যে যদি কোনও রক্ষীর হাত হতে অতর্কিতে লাঠি মাটির উপর পড়ে যায়, তা'হলে সেইদিন শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অঘটন ঘটবে কিংবা থানায় মামলায় মামলায় ভরে যাবে এবং রক্ষীদের প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিষেধক হিসাবে ঐ পতিত যষ্ঠির উপর জল ছিটিয়ে দিবার নিয়ম আছে। এই সম্পর্কে কলিকাতা পুলিশে প্রচলিত অপর আর এক কুসংস্কারের কথা বলা যেতে পারে। যদি এখানে কোনও থানাদারকে বদনাম নিয়ে অপসারিত বা বদলী হতে হয়, তা'হলে তার স্থলে নিযুক্ত নূতন অফিসারটি কার্য্যে রত হবার পূর্ব্বে পূর্ব্বতন বিদায়ী অফিসারের ব্যবহৃত অফিস টেবিলটির মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে তবে সেখানে বসে কার্য্য করেন।

এই সকল কার্য্য কুসংস্কার হলেও ইহা হতে রক্ষীদের এই বিভাগের উপর অদম্য ভালবাসার পরিচয় দেয়। কারণ প্রীতি ও মমতাকে কেন্দ্র করেই বহু কুসংস্কার গড়ে উঠে থাকে। কালক্রমে ইহা এক নির্দ্দোষ করণীয় কার্য্য রূপে চালু হয়ে গিয়ে থাকে। তবে ক্ষতিকর এমন কোনও কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া কারুর পক্ষে উচিত হবে না।

রক্ষীমাত্রেরই উচিত পথে ঘাটে মনস্তাত্ত্বিক মন নিয়ে সততার সহিত কর্ত্তব্যরত থাকা। নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

"আমি এই দিন অমুক দারোগাবাবুর সহিত ফেরী ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। বহু নরনারী ঐদিন ঐঘাটে গঙ্গা পার হচ্ছিল।

সহসা উর্দ্দীপরা দারোগাবাবু এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন, ঐ লোকটা মনে হয় বদমায়েস। এরপর তিনি তাকে আটকে তার বোঁচকা খুলে দশ খানি রূপার থালি বার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কাজ করো তুমি?' লোকটা উত্তরে বললে, 'ফ্যাক্টরীর মজদুর।'—'বটে!' দারোগাবাবু বললেন, 'পাও তো দু'টাকা রোজ, এই সব বাসন কিনলে কি করে? আচ্ছা থানায় চলো।' আমি এ বিষয়ে অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা! এত ভীড়ের মধ্যে না চিনে বা জেনে একে বার করলেন কি করে?' উত্তরে দারোগাবাবু বললেন, 'দেখুন আমি লক্ষ্য করলাম যে অত লোকের মধ্যে মাত্র এই লোকটাই যেতে যেতে বারে বারে আমার দিকেই লক্ষ্য করছে, তাই।"

সর্ব্বোপরি আমার বক্তব্য এই যে রক্ষীদের কারও ডিলেটারী হ্যাবিট্ থাকা উচিত নয়। যে কাজ আজ শেষ করা যায় তা কালকের জন্য রাখা উচিত নয়। কারণ কাল আবার কোন অধিক ঝামেলা আসবে তা কে জানে। এ'ছাড়া রক্ষীদের কারও কখনও ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে একজনের নিকট মাথা নীচু করতে অস্বীকৃত হয়ে কেউ চাকুরী ছেড়ে দিলে, কিন্তু আখেরে তাকে মান ও প্রাণ রক্ষা করতে বহু ব্যক্তির নিকটই মাথা নীচু করতে হলো।

অপবিজ্ঞান—হিন্দুদিগের

অপরাধ-বিজ্ঞান পৃথিবীর একটি অধুনাতম বিজ্ঞান হলেও ইহার মূল সূত্রগুলি প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ অবগত ছিলেন। এই সম্পর্কে বিশদরূপে আমি 'হিন্দু অপরাধ-বিজ্ঞান' শীর্ষক পৃথক পুস্তকে আলোচনা করবো। এক্ষণে উহা হতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে মাত্র আলোচনা করা হবে।

আমি ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করেছি যে স্ব-বাক ও পর-বাক প্রয়োগ দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহা জাগ্রত বা সুপ্ত করে দেওয়া সম্ভব। এ'ছাড়া আমি আরও বলেছি যে ঘটনা ও পরিবেশও ঐরূপ বাক-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ স্পৃহার উন্মেষ ঘটাতে পারে। এ'ছাড়া প্রায়শঃ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এই সুপ্ত অপস্পৃহার বিকাশ শনৈঃ শনৈঃ বা ক্রমশঃ বা ধীরে ধীরেও ঘটে থাকে। এই সকল মতবাদ সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণও যে অবগত ছিলেন তা নিম্নের প্রাচীন পুস্তকের কয়েকটি আখ্যানভাগ পাঠ করলেই বুঝা যায়।

গীতা হতে আমরা জেনেছি যে লোভ, মোহ, ক্রোধ প্রভৃতি হতে পাপ বা অপস্পৃহার সৃষ্টি হয়। এমন কি এইজন্য মানুষের ও মনুষ্যত্বের বিলোপও ঘটে থাকে। এইরূপ বহু তথ্য বিবিধ প্রাচীন পুস্তক হতে আমি উদ্ধার করেছি। এই সম্পর্কে মহাভারতোক্ত একটি ঘটনার কথা বলা যাক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে, দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হওয়ায় তিনি নিস্তেজ। ভীত ত্রস্ত হয়ে কৃপা, কৃপবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা বশিষ্টের আশ্রমে এসে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁদের নিস্তার নেই। পাণ্ডবগণ সংবাদ পেয়ে সেখানে এসেও তাঁদের যুদ্ধে আহ্বান করলেন। অগত্যা আত্মরক্ষার্থে তাঁরা তথা হতে এক গহন বনে এসে আত্মগোপন করলেন।

সারা রাত্রি তাঁরা জেগে বসে আছেন, এমন সময় তাঁরা লক্ষ্য করলেন, গাছের এক ডালে সাতটি ঘুমন্ত কাক বসে আছে। সহসা এই সময় তিনটি নিশাচর পেচক এসে তাদের সেই ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের নিহত করে ভক্ষণ করতে সুরু করলো। কাক দিবাচর পক্ষী এবং পেচক নিশাচর পক্ষী, অর্থাৎ কাক রাত্রে ঘুমায় ও পেচক ঘুমায় দিনে। এইজন্য রাত্রান্ধ কাক এই তিনটি নিশাচর পেচকের আক্রমণে সহজেই নিহত হলো। এই ঘটনাটি বাক-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ঐ তিনটি মনুষ্য-বীরের অপস্পৃহা তো জাগ্রত করলেই, এমন কি কিরূপ অপপদ্ধতির তাঁরা সাহায্য নেবেন তাও তাঁদের বাতলে দিলে। তাঁদের মনে পড়লো দ্রৌপদীর সাতটি পুত্র ঐ সাতটি কাকের মতই রাত্রে ঘুমে অচেতন। অপর দিকে তাঁরা তিন বীর ওই তিনটি পেচকের মতই রাত্রে জেগে আছেন। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে যে অপরাধ সমাধা করবার কল্পনাও তাঁরা করতেন না, সেই অপরাধ করতেই এক্ষণে তাঁদের ইচ্ছা হ'ল। এই নিদারুণ ইচ্ছা বা অপস্পৃহা তাঁরা দমন করতে না পেরে রাত্রিযোগে চোরের মত বিপক্ষ পক্ষীয়দের শিবিরে প্রবেশ করে—যুদ্ধের সকল আইন-কানুন ভেঙ্গে তাঁরা তিনজনে দ্রৌপদীর সাতটি পুত্রকে হত্যা করে এসেছিলেন।

উপরের মতবাদের সমর্থনে আমি প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক হতে অপর একটি কাহিনীর অবতারণা করবো। এই কাহিনীতে প্রকারান্তরে বলা হয়েছে যে, পরিবেশ অপস্পৃহার বহির্বিকাশের জন্য দায়ী।

"জনৈক সাধু চরিত্র মনীষী পরিব্রজন কালে এক গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ঐ গৃহস্থ তাঁকে অন্নব্যঞ্জন দ্বারা পরিতুষ্ট করে গৃহের একটি কক্ষে তাঁর শয়নেরও ব্যবস্থা করে দেন। ব্রাহ্মণ রাত্রে শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলেন জানালার ওপাশ হতে মুহুর্মুহুঃ সুমধুর ঘণ্টা ধ্বনি ভেসে আসছে। তিনি উঠে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন একটি গরুর

গলায় সুন্দর একটি ঘণ্টা বাঁধা রয়েছে। ব্রাহ্মণ ঘণ্টাটি দেখে ভাবলেন, 'বাঃ চমৎকার ঘণ্টাটি তো? আমার ঠাকুর ঘরে ব্যবহারের জন্য ওটি নিলে হয় না। কিন্তু চাইলে গৃহস্থ কি ওটি আমাকে দেবে? তার চেয়ে বরং না বলেই ওটি গ্রহণ করা যাক।' কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি ভাবলেন, 'এ কি চিন্তা তিনি করছেন, এ যে চৌর্য্য কার্য্য। তবে এর মধ্যেও একটা কথা আছে। তাঁর মার্গ বা উদ্দেশ্য তো ভালো, ঘণ্টা তো তিনি নেবেন দেবসেবার্থে।' এমনি আরও কয়েকবার চিন্তা করে ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে লোভ দমন করে বুঝলেন, 'না, মার্গ সাধু হলেও উহা চৌর্য্য', তিনি এইরূপ অন্যায় চিন্তার প্রশ্রয় দিতে পারেন না। এইভাবে (?) স্ব-বাক প্রয়োগ (Suggestion) দ্বারা ব্রাহ্মণ তাঁর জাগ্রত অপস্পৃহা দমন করে ঘুমিয়ে পড়লেন। পর দিন প্রত্যুষে উঠে ব্রাহ্মণ বিরক্তির সহিত গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি করে বলো তোমার বৃত্তি বা পেশা কি? নিশ্চয় তোমার পেশা চৌর্য্য বৃত্তি, তা না হলে রাত্রে ঐরূপ অন্যায় ইচ্ছা আমার মনে আসবে কেন? তোমার অন্ন আমি ভক্ষণ করে তোমার বাটীতে রাত্রিবাস করেছি, তাই আমার মনে অপরাধমূলক মনোবৃত্তির উদয় হয়েছিল। ব্রাহ্মণের এবম্বিধ বাক্যে গৃহস্থ করযোড়ে তাঁকে নিবেদন করলো, 'হাঁ প্রভু, আপনি ঠিক বুঝেছেন। আমার বৃত্তি বা পেশা চৌর্য্যবৃত্তি।

অপরাধের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বহু কাহিনীর উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ হতে একটি আখ্যান সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। উপাখ্যানটী এইরূপ।—

জনৈক ব্যক্তি একটি ছাগ শিশু সহ পথ অতিক্রম করছিল। এমন সময় কয়েকজন তস্কর নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ করে এক একজন পথের এক এক স্থানে অবস্থান করলো। এদের প্রত্যেকেই ঐ ব্যক্তিকে দেখা মাত্র জিজ্ঞাসা করলো, 'আরে ব্রাহ্মণ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ,

এই কুকুর শাবক নিয়ে কোথায় চ'লছেন? দূরে দূরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণ সকলে একই কথা বলায়, ব্রাহ্মণের মনে শেষের লোকটীর এই উক্তি ভাবান্তর সৃষ্টি করলো। তিনি ভালো রূপেই জানতেন যে এই জীব ছাগশিশু। কিন্তু তা সত্বেও অতোগুলো লোক একই কথা বলছে। এ যাই হোক বাবা, দরকার নেই—এটাকে ফেলেই দিই। জীবটীকে ছাগ রূপে বুঝেও তিনি ওটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।"

উপরের দৃষ্টান্ত একটি হাইপ্যাথিটিক্যাল দৃষ্টান্ত হলেও উহাতে মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্র নিহিত আছে। কারণ পর-বাক্-প্রয়োগ দ্বারা মানুষকে যে কিছুটা অভিভূত ও অবহিত করা যায় তার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা এই কাহিনীটিতে দেখতে পাই।

এ'ছাড়া ফোরেন্সিক সায়েন্সের বহু মূল সূত্র সম্বন্ধেও প্রাচীন হিন্দুগণ অবহিত ছিলেন। এই সম্বন্ধে একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। এই উপাখ্যানটি একটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হতে পাওয়া গিয়েছে। কোনও এক হারের মালিকানা নিয়ে দুইটি নারীর মধ্যে বিবাদ বাধলে দেশের রাজা তাদের বিচারের জন্য জনৈক সুধী ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলে তিনি তাঁদের পেশা বা বৃত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। একজন উত্তরে বলে, সে রজকিনী এবং অপর জন উত্তরে বলে সে মালিনী। বিচারক তখন মুক্তাহারের তন্তু-সূত্রটি বার করে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র পাত্রের জলে ভিজিয়ে রেখে ঐ জল শুঁকে বুঝলেন যে উহাতে ফুলের রেণুর গন্ধ আছে। এর-পর তিনি তৎক্ষণাৎ রাজাকে তাঁর রায় জানিয়ে বলেছিলেন, মহারাজ! ঐ মুক্তাহারের অধিকারিণী ঐ রজকিনী নয়, উহার প্রকৃত অধিকারিণী হচ্ছে ঐ মালিনী।

প্রাচীন অপরাধ—কলিকাতার

১৬৯৮ সালে কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটী গ্রামত্রয় জমিদারি রূপে ইংরাজ বণিকগণ কর্ত্তৃক ক্রীত হয়। ইহার পরিমাণ তখন ছিল দেড় বর্গ মাইল, পরে ধীরে ধীরে উহার আয়তন বৃদ্ধি ঘটে। ইতিপূর্ব্বে ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ হুগলীতে আস্থানা গেড়েছিলেন। পরে বাধ্য হয়ে তাঁরা হুগলী হতে কলিকাতায় ঘাঁটি তৈরী করেন। ইংরাজদের আগমনের সঙ্গে নিরাপত্তার কারণে বহু ধনী ব্যক্তি এই-খানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। অপর দিকে ধন-সম্পত্তির অবস্থান হেতু বহু তস্করগণও এই শহরে এসে উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব হতেই এই স্থানের বনে জঙ্গলে তস্করগণ আশ্রয় গ্রহণ করত, এক্ষণে নানা প্রকারের অপরাধিগণ এই স্থানে আড্ডা জমায়। উপরন্তু এইখানকার নূতন পরিস্থিতিতে নূতন নূতন অপরাধ ও অপরাধীরও সৃষ্টি হতে থাকে।

১৭১৭ খৃষ্টাব্দে চৌরঙ্গি ছিল একটী ক্ষুদ্র জলা গ্রাম এবং উহা নগরের বহির্ভাগ বলে পরিগণিত হতো। তথায় দস্যু তস্করের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। রাত্রিকালে ভৃত্যরা ডাকাতের ভয়ে দলবদ্ধ হয়ে গমনা-গমন করতো। কলিকাতার সীমার বহির্ভাগে অশ্বারোহণে গমন করা সে সময়ে বড় বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। এ'ছাড়া ফরাসী পর্ত্তুগীজ, মগ, মারহাটা, এরা সকলেই বিশেষ ভীতির কারণ হয়ে উঠে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দেও পর্ত্তুগীজ মনুষ্যাপহারকদের হাত হতে কলিকাতাবাসীদের রক্ষা করার জন্যে শিবপুর রাজকীয় উদ্ভিদ উদ্যানের নিকটস্থ মুকুয়া থানা দুর্গের সন্নিধানে নদীর এপার হতে ওপার পর্য্যন্ত একটি লৌহ-শৃঙ্খল প্রসারিত করা হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দেও বর্ত্তমান কলিকাতার সিমলা ও

মির্জ্জাপুরের পথে সন্ধ্যার পর অর্থলোভেও যাতায়াত করতে কেহ স্বীকৃত হয় নি। যে স্থানে এখন কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার ও সার্কুলার কেনাল অবস্থিত তাহাও অনেকদিন পর্য্যন্ত নরহত্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বেও চোরবাগান অঞ্চল চোরের উৎপাতের জন্ত খ্যাতি লাভ করেছিল।

এর পর কলিকাতা শহরে হর্ম্ম্যশ্রেণী সমূহ গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তস্করগণ শহরের বস্তি অঞ্চলে বসবাস সুরু করে। এই সকল দুর্ভেদ্য ও বিস্তীর্ণ বস্তি সমূহ পাপের আকর হয়ে উঠে। এইগুলি ছিল চোর, গুণ্ডা, স্মাগলার ও চোরা-ব্যবসায়ীদের আড্ডাস্থল। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বর্ত্তমানে পূর্ব্বেকার সুবিস্তৃত পঙ্কিল বস্তি সমূহের বুক চিরে বড় বড় রাস্তা বার করে ঐ সকল পাপ-বস্তি বিদূরিত করে এই শহরের বহু অপরাধেরও অবসান ঘটিয়েছে।

এই সময় কলিকাতার অপরাধিগণ দলপতির অধীনে দলবদ্ধভাবে তাদের পাপ ব্যবসায় পরিচালিত করতো। এইরূপ দলবদ্ধ অপরাধীদের অপপদ্ধতি সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে। এই সময় অপরাধিগণ কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"এইদিন অমুক রাজপথ দিয়ে আপন মনে পথ চলছিলাম। হঠাৎ এই সময় পিছন থেকে কে এসে আমার কাঁধে ঝুলানো ছাতাটী নিয়ে অন্তর্ধান হলো। ঐ স্থানের এক বস্তির সর্দ্দারের সহিত পরিচিত ছিলাম। তাকে সকল কথা বলাতে সে আমাকে একটা বাড়ীর তলার একটা ছোট কক্ষে নিয়ে এলো। ঐ ঘরটিতে দেখি সারি সারি বহু ছাতা সাজানো রয়েছে। কিন্তু আমার ছাতাটি সেখানে আমি দেখতে পেলাম না। ঐ কক্ষের অধিকারী তখন বললে, বোধ হয় এখনও

ছাতাটা এখানে জমা দেয় নি। ঘণ্টাখানেক পরে এসে দেখবেন তো। এর পর আধ ঘণ্টা পরে সেখানে গিয়ে দেখি আমার ছাতাটাও অপরাপর ছাতার পার্শ্বে সেখানে দাঁড় করানো রয়েছে।"

এইরূপ সঙ্ঘটন কলিকাতার অপরাধীদের মধ্যে এখন কদাচিৎ দেখা যায়। এদের এই সকল সঙ্ঘবদ্ধ দল এমনিই ভেঙ্গে পড়েছে। মানুষ চতুর ও সাবধানী হওয়ার সঙ্গে পকেটমার তালাতোড় প্রভৃতি কলিকাতার সাবেকী অপরাধ সমূহ সুযোগ সুবিধের অভাবে কমে আসছে বলে মনে হয়। এই যুগে চতুরের সঙ্গেই চতুরের সঙ্ঘর্ষ অধিক হয়ে থাকে। এই জন্য প্রতিদিনই এইখানে বহু নূতন নূতন বিবিধ ও বিচিত্র প্রবঞ্চনা অপরাধেরই সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রবঞ্চনা অপরাধ সমূহ বোধ হয় বর্ত্তমান সভ্যতারই একটী অবদান। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রবঞ্চনা অপরাধ সম্বন্ধে বহু উদাহরণ ও কাহিনীর কথা বলা হয়েছে। এক্ষণে নিম্নে অপর কয়েকটি ঐ রূপ আধুনিক উদাহরণ উদ্ধৃত করা হলো।

"আমাদের এক বন্ধু সকাল আটটার সময় অমুক বিখ্যাত জহুরীর দোকানে একশ টাকা ভাঙ্গিয়ে মাত্র দশ টাকার একটী গহনা কিনে নিয়ে এলো। দোকানটী খরিদ্দার বহুল হওয়ায় ঐরূপ বহু একশ টাকার নোট সেখানে জমা পড়ে। আমরা কিন্তু কথিত একশ টাকার নোটটীর নম্বর পূর্ব্বাহ্নেই টুকে রেখেছিলাম। এর পর বিকাল তিনটায় আমি একখানি দশটাকার নোট দিয়ে একটী রুপার কৌটা কিনে নি। ঐ কাউণ্টারের বিক্রেতা আমাকে তিনটা টাকা ফিরিয়ে দিলে আমি সবিস্ময়ে বললাম, এ'কি মশাই আমি যে একশ টাকার একটা নোট দিয়েছি। ততক্ষণে দোকানী ঐ দশ টাকার নোটটী বহু একশ টাকার নোটের সঙ্গে মিশিয়ে একই বাক্সে রেখে দিয়েছিল। দোকানী এই সম্পর্কে প্রতিবাদ জানালে

আমি আমার নোট-বুকে লেখা একশ টাকার নোটের নম্বরটী তাকে দেখিয়ে বললাম, দেখুন দেখি এই নম্বরের নোটটী আপনাদের ঐ বাক্সে রাখা আছে কি'না ? দোকানী খুঁজে ঐ নম্বরের একশ টাকার নোটটী বার করে সে অপ্রতিভ ভাবে বলে উঠলেন, ওহো তাহলে আমারই ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এর পরও দোকানী যদি তার পূর্ব্বতন সিদ্ধান্তে অটল থাকতো তা'হলে আমি থানায় এসে নালিশ জানিয়ে পুলিশের সাহায্যে ঐ নোট দোকান হতে বার করে প্রমাণ করতাম যে ঐ নোট আমারই—"

আধুনিক প্রবঞ্চনা অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে আরও দুইটী ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

"আমরা একটি ঝুটা ব্যবসা কেন্দ্র খুলে কোনও এক অবসর-প্রাপ্ত খেতাবধারী হাকিম বা সুপারকে মোটা মাইনেয় সেক্রেটারী বা ডিরেক-টার নিযুক্ত করতাম। তার পর কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো, 'মাসিক একশত টাকা বেতনে বহু ক্যানভাসার ও সেয়ার বিক্রেতা চাই, কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে একশত টাকা সিকিউরিটি মনি জমা দিতে হবে। অবসর-প্রাপ্ত হাকিম, রায়সাহেব অমুকের নিকট আবেদন করুন। রায়সাহেবের সরকারী কর্ম্মচারীর পূর্ব্বতন পদমর্য্যাদার জন্য নিঃসন্দেহে বহু ব্যক্তি আমাদের আফিসে এসে অর্থ সহ ধর্না দিত। রায়সাহেবকে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আমাদের পাপ মতলব সম্বন্ধে কখনও একটুও আমরা জানাই নি। তিনি পর্দ্দা ঘেরা অফিসে বসে কেবল মাত্র মরা নির্দ্দোষ নথী পত্রে সই করে যেতেন। আমাদের নিকট কয়েকটী 'সেয়ার ক্রয়' সম্বন্ধে বহু তথ্য সহ ছাপা ফর্ম থাকতো। আমরা ঐ সকল ব্যক্তিদের অর্থ গ্রহণ করে এমন সব কাগজ পত্রে তাদের সই নিতাম যাতে প্রমাণ করা যাবে যে তারা আমাদের ফার্মের সেয়ার মাত্র ক্রয় করেছে, চাকুরীর জন্য কোনও অর্থ সিকিউরিটী রূপে জমা দেয় নি। বলাবাহুল্য আমাদের

ধাপ্পাবাজীতে ভুলে তারা না পড়েই প্রতিটী ছাপা ফর্মে একটা করে দস্তখত করে দিত। এর পর আমরা তাকে কয়েকটী বাজে দ্রব্য দিয়ে তা বাজারে চালাতে বলতাম এবং তা তারা স্বভাবতঃই চালাতে পারে নি। ইতিপূর্ব্বে বাজারে জিনিস চালাতে না পারলে তাকে বিদায় দেওয়া হবে এইরূপ এক ছাপা কাগজেও আমরা সই নিয়েছি। এই সব কারণে তারা আমাদের নামে মামলা করে তাদের পূর্ব্ব প্রদত্ত অর্থ কোনও দিনই আদায় করতে পারে নি।”

এইরূপ অধুনাতম প্রবঞ্চনা অপরাধের অপর একটী অপপদ্ধতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

“আমার কাছে একদিন ‘ক’ বাবু এসে জানালেন যে একজন ব্যবসায়ী ‘খ’ বাবু এই নমুনার বহু যন্ত্র সাপ্লাই চায়। কয়েক দিন পর ‘ক’ বাবু আমাকে নিয়ে বহু দোকান ঘুরে একটী দোকানে ঐরূপ যন্ত্র খুঁজে বার করেন। প্রতি যন্ত্রের জন্য ঐ দোকানী ‘গ’ বাবু ৫০৲ টাকা চেয়ে বসলো। ওদিকে কিন্তু ‘ক’ বাবু আমাকে জানিয়েছেন যে ঐ ব্যবসায়ী ‘খ’ বাবু প্রতিটী যন্ত্র পিছু ১০০৲ টাকা দিতে রাজী। এর পর আমরা ঐ যন্ত্রের নমুনা সহ ঐ ব্যবসায়ী ‘খ’ বাবুর নিকট উপস্থিত হই। ‘খ’ বাবু যন্ত্রটী তাঁর ইঞ্জিনিয়ার ‘ঘ’ বাবুর দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে উহা মঞ্জুর করিয়ে আমাকে ৪০০০ পিশ ঐরূপ যন্ত্র সাপ্লাই দিতে বললেন। আমি প্রথম ‘লটে’ ঐরূপ দু’হাজার পিশ যন্ত্র কিনে আমার গুদামে মজুত করি। কিন্তু তার পরই দেখি ‘খ’ বাবু তাঁদের ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছেন। এর পর আমরা বাজারে যাচাই করে দেখি যে ঐরূপ যন্ত্র বাজারে প্রতি পিশে পাঁচ টাকাও কেউ দিতে চায় না। আমি অচিরে বুঝতে পারি যে ক, খ, গ ও ঘ বাবুরা একই দলের দলী। আমি এর পর ‘খ’ বাবুকে খুঁজে বার করে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি বলেন, আরে

আপনি বুদ্ধিতে হেরে গেছেন, এই সহজ কথাটাও বুঝতে পারলেন না। এখন নিয়ে আসুন আপনার মত আর এক মক্কেলকে ভুলিয়ে আমাদের কাছে। তা'হলে আপনি আপনার হারানো অর্থ তো ফিরে পাবেনই, তা ছাড়া আরও পাবেন কিছু হিস্যা বা ভাগ।"

কলিকাতায় যখন নাগরিকরা জামা পরতো কম, তখন তারা টাকা কড়ি রাখতো কোমরের কাপড়ের ট্যাঁকে বা গাঁটে। এইজন্য ঐ সময় অপরাধীরা তাদের গাঁট বেমালুম কেটে অর্থ অপহরণ করেছে। এই সকল অপরাধীদের বলা হতো 'গাঁট-কাট্টা'। কিন্তু পরে এই শহরের অধিকাংশ নাগরিকরা পকেট সহ কোর্ত্তা বা জামা পরতে সুরু করলে এই পুরাতন গাঁট-কাট্টাদের ধীরে ধীরে বিদেয় নিতে হয় এবং তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় অধুনাদৃষ্ট পকেটমারদের দল। সুসভ্য ও শিক্ষিত মানুষের মনের সহিত তাল রেখে চলবার জন্য অধুনাকালে এদের মনস্তত্ত্বের দিক হতেও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হয়েছে। এই সম্পর্কে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বহু তথ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। এক্ষণে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে অপর আর এক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"স্কুল কলেজ ও অফিসের যাতায়াতের সময় বাসে বা ট্রামে উঠে আমরা লেডিস্ সিট্এর পিছনে এসে দাঁড়াই। এই লেডিস্ সিট্ সকল উঠা নামার দরজার নিকট থাকলে আমাদের আরও সুবিধে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে যুবকগণ মেয়েদের সহিত নামবার সময় সন্ত্রস্ত, উৎফুল্ল কিংবা ভাবে বিভোর থাকে। এই সুযোগে সারা গাত্র আলোয়ানে আবৃত করে তাদের পাশে দাঁড়ালে এরা অন্যমনস্ক ভাবে ঘড়ী শুদ্ধ হাতটা আমাদের আলোয়ানের মধ্যেই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।"

প্রাচীন তালাতোড় ও সিঁদেল চোরগণের অনেকেই এখনও পুরাতন সিঁদকাটীতে সন্তুষ্ট থাকলেও এদের কেউ কেউ আজকাল 'বোরিঙ্ ড্রিল'

বা ইলেকট্রীক ড্রিল বা এ্যাসিড প্রভৃতিরও সাহায্য নিয়ে থাকে। * কখনও কখনও সাধু বা ভিখারীর বেশে বাড়ীর রোয়াকে বা কোনও ঘরে আশ্রয় নিয়ে কিংবা পার্শ্ববর্ত্তী কোনও দোকান বা কামরা ভাড়া নিয়েও তারা রাত্রি যোগে ঐরূপ অপরাধ করে পলায়ন করেছে।

অধুনাকালে বৈজ্ঞানিক খুন বা হত্যাও এই শহরে বিরল নয়। বিখ্যাত পাকুড় হত্যা-মামলায় কিরূপে চলতি-পথে প্লেগের বীজাণু সূচী-যন্ত্রের সাহায্যে নিহত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করানো হয়েছিল তা আজ সর্ব্বজনবিদিত। সম্প্রতি সার্জ্জারী বিদ্যায় অভিজ্ঞ ডাক্তার বা কমপাউণ্ডার আসামীরা, খুনের পর নিহতের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে শহরের নানাস্থানে ছড়িয়ে দিয়েছে। এইরূপ কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য মৃতদেহ সনাক্তকৃত যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু কেশ, চর্ম্ম, চক্ষু প্রভৃতির রঙ্ ও বস্তু এবং রক্ত প্রভৃতি ও নৃতত্ব সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পেরেছেন যে ঐ মৃত ব্যক্তি কোন পরিবারে বা কোন পিতামাতা হতে জন্মগ্রহণ করেছে। এ'ছাড়া মুখের চর্ম্ম তুলে ফেললেও ঐ দেহের অন্য স্থান হতে চর্ম্ম উঠিয়ে নিয়ে উহা মুখে লেপন করে সনাক্তিকরণের উদ্দেশ্যে মুখাকৃতিকে পুনরায় ফুটিয়ে তুলা সম্ভব। ঐ চর্ম্মহীন মুখের ক্লে-মডেল করে দেহের অন্যান্য অংশের রঙ্ অনুযায়ী উহার রঙ্ করে সনাক্তযোগ্য মুখাবয়বের সৃষ্টি করা গিয়েছে। মুখের ঐ মডেল অন্যান্য অনুরূপ মডেলের সহিত মিশিয়ে দিয়ে মিছিল-সনাক্তিকরণের ব্যবস্থা করলে পরিচিত ব্যক্তিরা সহজেই ঐ মুখটী কার তা বলে দিতে পারবে।

* আজকাল সিঁদেল চোররাও আধুনিক যন্ত্রসহ ট্যাক্সি বা মোটরযানেও যাতায়াত করে।

বৈজ্ঞানিক খুন করার জন্য খুনীরা নিহত ব্যক্তির হবি এবং হ্যাবিট্ সম্বন্ধে প্রথমে খোঁজ খবর নিয়ে থাকে। নিম্নে এই সম্পর্কে একটী বিলাতী বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে অমুক ব্যক্তি গৃহে এসেই জোরে রেগুলেটার খুলে পাখা চালিয়ে ঐ রেগুলেটারের নিম্নের এক ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েন। আমি এইজন্য, তিনি গৃহে ফিরবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই পাতলা এম্‌পিউলে পোটাসিয়াম-সাইনাইড্ ও অক্সিলিক্ এ্যাসিড রেখে উহা পাখার রেগুলেটারের উপরে রেখে দিই। কিছুক্ষণ জোরে পাখা চলার পর ঐ রেগুলেটার গরম হয়ে উঠায় ঐ মুখ খোলা এ্যাম্‌পিউলটীও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এর ফলে উত্তাপ জনিত এই উভয়দ্রব্য হাইড্রোসিয়ানিক এ্যাসিডের সৃষ্টি করে। ইহা গ্যাসাস্ হওয়ায় নিশ্বাসের সঙ্গে অমুক ব্যক্তির নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে তাকে নিহত করেছিল।

পাশ্চাত্যদেশে কখনও স্মেলিঙ্ সল্টের শিশিতে অনুরূপ মিশ্রিত রসায়ন গোপনে রেখে মানুষকে মানুষ নিহত করেছে। জন-স্বার্থের কারণে বৈজ্ঞানিক হত্যা সম্পর্কে অধিক আলোচনা এখানে করা সম্ভব হলো না।

স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতি

স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতিকে ইংরাজীতে বলা হয় ক্রিমিন্যাল ট্রাইব। ইংরাজ আমলে বংশ পরম্পরায় ইহারা 'ক্রিমিন্যাল ট্রাইব এ্যাক্ট্' নামক বিশেষ এক সর্ব্বভারতীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এই সকল জাতিকে চারিটী বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা :—

(১) যারা তাদের আদিম অপরাধ-স্পৃহা ও স্বভাব-চরিত্র আজও

ত্যাগ করে নি। অপকর্ম্মই তাদের জীবন ধারণের জন্য একমাত্র পেশা। প্রাচীন কাল হতে আজও পর্য্যন্ত তারা একই ভাবে জীবনযাপন করে আসছে। তবে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাদের জীবন প্রণালী যেমন কিছুটা বদলেছে তেমনি তাদের অপস্পৃহাও কথঞ্চিৎ অন্তর্মুখী হয়ে গিয়েছে।

(২) যারা আমাদেরই মত কোনও এক সভ্য জাতির অধঃপতিত বংশধর। প্রাচীন হিন্দু রাজা ও ভূ-স্বামীদের সৈন্যবাহিনী তাদের প্রভুদের পরাজয়ের পরও বহুদিন বিজেতাদের অধীনতা স্বীকার করে নি। তারা বনে জঙ্গলে দূর গ্রামে ও প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তাদের যুদ্ধ-স্পৃহা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। পরবর্ত্তীকালে এরাই বহু ডাকাত দলের সৃষ্টি করে।

(৩) যারা অপরাধ-স্পৃহা বহু পুরুষ পূর্ব্বে ছেড়ে দিয়েছে বা যারা আদপেই স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতি নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের স্বগোষ্ঠীর কয়েকজনের অপরাধের জন্য শাসনতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক প্রভৃতি বিবিধ কারণে স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতিরূপে গণ্য করা হতো।

স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতিদের জীবন-প্রণালী তিন প্রকারের। এদের অধিকাংশ দল আজও ভ্রাম্যমান যাযাবর জাতি। এদের কয়েকটী দল স্থান বিশেষে স্থায়ীভাবে কিছুকাল বাস করলেও পূর্ব্ব পুরুষ হতে প্রাপ্ত প্রেরণার কারণে অধিককাল একস্থানে বসবাস করে নি। এদের অপর কয়েকটী দল একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও, এদের অধিকাংশ ব্যক্তিদের মধ্যে অপস্পৃহা আজও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

চিরকালই মানুষ অপরাধী থাকবে এ'কথা আমি কোনও দিনই বিশ্বাস করি নি। এদের বহু দল নূতন অভ্যাস, শিক্ষা ও আবেশের মধ্যে পড়ে নিরপরাধী মানুষে পরিণত হয়েছে ও হচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে

বর্ত্তমান ভারত গভর্ণমেণ্ট 'ক্রিমিন্যাল ট্রাইব এ্যাক্ট' আইন এদেশ হতে উঠিয়ে দিয়ে মানুষের আত্মার প্রতিই সম্মান দেখিয়েছেন। জন্মের জন্য আজ আর এদের কাউকে দায়ী করা হয় না। পূর্ব্বে উক্ত আইন দ্বারা এদের বংশে-জাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই গতিবিধি নির্ব্বিচারে নিয়ন্ত্রিত হতো।

এই পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান কয়েকটী উল্লেখযোগ্য স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতির কাহিনী ও রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

বাংলাদেশে প্রায় ৭৪টী স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতি অপকর্ম্মের জন্য বিখ্যাত। ইহাদের নাম, যথা—বারোয়ার, বাগ্‌দী, বৈদ মুসলমান, মঘেয়া ডোম্, মাল্লা, সোনার, বারুই, ব্যাধ, তুঁতিয়া মুসলমান, ভামতা, দারয়ালী কামিস্, সতনামি চামার, যোগীপাঠান, কেপমারী, ছাত্রিশগড় চামার, ইরাণী, বনফর, বাউরিয়া, যশরের বেদিয়া, ভদক, ভাগরিস্ ভার্ত্তা, ভূমজী, ভূর, চৈন চামার, চৈন মল্লা, চাকি দুসাদ, ছাপারবান্দ ঢাক্ওয়ালী, দেলেরা, ঢেলিয়াল, ধারি, ঢেকারুশ, গৈণ, গোণ্ডা, যদুরা ব্রাহ্মিণ, ঝিঝিয়া দোসাদ, যোধপুরি মারাঠা, কালান্দার, কামারিয়া, কেওরা, কারিফকায়, কারওয়ালী নাট্, কুরুইয়াস্, লোধা, মাল্লা, আগ্রা, মথুরা ও আলিগড়ের মাল্লার, মালপাহাড়ী, মারয়াড়ী বাউরিয়া, মক্কা মল্লায়েম, মিনা, মিনকা, মুচী—বড়ভাগীয়া ও ছোটভাগীয়া, মজাফারপুর সোনার, আউধিয়া, থারুস্, সের-সা-বেদিয়া মুসলমান, সন্দার, সামুরিয়া, রাউত, রায় ঘাটোয়াল, পোদ, পার্শি, পালওয়ার দোসাদ, পাইকমার ইত্যাদি।

এদের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক তথ্য বুঝাবার জন্য এদের কয়েকটীর মাত্র জীবন-তথ্য বর্ত্তমান পুস্তকে আলোচনা করবো। অন্যান্য স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতির ইতিকথা একটী পৃথক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হবে। এই সকল জাতিরা কেহ কেহ সাধারণ কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে অবিরত

অপকর্ম্ম করে, এবং এদের অপর সকলে কাজকর্ম্ম করাকে ঘৃণা করে এবং আজও পর্য্যন্ত অপরাধই তাদের একমাত্র জীবিকা।

এদের দল সকল প্রাচীন পদ্ধতিতে অপকর্ম্ম করে কিন্তু এদের কেপ-মারী দল আজকাল অপকর্ম্মে একপ্রকার ইরিটেণ্ট পাউডার অলক্ষ্যে মানুষের দেহে ছড়িয়ে দেয়। এর পর তাকে সাহায্য করার অছিলায় এগিয়ে আসে বা তাকে কোথায় জল থাকলে তা দিয়ে গা ধুতে বলে। এবং ঐ ব্যক্তি নীচু হওয়া মাত্র তার দ্রব্যাদি অপহরণ করে। এই কেপমারী দলে বাহিরের লোককেও গ্রহণ করা হয়, এই জন্যই বোধহয় এই ব্যতিক্রম।

[যে সকল স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতি ব্রাহ্মিণ প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতির অধঃপতিত বংশধর, অপবিজ্ঞান অনুসন্ধানার্থে তাদের রীতিনীতি পর্য্যালোচনা বিশেষ রূপে প্রয়োজন। এই সম্পর্কে এই প্রদেশের তিন চার পুরুষের নাম করা পরিবারের চতুর্থ পুরুষীয় অধঃপতিত বংশধরদের মধ্যেও অনুসন্ধান করা উচিত। এই সকল পরিবারের মানুষরা তিন চার পুরুষ অপস্পৃহা প্রদমিত করে রাখার পর চতুর্থ পুরুষে যখন উহা নিষ্কাশিত হয়, তখন উহা বেগে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যে পরিবারে কয়পুরুষ যাবৎ মহান ব্যক্তিদের জন্মাতে দেখা যায়, সেই পরিবারে আমরা বহু সংখ্যায় অপরাধী জন্মাতেও দেখি। তবে এর কতটুকুর জন্য অর্থের ঘাটতি ও কুশিক্ষা সহ কুপরিবেশ দায়ী তা'ও দেখা দরকার।]

স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতিদের আচার ব্যবহার সঙ্কেত ও খেইড় প্রভৃতি প্রাচীন, অকৃত্রিম এবং আদীম কালীন। এদের জাতিগত স্বতন্ত্রতার জন্যে এরা একই প্রকারের অপকর্ম্ম করে। কিন্তু এদের মধ্যে যারা বাহিরের লোকদের দলে নিয়ে রক্তের মিশ্রণ ঘটায় তাদের মধ্যে বহু

আধুনিক রীতিনীতি দেখা যায়। এইজন্য বোধ হয় এরা পাঁচমেশালী অপরাধ পদ্ধতিতেও অভ্যস্ত।

এই বাগদী জাতির কয়েকটী গোষ্ঠীই আমার মতে বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সামরিক জাতির অধঃপতিত বংশধর। পূর্ব্বকালে স্বাধীন হিন্দু নৃপতিগণ ইহাদের মধ্য হতে সৈন্য সংগ্রহ করতেন। মধ্যযুগে ও প্রাক্-ব্রিটিশ কালে অর্দ্ধ-স্বাধীন জমীদার ও সামন্তগণও ইহাদের স্ব স্ব বাহিনীতে নিয়োগ করেছেন। বিষ্ণুপুরের বাগদী সৈন্য এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। নাটোর রাজসরকারের সেনাবাহিনীতে বহু বাগদী ও ভোজপুরী মোতায়েন ছিল। মারাঠা আক্রমণের সময় বাংলার নবাব তার পরিবার-বর্গকে নিরাপত্তার জন্য কিছুকাল নাটোরে অপসারিত করেন, এই বাগদী সৈন্যদেরই শৌর্য্য বীর্য্যের ভরসায়। কিছুকাল পূর্ব্বেও বাংলার জমীদারগণ তাদের জমীদারী রক্ষার্থে এই বাগদী পাইক বরকন্দাজদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগবাসী বাগদীরা চিরকালই বিখ্যাত লাঠিয়াল রূপে পরিচিত।

বাগদীদের কয়েকটী দল কখনও বিদেশীদের বশ্যতা স্বীকার করে নি। বরং ডাকাতদলের সৃষ্টি করে বা তাতে যোগ দিয়ে তারা বিদেশী শাসনের বিরোধিতা করেছে। পরিশেষে এদের কোনও কোনও দল অভ্যাসের দোষে আদর্শহীন অপরাধী দলের সৃষ্টি করে।

বর্ত্তমান কালে এরা প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগের জেলাগুলিতে বাস করে এবং এরা জাতিগত ভাবে সকলেই অপরাধপ্রবণ নয়। বরং এরা সমাজের একটী উল্লেখযোগ্য অংশ। গভর্ণমেণ্টের অধীনে চৌকিদার এবং জমীদারদের অধীনে পাইক ও সর্দ্দার রূপে এরা কাজ করে

থাকে। এদের কেউ কেউ যাযাবর ও কেউ কেউ স্থায়ী কৃষিজীবী এবং এদের দুলিয়া নামক উপশ্রেণী পাল্কী বহন করে। এদের কেউ কেউ জেলের কাজও করে থাকে। পূর্ব্বকালে জমীদারগণ এদের তৎকালীন পুলিশি কর্ম্মকৃত্যেও নিয়োগ করতো।

এই বাগদী দলের এমন কয়েকটী দল আছে যারা কুখ্যাত ডাকাত দল। তারা আজও ডাকাতি ও রাহাজানি করে। খড়া বা প্রাচীর বেয়ে উপরে উঠতেও এরা ওস্তাদ। এই সকল বাগদী অপরাধীরা বর্দ্ধমান জেলার সদর মহকুমায়, ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় এবং হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় অধিক সংখ্যায় বাস করে।

বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বাগদীরা মেটিয়া নামক অপর এক ঐ শ্রেণীর স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতির লোকেদের তাদের অপকর্ম্মে সাহায্য নিয়ে থাকে। এই যুক্ত দলকে এইজন্য চুরি ও ডাকাতি করতে দেখা গিয়েছে। অনুরূপ দ্বিবিধ-অপরাধে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা নিবাসী বাগদীরা, কাওরা ও পোদ নামক অপর দুইটী আদিম জাতির সাহায্য নিয়ে থাকে। এই কাওরা ও পোদ ২৪ পরগণা জেলার কুখ্যাত অপরাধী দলের সৃষ্টি করেছে। ক্ষেত্র বিশেষে এদের সঙ্গে ধর্ম্মান্তরিত মুসলমানরাও যোগ দিয়ে থাকে।

বাগদী জাতি ভারতের এক আদিম জাতি। এরা তেঁতুলিয়া, কাশাইকুলিয়া, দুলিয়া প্রভৃতি এগারটী উপশ্রেণীতে বিভক্ত। ধর্ম্মে এরা হিন্দু। তথাকথিত পতিত ব্রাহ্মণরা এদের পুরোহিত। ভাদ্রের শেষ দিনে এরা ভাদু পূজা করে। এই সময় তারা উদ্দাম নৃত্য-গীত করে থাকে। ভাদু একজন কুমারী মনীষিণী। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন।

কেপমারি

কেপমারি দল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বাসিন্দা। ত্রিচিনাপল্লী জেলার থোগমালাই-এর নিকট এড়েয়াপট্টিতে এরা অধিক সংখ্যায় বাস করে। কিন্তু অধুনাকালে এদের রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, কলিকাতা, কলম্বো, পণ্ডিচারী প্রভৃতি স্থানেও দেখা যায়। এরা আন্তর্জাতিক অপরাধী দল রূপে প্রসিদ্ধ।

এই দলকে জাতি না বলে মিশ্রজাতি বলা যেতে পারে। কারণ এরা বাহির হতে উচ্চ শ্রেণীর বালিকাদের ক্রয় করে বা অপহরণ করে তাদের বালকদের সঙ্গে বিবাহ দেয়। কিন্তু তা'হলেও অন্য জাতির বালকদের এরা কখনও নিজেদের দলে স্থান দেয় নি।

এরা অর্দ্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত এবং তামিল, তেলেগু, ক্যানারিজ, হিন্দুস্থানী এবং ইংরাজি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে সক্ষম। এরা ভদ্র ব্যক্তির ন্যায় বেশভূষাও করে, কিন্তু সাধু জীবন এরা কদাচিৎ যাপন করেছে। অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য কাজকর্ম্মে এদের মন নেই।

এই দলের পুরুষরা সুদক্ষ পিকপকেট, তালাতোড় ও চোর হয়ে থাকে। এদের স্ত্রীলোকেরাও চৌর্য্য কার্য্যে অভ্যস্ত এবং শিশুরা সাত আট বৎসর বয়স হতেই অপরাধ সুরু করে। কিন্তু এরা অপকর্ম্ম করে তাদের বাসস্থান হতে বহু দূরে দূর-দেশ সমূহে এবং রেলগাড়ীতে এরা ভাড়া না দিয়েই যাতায়াত করে। রাত্রি কালে ভামতা দলের পন্থানুযায়ী ট্রেনের সহযাত্রীদের ব্যাগ কেটে বা বাক্স ভেঙে দ্রব্যাদি অপহরণ করে ঐ দ্রব্য সহ তারা পরবর্ত্তী এক ষ্টেশনে নেমে পায়খানা প্রভৃতিতে আত্মগোপন করে। এ'ছাড়া প্ল্যাটফর্ম্ম, বিশ্রাম ঘর প্রভৃতি এরা অপকর্ম্মের জন্য বেছে নিয়েছে। এরা ব্যাগ প্রভৃতি দ্রব্য সরিয়ে উহা ছেঁড়া কাপড় ও খড় প্রভৃতি দিয়ে ভর্ত্তি করে থাকে।

এদের পাঁচ বা ছয় জনের ছোট ছোট দল পোষ্ট আফিস, ব্যাঙ্ক, টিকিট-ঘর প্রভৃতির কাউণ্টারে এসে অপকর্ম্ম করে। এদের একজন কোনও প্রকারে ব্যক্তি বিশেষের মনোযোগ অন্যত্র আকর্ষণ ক'রে তাকে বিভ্রান্ত করে। ইত্যবসরে এদেরই অপর এক জন তার অর্থাদি বেমালুম সরিয়ে নিয়ে দলের লোকদের মারফৎ ত্বরায় পাচার করে দেয়। কলিকাতায় এরা ঐরূপ কাউণ্টারের পাশে দণ্ডায়মান ব্যক্তি বিশেষকে ব'লে উঠে, "ঐ একটা টাকা পড়ে গেল" ইত্যাদি। এই কথা শুনে সে মাথা নীচু করা মাত্র, তার পকেট বা কাউণ্টার হতে অর্থাদি অপহরণ করে সরে পড়ে। কখনও কখনও এরা দূরে সরে থেকে এদের বালকদের দ্বারা চুরি করায় এবং নিজেরা চোরাই দ্রব্য হাতাহাতি করে পাচার করে। তাদের বালকরা দৈবাৎ ধরা পড়লে, এরা অভিভাবক সেজে বা সাধারণ নির্লিপ্ত নাগরিকের ভূমিকায় নেমে ঐ সকল বালকদের বেদম প্রহার করে তাদের সরিয়ে বা মুক্ত করে দেয়। কখনও কখনও এদের বালকরা মুটে বা সাহায্যকারী সেজে পোষ্টম্যানদের বা নাগরিকদের দ্রব্য বহন করে। ইতিমধ্যে এদের অপর একজন এসে ঐ দ্রব্য ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলে, এরা 'চোর চোর' বলে ভিন্ন পথে ভিন্ন এক ব্যক্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে চেঁচাতে থাকে।

এদের উৎপাত আজকাল সিংহল, ব্রহ্ম, করাচি, দিল্লী, কলিকাতা, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মালয় রাষ্ট্রপুঞ্জ, ষ্ট্রেট্‌ সেটেলমেণ্ট প্রভৃতি বহু দূর দূর স্থানেও বিস্তৃত। সিংহল প্রভৃতি যে সকল দেশে ক্রিমিন্যাল ট্রাইব এক্ট চালু নেই এরা সেই সকল দেশের নামে পাশপোর্ট সংগ্রহ করে দেশ-বিদেশে গমনাগমন করে।

ভামতা

ভামতা দল বোম্বে প্রেসিডেন্সির সাতারা, সোলপুর, খণ্ডেশ, পুণা, আহম্মদনগর, নাসিক, বেলগ্রাম এবং বিজাপুরের বাসিন্দা। এরা ধর্ম্মে হিন্দু এবং অপকর্ম্মে বহির্গত হবার পূর্ব্বে কালীমাতার পূজা করে। কিন্তু এরা তাদের দলে অন্যান্য হিন্দুদের, পার্শিদের এমন কি মুসলমানদেরও গ্রহণ করে মিশিয়ে নেয়। এরা সর্ব্বদাই ভদ্রবেশী ও তেলেগুভাষী। ধরা পড়লে এরা কখনও নাম ধাম প্রকাশ করে না।

এরা মেলা, ধর্ম্মস্থান, রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতি জনবহুল স্থানে পকেটমারি ও চৌর্য্যকার্য্য করে থাকে। এরা ছদ্মবেশ ধারণ করতে ওস্তাদ। ইউরোপীয় পরিচ্ছদে বা রেলওয়ে কনট্রাকটার ও মারাঠা বা মাড়বারী বা দেশবালী ব্যবসায়ীর বেশে এরা ট্রেণের উচ্চশ্রেণীতে ভ্রমণ করে। এরা কখনও কখনও নারীর বেশে স্ত্রীলোকদের দ্রব্যাদি হরণ করে পর মুহূর্ত্তেই আবার পুরুষের বেশ ধারণ করেছে। এরা রেলওয়ের ট্রেণের বিভিন্ন শ্রেণীর কামরায় চুরি করে কামরান্তরে চলে গিয়েছে কিংবা তখনি বিপরীতমুখী এক ট্রেণে উঠে চম্পট দিয়েছে।

ভামতাদের এক একটি দল দুই একজন স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা সহ আট দশ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত। এরা অপকর্ম্মের উদ্দেশ্যে কোনও এক স্থান হতে উপরোক্ত রূপ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দিকে দিকে প্রস্থান করে। এবং পরে কোনও এক পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত স্থানে এসে সকলে জমা হয়। রাত্রে ট্রেনে ঘুমন্ত সহযাত্রীদের দ্রব্যাদি চুরিতে এরা সিদ্ধ হস্ত। ভালো শিকার দেখলে এরা তার পিছু পিছু সম শ্রেণীর টিকিট কিনে তার কামরায় উঠে পড়ে। ট্রেনে এদের দুই একজন ঐ মনোনীত ব্যক্তিকে মজাদারী কথাবার্ত্তায় ভুলিয়ে রাখে। ইত্যবসরে এদের অপর দুই একজন দ্রব্যাদি

চুরি করে পরের ষ্টেশনে নেমে পড়ে। কখনও এরা দয়ার ভাব দেখিয়ে সহযাত্রীদের আসন ছেড়ে দিয়ে নিজেরা চাদর মুড়ি দিয়ে নীচে শুয়ে পড়ে। পরে এই চাদরটির কিছু অংশ বাক্স বা ব্যাগের উপর বিছিয়ে উহার তলা দিয়ে হস্ত প্রসারণ করে ঐ বাক্স প্রভৃতি ভাঙা কাচ বা বাঁকা ছুরী প্রভৃতির সাহায্যে কেটে বা ভেঙে দ্রব্যাদি চুরি করে তা কম্পার্টমেণ্টের উভয় কামরার মধ্যবর্ত্তী রেলিঙের মধ্য দিয়ে উহাদের সহধর্ম্মীদের নিকট পাচার করে দেয়। কখনও কখনও এক নির্দ্ধারিত স্থানে গাড়ী এলে দ্রব্যাদি জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে নিজেরাও ট্রেন হতে লাফিয়ে পড়েছে। কখনও কখনও এরা অলক্ষ্যে জানালা দিয়ে অন্য কামরায় অবস্থিত দলের লোকদের নিকট দ্রব্যাদি পাচার করে দিয়েছে।

ভামতারা অপকর্ম্মের জন্য, কাটা ব্যাগ সেলাই করে দিবার মত ছুঁচ সুতা, ছেনি, ঝুটা চাবি, গরাদ কাটার জন্য লৌহকর্ত্তন যন্ত্র, প্রভৃতি সঙ্গে রাখে। কোনও কোনও যন্ত্র তারা পকেটে বা মুখের মধ্যেও লুকিয়ে রেখেছে। সাধারণতঃ এরা নগদ টাকা, গহনাদি ও মূল্যবান দ্রব্যাদিই অপহরণ করে থাকে। এরা সোনা দানা তৎক্ষণাৎ গলিয়ে ফেলে। বস্ত্রাদি পোষ্টাল পার্শেলে দেশে পাঠায় এবং নগদ টাকা পেলে তারা মনি অর্ডার করে দেশে পাঠিয়ে দেয় কিংবা স্থান ত্যাগ করার পূর্ব্বে উহা পুঁতে রাখে।

আজকাল এই দল হাওড়া, রাণীগঞ্জ, খড়গপুর, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থানেও অপকর্ম্ম সুরু করেছে।

মঘেয়া ডোম

ডোমেরা ভারতের এক আদিম জাতি বলে পরিচিত। এরা দুইটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত যথা মঘেয়া ও বাঁশফোর। এ'ছাড়া বাঁশফোর হতে উদ্ভূত দাকার নামে এদের একটি তৃতীয় উপশ্রেণীও আছে। এই

বাঁশফোর ও দাকার উপশ্রেণীর মানুষরা গ্রামের প্রান্তদেশে বাস করে এবং বাঁশের চেঁচাড়ির সাহায্যে ঝুড়ি বাক্স প্রভৃতি দ্রব্য তৈরি করে সৎ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু এদের মঘেয়া উপশ্রেণী এখনও ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করে এবং অপরাধ মূলক কার্য্যে সিদ্ধহস্ত।

মঘেয়া ডোমেরা যুক্ত প্রদেশের গোরখপুর, আজামগাঁও, বিহার প্রদেশের সায়ান ও চাম্পারান এবং বাংলা প্রদেশের প্রায় সকল জিলাতেই বসবাস করে। বহুস্থানে মিউনিসিপ্যালিটিতে তারা মেথর ও ঝাড়ুদারের কার্য্যও করে থাকে। কিন্তু অপরাধ প্রবণতা এমন ওতঃপ্রোত ভাবে তাদের রক্তের সহিত মিশ্রিত যে চাকুরী-বাকুরী থাকা সত্বেও সুবিধা পেলেই তারা অপরাধ করতে ইতস্তত: করে নি।

মঘেয়া ডোমেদের আকৃতি—বেঁটে কৃষ্ণবর্ণ ও দোহারা। চেহারা এদের সাধারণত: ভালোই। এরা কেশ বড় রাখে ও তা আঁচড়ায় না। পুরুষেরা স্বল্পময়লা বস্ত্র পরলেও, এদের স্ত্রীলোকেরা পরিষ্কার বস্ত্র পরে। এদের চক্ষু তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। স্ত্রীলোকেরা সক্ষম হলে গহনাও পরে, কিন্তু এদের মধ্যে একনিষ্ঠার একান্ত অভাব। এমন কি এরা স্বজাতির বাইরের লোকেদের সহিতও অর্থের বিনিময়ে যৌন-মিলনে সম্মতি দিয়েছে। কোনও এক মঘেয়া ডোমের জেল হলে, তার স্ত্রী অন্য এক স্বজাতীয়ের উপপত্নিত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু তার স্বামী জেল থেকে ফিরে আসামাত্র তার সহিত স্ত্রী রূপে পুনর্মিলিত হয়েছে। মঘেয়া ডোমদের নিজস্ব সঙ্কেত খেউড় ও ভাষা আছে, যা অপরের পক্ষে অবোধ্য। এদের অনেকে বাঁশফোর উপশ্রেণীর ব'লে পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করে থাকে।

মঘেয়া ডেমরা রাজপথে রাহাজানি এবং সিঁদেল চুরি প্রভৃতি বহুবিধ অপরাধ করে থাকে এবং এদের বালকরা শৈশব থেকেই অনুরূপ অপকর্ম্মে অভ্যস্ত হয়। এরা দেওয়াল ফুটা করে ঐ ফুটায় হাত গলিয়ে খিল বা

ছিটকানি খুলে ফেলে। এইরূপ পন্থাকে বলা হয় "বগলী সিঁদ"। এদের এমন অভ্যাস যে একটি দেশলাই বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকে সেখানে একটি দেশলাই কাঠি জ্বালাবেই। এরা কখনও কখনও নির্দ্দয় ভাবে ঘুমন্ত শিশু ও নারীর অলঙ্কার ছিনিয়ে নিয়েছে। একটি বাটীতে সিঁদ দিয়ে চুরি করতে সমর্থ হলে এরা ঐ স্থানের পর পর আরও ছয় সাতটি গৃহেও ঐরূপে হানা দিয়ে চুরি করে থাকে। এদের কেউ কেউ ছিঁচকে চুরিতেও অভ্যস্ত। দরজা খোলা পেলে ঘটী বাটী ও কাপড় চোপড় প্রভৃতিও চুরি করতে এরা দ্বিধা করে নি।

মঘেয়া ডোমেরা একটি বাঁকা দা সঙ্গে রাখে এবং ঐ অস্ত্র দিয়ে দেওয়ালে গর্ত্ত করে। এই দা নিজেদের হাতে বেঁধে উহা ছুঁড়ে কেউ ধরতে এলে তাদের আঘাত করে। ধরা পড়ার পর এই দা দিয়ে এরা নিজেদেরই আঘাত করেছে।

এদের মেয়েরা নিজেরা সিঁদ-চুরিতে লিপ্ত না থাকলেও নানা ভাবে পুরুষদের এই বিষয়ে সাহায্য করে। এরা চোরাই মাল পাচার করে বা লুকিয়ে রাখে, একদলের খবর অপর দলকে দিয়ে আসে, গৃহস্থ বাটীর খবরাখবর রাখে এবং পুলিশকে নানা ভাবে বিভ্রান্ত করে। এ'ছাড়া এদের মেয়েরা "ঘুঁটি খেল" (Bead Swindling) প্রবঞ্চনায় পাকাপোক্ত। এই পদ্ধতিতে তারা সোনার দানা বলে পিত্তলের দানা পল্লীর অজ্ঞ নারীদের নিকট গছিয়ে দিয়েছে।

মঘেয়া ডোমরা সৎভাবে কাজ করাকে ঘৃণা করে এবং অপকর্ম্মকে তারা ধর্ম্ম ও বীরত্ব মনে করে, এরা অপকর্ম্মের পর পলায়নের সময় শিয়ালের অনুকরণে চার পায়ে দৌড়ে শিয়ালের ডাক ডাকতে ডাকতে চলে যায়। অপকর্ম্মের সময় সারা দেহ এরা তৈলসিক্ত করে পিচ্ছল করে রাখে, যাতে তাকে কেউ ধরলে সে তার হাত ফসকে

পালাতে পারে। এরা শূকর বলি ও মাদক সহযোগে গণ্ডক, সমাই, সময় দেবতার পূজা করে থাকে।

ইরাণী

ভ্রাম্যমান ইরাণী দল অশ্ব, রত্ন ও ছোরা-ছুরিকার ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং সুবিধা মত চুরি করে ও কন্যা অপহরণ করে। এরা আকবরী মুদ্রা, ছুরি ও তালা প্রভৃতির দোকানে পশার সাজিয়ে ক্রেতা ও দর্শকদের আকৃষ্ট করে। এদের মেয়েরা ক্রেতাদের ওপর জুলুম ক'রে বেশী দামে দ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য করে। পুরুষরা এই সময় দূরে দাঁড়িয়ে হাব ভাবের দ্বারা তাদের আরও ভীত করে তুলে। টাকা হাতে পেয়ে এরা বক্রী ভাঙানি অর্থ ফেরৎ দিতে প্রায়শঃ অস্বীকার করে। এদের অপকর্ম্ম করাই একমাত্র উপজীবিকা। ব্যবসায় কার্য্য উহাদের ছলনা মাত্র, কারণ এতে অপকর্ম্মের সুযোগ সুবিধে অধিক হয়ে থাকে। যে সকল ক্রেতা ভীড় করে আশে পাশে দাঁড়ায় দলের অপর ব্যক্তিরা তাদের পকেট সাফ করে। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত অস্তিমার বা অস্তিরাজী পদ্ধতিতেই তারা প্রায় অপকর্ম্ম করে। এদের মেয়েরা সাক্ষাৎভাবে কম ক্ষেত্রে অপকর্ম্ম করে। অধিক ক্ষেত্রে তারা অপকর্ম্মে পুরুষদের সুবিধে করে দেয়। এরা প্রায়ই কোনও রেল ষ্টেশনের নিকট তাদের আস্তানা বা তাঁবু ফেলে এবং সেখান থেকে নিকটস্থ স্থান সমূহে ট্রেন যোগে গিয়ে অপকর্ম্ম করে স্বস্থানে ফিরে আসে।

ইরাণী দল স্থানীয় বালক-বালিকাদের অপহরণ করে তাদের নিজেদের দলে ভর্ত্তি করে নেয় এবং তাদের অপকর্ম্ম শিক্ষা দেয়। এ'ছাড়া স্থানীয় বালক ও যুবক পকেটমারদের সংগ্রহ করে এরা তাদের রাজপথ, ষ্টেশন

প্রভৃতি স্থানে অপকর্ম্মে নিযুক্ত করেছে। তাদের নিকট হতে এরা হিস্যা নেয় এবং প্রতিদানে বাহুবলে তাদের রক্ষা করে। অপহৃত দ্রব্য এদের সকলকেই ইরাণী দলের নেতার নিকট এনে জমা দিতে হয়। এই নেতা ঐ দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ যে চুরি করেছে তাকে দিয়ে বাকি হিস্যা সমান ভাগে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। নেতা নিজে অবশ্য এক হিস্যা বেশী সব সময়ই নিয়ে থাকে।

ইরাণী দলের কেউ ধরা পড়লে দলের অন্য সকল লোক ছুটে এসে ঝগড়া ও হল্লা করে তাকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে পুলিশের নাগালের বাহিরে বহুদূরে সরিয়ে দেয়। এদের নেতারা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বচন-বিন্যাস দ্বারা মুগ্ধ করে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর নিকট হতে সার্টিফিকেট যোগাড় করে পুলিশকে তা দেখিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করবারও চেষ্টা করেছে। এদের নিজেদের মধ্যে অপরের অবোধ্য বহু সঙ্কেত, খেউড় ও পরিভাষার প্রচলন আছে। এই সকল প্রাচীন শব্দ সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে।

যাদুয়া ব্রাহ্মণ

যাদুয়া বা যাদুকর ব্রাহ্মণ প্রাচীন পুতচরিত্র ব্রাহ্মণ জাতিরই অধঃ-পতিত বংশধর। এরা মজাফারপুর ও পাটনা জেলায় অধিক সংখ্যায় বাস করে। এরা নামকরা ভ্রাম্যমান প্রবঞ্চক দল, তবে এক এক দলে চার বা পাঁচজনের অধিক লোক থাকে না। এদের একজন সাধুর এবং অপর কয়জন তার চেলার বেশে কোনও এক গ্রামে প্রবেশ করে। এর পর এদের আর একজন ধনী জমীদারের বা ব্যবসায়ীর বেশে ঐ গ্রামে এসে ঐ ত্রিকালজ্ঞ সাধুর সম্বন্ধে খোঁজ খবর করে গ্রামবাসীর বিশ্বাস উৎপাদন করে। সাধু এই সুযোগে গ্রামবাসীদের বুঝায় যে তিনি রূপাকে সোনা

করে দিতে সক্ষম। কোনও এক লোভী গ্রামবাসী এই সাধুকে সাদরে তার গৃহে অভ্যর্থনা করে আনলে তিনি বাসের জন্য একটি অন্ধকার ঘরই বেছে নেন। এই সময় সাধু নিজে অন্তর্ধান হয়ে বা লক্ষ্মীকে দেখিয়ে তাদের চমৎকৃত করে দেয়। কিরূপ চালাকীর সহিত তিনি তা করেন সে কথা পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে। এর পর "দোনাখেল" পদ্ধতিতে তারা নিরীহ গ্রামবাসীদের সম্পত্তি অপহরণ করে সরে পড়ে। এই দোনাখেল পদ্ধতি সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে।

এই যাদুয়া ব্রাহ্মণরা কখনও কাশী, পুরী, দেওঘর প্রভৃতি ধর্ম্মস্থানের পাণ্ডা রূপেও নিজেদের পরিচিত করে আসর জমিয়েছে।

আমি অনুসন্ধানে জেনেছি যে, প্রাক্-মোসলেম ভারতের হিন্দু রাঁজা ও সম্রাটদের পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ যোগী-চর (Acetic Spies) রূপে এরা বংশানুক্রমে দেশে দেশে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করত। এই পেশায় তারা পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত হতো। হিন্দু রাজাদের পতনের পর এরা অধঃপতিত হয়।

যোগী পাঠান

এদের জন্মবৃত্তান্ত অজ্ঞাত, তবে ধর্ম্মে এরা মুসলমান। যুক্তপ্রদেশের এটা, বুদাঁও ও আলিগড় অঞ্চলে এরা সাধারণত বাস করে। এদের নামের পরিশেষে এরা 'খান' শব্দটী ব্যবহার করে।

অপকর্ম্মের জন্য অভিযানে বার হবার পূর্ব্বে এরা ভূমির উপর একটী উঁচু খোঁটা পুঁতে। কোনও এক পক্ষী তার উপর এসে বসে পরে যেদিকে সেটী প্রস্থান করে মাত্র সেই দিকেই এরা অপকর্ম্মের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কোনও এক স্থানে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে

ফকিরের বেশে মসজিদে এরা আশ্রয় গ্রহণ করে। সাধারণত এরা 'হারানো আত্মীয়' পদ্ধতিতে লোক ঠকায়। এই বিশেষ অপপদ্ধতি সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে।

তুঁতিয়া মুসলমান

তুঁতিয়া বা তুঁতে মুসলমান ধর্ম্মান্তরিত হিন্দু। এরা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান ও কলিকাতার বেলেঘাটায় বাস করে। এরা পূর্ব্বে তুঁত চাষী ছিল। এক্ষণে এরা দিনমজুর ও চাষবাসের কাজ করে। কিন্তু এদের একটা দল অপরাধ দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই দলটী কুখ্যাত ডাকাত দল। ডাকাতির জন্ম নির্দ্ধারিত রাত্রে কোনও এক স্থানে সমবেত হয়ে এরা মদ্যপান ও থাওয়া দাওয়া করে। ডাকাতির সময় এদের একজন পাঁচিল টপ্‌কে বাড়ী ঢুকে ভিতর হতে সদর দুয়ারের খিল খুলে অপরাপর সাথীদের গৃহ প্রবেশের পথ সুগম করে দেয়। কখনও কখনও এরা অপর কোনও স্থান হতে ঢেঁকি তুলে এনে উহার সাহায্যেও দুয়ার ভেঙে ফেলেছে। বহুক্ষেত্রে এরা বাড়ীর লোকজনদের বেঁধে রেখেছে এবং যাতে তাদের চীৎকার শুনে প্রতিবেশীরা সাহায্যার্থে আসতে না পারে তার জন্ম তাদের বাড়ীর দুয়ারের কড়াও দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছে। তারা কেরোসিন সিক্ত বস্ত্রের মশাল এবং যষ্ঠি ব্যবহার করলেও অযথা বা নিষ্প্রয়োজনে কাউকে আঘাত হানে নি।

এরা কেবলমাত্র অর্থ, জহরত প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যাদিই গ্রহণ করে। নারী বা শিশুদের গাত্র হতেও এরা অলঙ্কার অপহরণ করেছে। এর পর কোনও এক পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত স্থানে এসে এরা অপহৃত দ্রব্য নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। পলায়নের প্রয়োজন হলে এদের নেতা 'মাছি ঘন জাল গুট' শব্দে সাথীদের ত্বরায় স্থান ত্যাগ করতে বলে। এ'ছাড়া

এরাও মঘেয়া ডোমদের ন্যায় পরস্পরের অবস্থিতি পরস্পরকে জানিয়ে দেবার জন্য শিয়ালদের অনুকরণে ডাক ডাকে।

সাধারণত এরা বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, যশোহর, নদীয়া এবং ২৪ পরগণা জেলায় ডাকাতির কার্য্য করে থাকে। অধুনাকালে এদের অপকর্ম্মের সুযোগ সুবিধা কম হওয়ায় এরা বিলুপ্তির পথে এগিয়ে এসেছে।

পাশি

পাশিরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। রায়বেরিলি, বড়াবাঁকি, মির্জ্জাপুর, আজামগড়, ফৈজাবাদ, এলাহাবাদ ও জনপুর প্রভৃতি স্থানের বাসিন্দা। এদের কলিকাতার তিলজলা অঞ্চলে ও বাংলার অন্যান্য স্থানেও দেখা যায়। 'পাশি' শব্দ হতে গাছে উঠা দড়ি বুঝা যায়, পদদ্বয়ে এই দড়ি আবদ্ধ করে এরা গাছে উঠে। এরা তাল গাছে পাশির সাহায্যে উঠে পূর্ব্বে তাড়ী বানাতো। এক্ষণে এদের অনেকেই কৃষি ও শ্রম কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশে এদের কেউ কেউ মাঝি-মাল্লার কাজ করে। কাউকে কাউকে শিল্প অঞ্চলেও দেখা যায়।

পাশিদের একদল একাধারে তস্কর এবং সিঁদেল ও সাধারণ চোর। রাজপথেও এরা রাহাজানি করেছে। প্রতিরোধ করলে এরা প্রতি আক্রমণও করেছে। বেলিয়া, জনপুর ও মির্জ্জাপুরের পাশিরা যে কোনও তালা ভেঙে ফেলতে সক্ষম। এরা বাক্স প্যাঁটরা ঘরে না ভেঙে উহা তুলে বাইরের এক স্থানে তা ভাঙে। গৃহে প্রবেশ করে এরা কখনও আলো জ্বালায় না। এরা কয়েক মুঠি চা'ল সঙ্গে রাখে। ঐ চা'ল অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে উহার শব্দ শুনে এরা বুঝে নেয় বাক্স প্যাঁটরা এবং ঘটি-বাটী প্রভৃতি কাঁসার বাসন কোথায় আছে।

পাশিরা স্বজাতীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কখনও কোনও অপরাধ করে নি। সাধারণত এরা কলিকাতার চতুর্দ্দিকে, বর্দ্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, যশোহর, রঙ্গপুর, ফরিদপুর, ঢাকা ও মৈমনসিং প্রভৃতি জেলায় অপকর্ম্ম করে।

মুচীরা ২৪পরগণা, নদীয়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, খুলনা, যশোহর ও পাবনা জেলায় বাস করে এবং ঐ সকল জেলায় ও উহার চতুষ্পার্শ্বে অপকর্ম্ম করে। এরা গরীবদের কুটীরের ঝাঁপের দড়ি কেটে ঘরে ঢুকে এবং লাঙ্গলের ফালা প্রভৃতির সাহায্যে বাক্স প্যাঁটরা ভাঙে। ডাকাতি কালে এরা লাঠি, তরবারি, বড় ছুরী ও ছোরা প্রভৃতিও ব্যবহার করে থাকে। বসিরহাট অঞ্চলের মুচীরা বাঁশের কোস্তা বগলে চাদর ঢাকা দিয়ে বহন করে। এরা বাড়ীর লোকদের হাত ও পা বেঁধে তাদের বেদম প্রহার করে। কখনও কখনও এরা জলন্ত মশাল মুখে চোখেও গুঁজে দিয়েছে। এদের কেউ কেউ গরু প্রভৃতিকে কলাপাতায় করে আর্সিনিক খাইয়ে চামড়া আহরণের উদ্দেশ্যে তাদের নিহত করেছে। এরাও নিজেদের মধ্যে অপরের অবোধ্য বহু খেউড় বা পরিভাষা ব্যবহার করে।

মুচীরা দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—বড় ভগীয়া ও ছোট ভগীয়া। এই ছোট ভগীয়ারা উপরোক্ত অপরাধ করার জন্যে স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতি রূপে কুখ্যাত। এদের সামাজিক আচার ব্যবহার হতে এই দুই উপশ্রেণীর প্রভেদ আমরা বুঝতে পারি।

ছোট ভগীয়ারা গো মাংস ও মুর্গী প্রভৃতি ভক্ষণ করে, কিন্তু বড় ভগীয়ারা উহা কখনও স্পর্শও করে নি। ছোট ভগীয়ারা নিজেদের

গোষ্ঠীদের দ্বারাই ধর্ম্ম কর্ম্ম করায় এবং এদের প্রার্থনার বিশেষ কোনও রীতি নেই। কিন্তু বড় ভগীয়ারা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ধর্ম্ম কার্য্যে নিযুক্ত করে এবং মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা উপাসনা করে। ছোট ভগীয়ারা গরু প্রভৃতির চামড়া ছাড়িয়ে তাদের দামড়া করে; চামড়া তৈরী করে; জুতা তৈরী করে; ঢাকীর কাজ করে বা বাজনা বাজিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে থাকে; কিন্তু বড় ভগীয়ারা চামড়ার চালানি ব্যবসা করলেও সাধারণতঃ তারা কৃষিকর্ম্ম, ঝুড়ী-চুব্ড়ী প্রভৃতি তৈরি করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে থাকে। সমাজে ছোট ভগীয়াদের মানে নীচু মনে করা হয়, এইজন্য বড়-ভগীয়ারা তাদের সহিত খাওয়া দাওয়া বা বিবাহ কার্য্যাদি কখনও করে না, যদিও উভয় শাখাই একই জাতি হতে উদ্ভূত বলে আমি মনে করি।

কারয়াল নাট

কারয়াল নাটেরা যাযাবর বা জিপসী জাতি। কেউ কেউ বলেন পূর্ব্বে এরা রায়রেরিলি ও গোণ্ডা দেশের অধিবাসী ছিল। বাংলা দেশের কারয়াল নাটেরা দাবী করে যে পূর্ব্বে আরা জেলার ভোজপুরে তাদের বাসস্থান ছিল। ওই জাতি পাঁচটী উপজাতিতে বিভক্ত, যথা,—হাবুরা, সানসী, সানচিরা, ব্রজবাসী এবং গুলগুলি। এ'ছাড়া কানজার, কাজারহাটি এবং ভাটু উপজাতিও ঐ জাতি হতেই উদ্ভূত ব'লে মনে হয়।

এরা নিম্নশ্রেণীর দেশবালী-হিন্দুদের ন্যায় দেখতে, জাতিতে ও ধর্ম্মে এরা হিন্দুই এবং এরা কালীপূজাও করে। এ'ছাড়া দেও ও কুশমিনা নামক এদের দুইটী নিজস্ব দেবতাও আছে। এদের ক্ষুদ্র একটী অংশ মোসলেমধর্ম্মী হওয়ায় মোসলেম নাম ব্যবহার করে। এরা মৎস্য ভক্ষণ না করলেও প্রায় সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ করে। মদও অতি মাত্রায় পান করে থাকে। এদের মেয়েরা লম্বা ঘাঘরা পরে

এবং তার মধ্যে চোরাই দ্রব্য লুকিয়ে রাখে। এরা এক প্রকার হিন্দিতে কথাবার্ত্তা কয়।

এরা ২৫ থেকে ৩০ জনের এক একটী দলে যত্র তত্র পরিভ্রমণ করে। তবে এদের দলে মেয়ের সংখ্যাই অধিক। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে একজন মেয়ের কর্ত্তৃত্বেই দলটী পরিচালিত হয়। এরা খচ্চর, টাট্টু, কুকুর প্রভৃতি সঙ্গে রাখে। অপকর্ম্মের সুবিধার জন্য এদের পুরুষেরা দূরে দূরে চলে। এরা একদল হতে অপর দলে যোগ দেয় এবং এই সুযোগে নিজেদের নামও বদলে নেয়।

মধ্যে মধ্যে ছাগল ও খচ্চর ব্যবসায়ী রূপে পরিচয় দিলেও এরা সাধারণতঃ ভিক্ষা করে বেড়ায়। এদের মেয়েরা নাচ-গান করে ও কখনও কখনও বেশ্যাবৃত্তি করে পয়সা উপার্জ্জন করেছে। কিন্তু প্রায়শঃ ক্ষেত্রে বিবিধ অপকর্ম্মই এদের প্রধান উপজীবিকা। ছাগল ও বাসন চুরিতে এরা সিদ্ধহস্ত। তবে এরা সরল-চুরিতে অভ্যস্ত, কখনও সিঁদ কাটে না। এদের মেয়েরাই চুরি চামারীতে অধিক পাকাপোক্ত। দশ বারজন মেয়ে গৃহস্থদের উঠানে নাচ-গানে ভুলিয়ে রাখে এবং সেই সুযোগে এদের মধ্য হতে দুই একজন ঘরে ঢুকে অলক্ষ্যে চুরি করে দ্রব্যাদি ঘাগরার মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে।

এরা গ্রামবাসীর শস্যাদি চুরি করে, এমন কি তা তাদের পালিত পশুদের দিয়ে খাইয়েও দেয়। বাধা পেলে এরা মারধর করে এবং স্ত্রী পুরুষে উলঙ্গ হয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী ও গালিগালাজও করে।

ডেকারু

ডেকারু 'দল পূর্ব্বে মানভূমে বাস করতো, কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহের পর এরা সাঁওতাল পরগণায় বসতি স্থাপন করে। এরা

কামারের ব্যবসা করে, সম্ভবতঃ মানভূমের ডেকারো কামারদের এরা কুটুম্ব। এই ডোকরোদের এক্ষণে বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার সীমানায় কয়েকটা গ্রামে দেখা যায় মাত্র। এরা কর্ম্মকার হলেও এদের কেউ কেউ চাষী ও সাপুড়ে। এদের দেখতে বাংলা দেশের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের ন্যায় এবং এরা বাংলাতেই কথাবার্ত্তা কয়। এদের বর্ণ কৃষ্ণ, চক্ষু তীক্ষ্ণ, দাড়ী গোঁফ কামানো এবং নাসিকাদ্বয় ছিদ্রকৃত। এরা দুই প্রস্থ কাঠের বীচির মালা গলায় পরে এবং কেউ কেউ সামনের দুই একটী দাঁত সোনা বা রূপা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখে। এদের স্ত্রীলোকেরা হাতের চেটোর পিছনে চারটি করে এবং হাত ও বাহুতে দুইটী করে উল্কি চিহ্ন ধারণ করে। এরা এদের মুখে চিবুকে, চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে এবং কখন কখন নাকে উল্কি চিহ্ন ধারণ করেছে। এদের মেয়েরা নাকের দুই পাশে ও মধ্য স্থলে গিল্টি করা গহনা এবং হাতে চুড়ী ও পিতলের বালাও ধারণ করে।

এদের পুরুষরা সুদক্ষ সাধারণ ও সিঁদেল চোর এবং মেয়েরা পকেটমার ও ছিঁচকে চোর। তবে এরা সিঁদ না কেটে তালা ভেঙে বা শিকলের স্থুরশ উপড়ে চুরী করে। এরা ভারি দ্রব্য কদাচ গ্রহণ করে। এরা খবর না নিয়ে গমনের পথে সুযোগ মত তিন চারটী বাড়ীতে পর পর হানা দিয়ে থাকে। প্রথমে রান্না ঘরে ঢুকে রান্না-বান্না যা থাকে তা খেয়ে নেয়। বাসনই বেশী চুরী করে এবং যাবার আগে বাড়ীতে বা উহার নিকটে বিষ্ঠা ত্যাগ করে যায়। এরা সাধারণতঃ খিড়কী দোর খুলে গৃহে ঢুকে। সুবিধা না থাকলে পাঁচিল টপ্‌কায়। কিন্তু প্রতি-বল-প্রকাশ এরা কখনও করে নি।

বাক্সো বিক্রয়ের অজুহাতে এরা জন-বহুল হাট বাজারে এসে দোকান হতে তুলে, শিশুর গাত্র হতে কিংবা স্ত্রীলোকদের আঁচলের খুঁট খুলে দ্রব্য

অলঙ্কার ও অর্থাদি অপহরণ করতে অভ্যস্ত। এরা চুরীর পর তৎক্ষণাৎ চোরাই দ্রব্য কোনও এক সাথী মারফৎ পাচার করে দেয়। ধরা পড়লে এরা নিজেদের বা সাথীদের নাম কথনও বলতে চায় না। অপরাধও এরা কখনও স্বীকার করে নি। এরা চুরির পর চোরাই দ্রব্য কিছু কাল পুকুরের নীচে বা মাটির তলায় পুতে রাখে। পরে সুবিধা মত তা তুলে ঝুড়ী করে সরিয়ে দেয়। নগদ টাকা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য স্থানীয় কোনও বামাল গ্রাহকের নিকট এরা বিক্রয় করে দিয়ে থাকে।

এই দল, সাধারণতঃ হুগলি, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় অপকর্ম্মরত আছে। বাঁকুড়ার কামারিয়া জাতীয় কামারদের সহিত এদের নিকট সম্বন্ধ। এই কামারিয়াদেরও কেউ কেউ সাধারণ ও সিঁদেল চুরীতে লিপ্ত থাকে।

সের শা বেদিয়া মুসলমান

সের শা বেদিয়া দলের পূর্ব্ব পুরুষরা ষোড়শ শতাব্দীতে নৃপতি সের শায় সহিত বাংলা দেশে আসে। হুমায়ুন কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হওয়ার পর এরা বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে থেকে যায় এবং এরা মালদা এবং মুর্শীদাবাদ জেলার গঙ্গার উভয় তীরে সের-শা-বাদ পরগণায় বাস করে। পরবর্ত্তি কালে স্থানীয় মুসলমান মেয়েদের বিবাহাদি করে এরা বংশ বৃদ্ধি করেছে। এক্ষণে এরা রাজসাহীর গোদাগরি হতে গঙ্গার উভর তীরে রাজমহল ও সাঁওতাল পরগণাতে এবং পুর্ণিয়া ও দিনাজপুরেও বসতি স্থাপন করেছে। এদের মধ্যে যারা গঙ্গার দৈরিতে বাস করে তাদের বলা হয় দৈরা মুসলমান। এরা ওহাবিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান।

এই দল সাধারণতঃ দীর্ঘদেহী ও সবলকায় হয়ে থাকে। এদের মেয়েরা ফর্সা ও সবল, কিন্তু এরা পর্দা মানে না। এরা পুরুষদের

চাষবাস কার্য্যে সহায়তাও করে। এদের কেউ কেউ দিন মজুর, কেউ কেউ ছুতার মিস্ত্রি। গরুর গাড়ীর চাকা তৈরীতে এরা পারদর্শী। এরা সকলেই যে অপরাধী তা'ও নয়। এদের বহু ব্যক্তি শিক্ষিত ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা দুর্দ্ধর্ষ এবং সামান্য কারণেও খুন খারাপি করে। এরা চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, সিঁদেল ও সাধারণ চুরি প্রভৃতিতে পারদর্শী। এরা অপকার্য্যে সিঁদকাটী ও খুরপী ব্যবহার করে এবং ডাকাতির সময় অকারণে মানুষকে আঘাত হানে। এরা অপকর্ম্মে সাঁওতালদেরও সঙ্গে নিয়েছে। তবে গ্রামের নিকটে এরা অপকর্ম্ম না করে অপকর্ম্মের জন্য দুই তিন দিনের পথ অতিক্রম করে দূরদেশে গিয়েছে। এরা গ্রামের মোড়লদের মারফৎ চোরাই ও লুঠের দ্রব্য পাচার করে। এই মোড়লদের আদেশ এদের নিকট সর্ব্বদাই গ্রহণীয় ও মাননীয়।

এরা নিজেদের পূর্ব্ব পুরুষদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন এবং এইজন্য এরা গর্ব্বান্বিত। এদের স্বভাব চরিত্র আক্রমণকারী বিদেশী সৈন্যদেরই অনুরূপ। পূর্ব্বপুরুষদের স্বভাব চরিত্র যে বহুল পরিমানে বংশগত হয় তা এরা প্রমাণ করে। তবে বংশানুক্রমে ঐতিহ্য রক্ষাও এইজন্য বহুলাংশে দায়ী।

সান্দার

সান্দাররা যাযাবর ও জলদস্যু জাতি। ঢাকা, মৈমনসিংহ, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া ও ফরিদপুরের নদীবহুল স্থানে বৎসরের অধিকাংশ কাল স্ত্রী-পুত্র সহ এরা এক ঝাঁক নৌকায় বাস করে। নদীসমূহের সংযোগ স্থলে এদের ত্রিশটীরও অধিক নৌকার একত্র সমাবেশ দেখা গিয়েছে। শীতকালে এরা প্রায়ই তীরে নেমে ছোট ছোট সাময়িক

আচ্ছাদন তৈরী করে বাস করে। এরা ধর্ম্মে এখন মুসলমান। এদের মেয়েরা নির্ব্বিচার যৌন-মিলনে অভ্যস্ত।

এইরূপ জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে এরা সানা তাঁত তৈরী করে বা তাঁতির কাজ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করত। এদের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে গ্রামে সস্তা মনোহারী দ্রব্য বিক্রয় করে এবং পুরুষেরা ছিপের সাহায্যে নিজেদের জন্য মাছ ধরে।

এরা ১২ হতে ১৪ জন একত্রে ছিপ নৌকায় বহুদূর দ্রুত গতিতে এসে একই সময় দুই তিনটি যাত্রী নৌকা লুণ্ঠন করে থাকে। এরা নৌকার নিকটে নৌকা এনে 'তামাক দেবে গো ; আগুন দেবে গো' প্রভৃতি স্তোক বাক্য বলে আরও এগিয়ে এসে কাজ হাসিল করে। কেউ বাধা দিলে এরা হত্যা করতে পর্য্যন্ত পিছুপা হয় না।

সান্দাররা সাধারণতঃ কেবল মাত্র নগদ টাকা গ্রহণ করাই পছন্দ করে। ডাকাতিতে অংশ গ্রহণকারী দস্যুরা লুঠের ত্রি-চতুর্থাংশ হিস্যা পায় এবং উহার এক-চতুর্থাংশ হিস্যা তাদের দলের অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। টাকা ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য গ্রহণ করলে তাহা এরা বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল বাসী বাসিয়া ও বেদিয়া প্রভৃতি কামারদের মারফৎ বিক্রয় করে।

সানুর

সানুররা নিজেদের সানুর ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু এরা প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণদের বংশধর কি'না তাতে সন্দেহ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, এরা বারয়ার জাতির একটী শাখা কিংবা ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির মিশ্রনে সৃষ্ট। এরা বুন্দেলখণ্ড, ঝান্সী ও বিলাসপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করে। এদের একটী দলের নাম চন্দ্রবেদী। চন্দ্রবেদীরা

চামার ছাড়া সকল জাতীয় হিন্দুদেরই স্বসম্প্রদায়ে গ্রহণ করে, এমন কি মোসলেমদেরও। দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদীর ন্যায় চন্দ্রবেদী অনুরূপ অর্থ বহন করে কি'না তা অনুসন্ধানের। ব্রাহ্মণদের চন্দ্রা নামক কোনও শাস্ত্র বা বেদ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কি'না তা জানা যায় নি।

এই দল মেলায়, স্নানের ঘাটে, রেল ষ্টেশনে এবং চলন্ত বাষ্পায়নে অপকর্ম্ম করে। কিন্তু অপকর্ম্মে এরা কখনও স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নেয় নি। এদের অপকর্ম্ম দুই এক ক্ষেত্রে বারয়ার ও ভামতাদের অনুরূপ। এরা দুই হতে কুড়িজন লোক সহ অপকর্ম্মে বার হয়। এদের দলের নেতাকে এরা বলে মুখিয়া। মুখ্য হতে সম্ভবতঃ মুখিয়া শব্দের উৎপত্তি। মুখিয়ারা নিজেরা স্বয়ং অপকর্ম্মে অংশ গ্রহণ করে না। মুখিয়ারা তাদের অধীন উপনেতা 'উপারদের' অধীনে ছাও নামক বালকদের অপকর্ম্মে প্রেরণ করে।

এরা স্নানের ঘাটে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অতর্কিতে স্পর্শ করে ক্ষমা চেয়ে বলে, 'আমরা গরীব মেথর, আপনাদের ছুঁয়ে ফেললাম,' ইত্যাদি। এর ফলে ঐ সকল ভদ্রলোক দ্রব্যাদি ঘাটে রেখে পুনরায় স্নান করতে জলে নামে। এই সুযোগে পাড় হতে তাদের দ্রব্যাদি নিয়ে এরা সরে পড়ে। কোনও স্ত্রীলোককে ঘাটের দ্রব্যাদির উপর পাহারারত দেখলে এদের 'উপারদার' বা উপনেতা বা উপসর্দ্দার তার দিকে মুখ করে এমন ভাবে প্রস্রাব করতে বসে যাতে স্ত্রীলোকটি অন্য দিকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে একজন 'ছাও' তাদের দ্রব্যাদি নিয়ে সরে পড়ে। চলন্ত ট্রেণে উঠে এরা অপহৃত দ্রব্যাদি বেঞ্চির পাটাতনের তলায় আঠা বা লেই বা মোম দিয়ে সেঁটে রাখে, যাতে মালিকরা উহার সন্ধান না পেতে পারে।

ধারি

ধারিগণ মুঙ্গের, পুর্ণিয়া, ভাগলপুর, গয়া, পাটনা, সাহাবাদ, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি জিলার অধিবাসী। সম্ভবতঃ এরা দোসাদ জাতির সমগোত্রীয়। এরা ধর্ম্মে হিন্দু হলেও সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর সহিত সর্প পূজাও করে। এদের মতে, সিঁদমারি বা সিঁদকাটি স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা সৃষ্টি করে তাদের দান করেছেন। এইজন্য এরা প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা বা দশহরার দিন লৌহ-চৌর্য্য-যন্ত্রটির পূজা করে। এদের বিশ্বাস, কোনও নারী এই যন্ত্র স্পর্শ করলে উহা অপবিত্র হয় এবং এই মহাপাতকের ফলে ঐ নারীর কুষ্ঠরোগ জন্মে। এরা ভালো ও শুভদিন দেখে তবে পবিত্র সিঁদকাটি তৈরী করে থাকে।

এরা ব্যবহারিক জীবনে সাবেকী ধুতি ও চাদর ব্যবহার করে, কিন্তু অপকর্ম্মের জন্য অভিযানের সময় এরা জামা বা কোর্ত্তা ও পাগড়ী পরিধান করে। সম্ভবতঃ উচ্চবংশীয় রূপে পরিচিত হবার জন্যই তাদের এই বেশ। কখন কখন এরা তীর্থযাত্রী বলেও পরিচয় দেয়। এরা শক্তিমান এবং ভ্রমণে অভ্যস্ত। এরা ভালো লাঠিয়াল হওয়ায় জমীদাররা এদের সাহায্য নেয়।

এরা সাত ব্যক্তি এক একটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে অপকর্ম্মে নিযুক্ত হয়। এই কার্য্যে এরা দেওয়ালে সিঁদ (গর্ত্ত) করে থাকে ; বাধা পেলে লাঠি ব্যবহার করে। সাধারণতঃ এরা বাসভূমির নিকটেই অপকর্ম্ম করে, তবে দূরদেশেও যেতে দেখা যায়। অপকর্ম্মের জন্য এদের পূর্ব্ববঙ্গে পর্য্যন্ত ধাওয়া করতে দেখা গিয়েছে। অভিযানের সময় এদের দলের সাত ব্যক্তি সোম, মঙ্গল প্রভৃতি দিনের সাতটি নাম গ্রহণ করে। সাংঘাতিক আঘাত হানবার প্রয়োজন হলে যে দিনে অপকর্ম্ম করা হচ্ছে, সেই দিনের

নাম যে গ্রহণ করেছে সেই ব্যক্তিকেই তা করতে হয়। অধিক অপকর্ম্মে সক্ষম হলে এরা শূকর মেরে ও মদ খেয়ে উৎসব করে।

এরা অপকর্ম্মে অনুকূল ভালো দিন ব্রাহ্মণ দ্বারা দেখিয়ে বা গুণিয়ে তবে বার হয়। এরা অমাবস্যার গভীর রাত্রে অপরাধ করে এবং একই গ্রামে একই রাত্রে বহু বাড়ীতে হানা দেয়। এরা গ্রামের জায়গীরদারগণের সাহায্যে চোরাই দ্রব্যাদি পাচার করে।

বারয়ার

সাধারণ ভাষায় চোরকেই বারয়ার বলা হয়। তবে বারয়ার নামে জাতিও আছে। এরা কুর্ম্মি জাতির একটী শাখা। কিন্তু অধুনা দৃষ্ট বারয়ারগণ ব্রাহ্মণ হতে চামার পর্য্যন্ত সকল জাতির বালকদেরই নিজেদের দলে ভিড়িয়ে বা মিশিয়ে নেয়। এরা সুলতানপুর, গোন্দা, হারদোই অঞ্চলের অধিবাসী। এদের স্বাভাবিক পরিচ্ছদ—কোর্ত্তা, মির্জ্জাই, ধুতি, চাদর ও টুপি। কিন্তু প্রয়োজনমত এরা তীর্থযাত্রী, পূজারী, ব্রাহ্মণ, মহাজন, সিপাহী ও ব্যবসায়ীর বেশও ধারণ করে। এরা ষ্টিমার ঘাট, রেল ষ্টেশন, স্নানের ঘাট, মেলা ও তীর্থস্থানে এসে চুরি-চামারীতে লিপ্ত হয়।

এরা বাংলাদেশের দূর দূরান্তর অঞ্চলে এসেও নিরালা স্থান দেখে আস্তানা গাড়ে। এর পর দুই বা তিনজনের দলে বিভক্ত হয়ে বহুদূরে চুরি করতে যায়, যাতে তাদের কেউ সন্দেহ না করতে পারে। ষ্টেশনে বা বিশ্রামাগারে এসে দ্রব্যাদির উপর এরা একটী পরিষ্কার চাদর শুকাবার জন্য বা অন্য কোনও অজুহাতে বিছিয়ে দিয়ে পরে উহা তুলে নেবার সময় ঐ দ্রব্যটিও তার সঙ্গে তুলে নিয়েছে। ট্রেণ হতে এরা ঘুমন্ত বা অন্যমনস্ক যাত্রীদের মালপত্র বাইরে ফেলে দিয়েছে যাতে পরে তারা তা কুড়িয়ে নিতে পারে।

এরা সাত হতে চৌদ্দ বৎসরের বালকদের চৌর্য্য কার্য্যে নিযুক্ত করে। এই বালকরা ধরা পড়লে এদের মারধর করে এরা মুক্ত করে আনে। তীর্থস্থানে তীর্থযাত্রী রূপে এবং গৃহস্থ বাড়ীতে ব্রাহ্মণী রূপে এসে এদের স্ত্রীলোকেরাও চুরি চামারি করেছে। ধরা পড়লে এরা নিজেদের কুর্ম্মি বলে পরিচয় দেয়। বারয়ারদলের লোক বলে কখনও স্বীকার করে না।

তাদের নিজস্ব একপ্রকার ভাষা ও 'সাইন' আছে। দলের কোনও লোককে ডাকতে হলে এরা নানা ভঙ্গিতে নিশানের ন্যায় কাপড় নাড়ে। সাহায্য দরকার হলে এরা নিজেদের গণ্ডে হাতের আঙুল ন্যস্ত করে। আঙুলের সংখ্যা অনুযায়ী দলের লোকেরা বুঝে নেয় কয় ব্যক্তির সাহায্য তার দরকার। জনবহুল মেলা প্রভৃতিতে এরা এইরূপে কথা চালাচালি করে। সমগ্র হস্ত গলদেশে রাখলে দলের লোক বুঝে চুরির উপযুক্ত সময় এসেছে।

এরা বনগাঁ, রাণাঘাট, খড়্গপুর, জগন্নাথগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, খুলনা, লালগোলাহাট, চাঁদপুর, দামুকাদিয়া, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অপকর্ম্ম করে বেড়ায়।

যশোহর-ব্যাধ

ব্যাধ বলতে শিকারী বুঝায়। বাংলাদেশে সান্দার, বেনে প্রভৃতিরাও ব্যাধ। যশোহরে ব্যাধেরা কিন্তু শুধু যশোহরে বাস করে না, এরা ২৪ পরগণারও অধিবাসী। পূর্ব্বকালে যশোহর জিলা বলতে ২৪ পরগণা, যশোহর ও খুলনাও বুঝাতো। এইজন্য এদের এখনও যশোহর-ব্যাধ বলে। এরা কিন্তু নিজেদের ব্যাধ না বলে শিকারী বলে। এরা কালীপূজা করে এবং শ্রাদ্ধ-শান্তিও করে, কিন্তু এদের মধ্যে নিকা-বিবাহও

প্রচলিত আছে। এদের ধর্ম্মকর্ম্ম পূজা পার্ব্বণ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি দ্বারা কৃত হয়।

এরা সাধারণ এবং সিঁদেল উভয় চুরিতেই অভ্যস্ত। এরা শস্য চুরি করতেই বেশী ভালবাসে। এরা মাটির ও বাঁশের দেওয়ালে সিঁদ দিতে সিদ্ধ হস্ত। এদের স্বভাব ভীতু প্রকৃতির। বাধা পেলে এরা আঘাত হানে না। ডাকাতিতে লিপ্ত হতে এদের কদাচ দেখা গিয়েছে। এরা ত্বরিত গতিতে স্ববাটী হতে বহুদূরে চোরাই মাল লুকিয়ে রাখে। এদের বামাল গ্রাহকরা কলিকাতা কিংবা এদেরই গ্রামের নিকটে থাকে। এরা সাধারণতঃ বাসস্থানের নিকটস্থ স্থান সমূহে হানা দিলেও এদের কেউ কেউ কলিকাতা, খুলনা, নদীয়া ও হুগলী জেলাতেও অপকর্ম্ম করে। কখনও কখনও এরা স্থানীয় অপরাধীদেরও অপকর্ম্মে সাহায্য গ্রহণ করেছে। এদের নিজস্ব খেউড় আছে, যথা—মাঝি অর্থে সিঁদকাটি, বেলি অর্থে চুরি, কাকারো অর্থে পুলিশ, চাপোটৈক অর্থে লুকানো ইত্যাদি।

ছত্রিশগড় চামার

এরা বিলাসপুর প্রভৃতি স্থানের বাসিন্দা। এরা দলে দলে বাঙলায় এসে ডক, রেলওয়ে, ইঁটখোলা, সরকারী পূর্ত্ত বিভাগ প্রভৃতিতে মজদুরের কাজ করে। বাংলাদেশে এরা সিঁদেল চুরি, কখনও ডাকাতি এবং সাধারণ ভাবে গবয়াদি চুরি ও তাদের বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে।

এরা অপকর্ম্মের সময় একপ্রকার খড় বা বিচালির পোষাক পরে নেয়। খড় বিচালির পোষাক বা আচ্ছাদন পরে এরা মাঠে এসে গরুর পালের সামনে শুয়ে পড়ে। চরতে চরতে মাঠে খড়ের বাণ্ডিল দেখে গরুরা তা খাবার জন্য এগিয়ে এলে, এরা একটু একটু করে সরে ঐ গরুর পালকে

ঐভাবে প্রলুব্ধ করে এক নিরালা স্থানে নিয়ে আসে। এর পর তারা সুতরী যন্ত্রের সাহায্যে রৌদ্রে শুষ্ক কর্জ্জনী বীচির কাথ প্রভৃতি গরুর মস্তকে, চর্ম্মে বা গুহ্যদেশে প্রবেশ করিয়ে তাদের নিহত করে। এই সুতরী যন্ত্র সম্বন্ধে পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বিচালি বা খড় দিয়ে বোনা আচ্ছাদন বা পোষাক সহ তারা সিঁদ কাটার কাজেও বার হয়। বাটীর মধ্যে হৈ চৈ সুরু হলে এরা ঐ পোষাক তাড়াতাড়ি পরে নিয়ে উঠানের বিচালি বা খড়ের গাদার সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে আত্মগোপন করে। এরা চৌর্য্য কার্য্যের পূর্ব্বাহ্নে প্ল্যান করে নিজেদের মধ্যে কে কখন্ কোন্ কাজ করবে তা পূর্ব্ব হতেই নির্দ্ধারিত করে রাখে। পূর্ব্ব কল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী এদের একজন সিঁদ কাটে, একজন বাহিরে পাহারারত থাকে, একজন বাক্স তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসে, ইত্যাদি। চেপ্টা মুখওয়ালা একটী গোল লৌহ যন্ত্র দ্বারা এরা সিঁদ কাটে বা ভাঙাভাঙি করে। সাধারণত হাটবাজারের দিনে এরা চুরী করে এবং কার কাছে চোরাই দ্রব্য বিক্রয় করবে তা পূর্ব্ব হতেই ঠিক করে রাখে, যাতে চুরি করার পর মুহূর্ত্তেই দ্রব্য তারা পাচার করতে পারে।

ভূমিজ

ভূমিজ দল মানভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরবাসী। এদের মধ্যে যারা ভূমিহীন তারা দিনমজুরের কাজ করে। সাধারণতঃ এই দিনমজুর ভূমিজরাই ডাকাতি কার্য্যে যোগ দেয়। এরা মৃতদেহ প্রথমে দাহ করে পরে তার ছাই নিজবাটীর প্রাঙ্গণে কবর দেয়।

এই দল লাঠি, সড়কি, টাঙ্গি, তরবারি এবং কখনও কখনও বন্দুক সহযোগে মুখোস পরে ডাকাতি করে। ডাকাতির সময়ে এরা

প্রতিআক্রমণকারীদের তাড়াবার জন্যে ঝুলিতে করে পাথরের ও ইঁটের টুকরা আনে। আক্রান্ত গৃহস্থদের উপর অমানুষিক অত্যাচারও করেছে। এরা ভালো করে খবরাখবর সংগ্রহ করে প্ল্যান মাফিক ডাকাতি করে থাকে। জঙ্গল মহলের ভূমিজ বাসভূমির নিকট এবং হুগলী ও বর্দ্ধমান জিলায় অপকর্ম্মে রত আছে। এদের চরেরা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে গৃহস্থ বাটীতে আনাগোনা করে খবরাখবর নেয়।

বাউরিয়া

বাউরিয়া দলের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিল চিতোরের অধিবাসী। চিতোরের পতনের পর ঐখানকার অস্ত্র প্রস্তুতকারী কামাররা এবং আরও অনেকে মোগলের অধীনতা স্বীকার না করে ঐ স্থান ত্যাগ করে ভ্রাম্যমান জাতিতে পরিণত হয়। অপরাপর দল যারা যুদ্ধ ব্যবসায়ী তারা রাণা প্রতাপের সঙ্গে দেশের দূর প্রান্ত থেকে যুদ্ধ চালাতে থাকে। কিন্তু এই বাউরিয়া দলের পূর্ব্বপুরুষবা মোগলদের অধীনতা স্বীকার করে এবং এর ফলে তাদের আচার ব্যবহারও হয়ে যায় ইসলামীয়দের ন্যায়। এদের অনেকে দিল্লীর বাদশাদের নিকটও ঐ সময় কাজকর্ম্ম করেছে। কিন্তু এদের উপযুক্ত সম্মান সেখানে কোনও দিনই দেওয়া হয় নি। এই ভাবে আরও অধঃপতিত হয়ে এদের বহু ব্যক্তির মধ্যে অপরাধ প্রবণতা আশ্রয় করে এবং এর ফলে এদের যোধপুর, মাড়ওয়ার এবং পাঞ্জাবে বিতাড়িত হতে হয়। কিন্তু সেখানেও কেহ এদের আর সমাদর করে নি। পরে এদের জাতীয় ব্যবসা হয়ে উঠে জাল পেতে পাখী ধরা। এরা বারয়া নামক এক লতা দিয়ে জাল তৈরী করে পাখী ধরতো। সম্ভবতঃ এইজন্যই এদের নাম হয়েছে বাউরিয়া।

এরা দিল্লীওয়ালা বাউরিয়া এবং মাড়ওয়ারী বাউরিয়া, এই দুইটী

উপশ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু এদের মূল দলটী বহু বৎসর যাবৎ যাযাবর জাতি রূপে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এক দেশ হতে অপর দেশে ঘুরে বেড়ায়। পরে ফিরে এসে পাঞ্জাবের কয়েকটী পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত স্থানে পুনর্মিলিত হয়ে নিজেদের বিবাদ বিসংবাদ মিটায় এবং বিবাহ কার্য্যাদি সম্পন্ন করে। কিন্তু আজও এরা রাজপুতনাবাসী ব্যবসায়ী দল নামে অভিহিত। এরা ধর্ম্মে দেবী পূজারী হিন্দু হলেও, শূকর, শিয়াল, গোহাড়গিল ভক্ষণ করে এবং স্ত্রী পুরুষে মদ্যপানে অভ্যস্ত। অপরের অবোধ্য এদের নিজস্ব ভাষা আছে কিন্তু বাহিরের লোকের সঙ্গে এরা হিন্দি বা পাঞ্জাবী বলে। এরা এক এক দেশে এক এক জাতি ও গোত্রের পরিচয় দেয়। এমন কি নাম-ধামও বদলে ফেলে। এরা নিজেদের নারিয়াট, গোঁসাই, কর্ম্মকার, ভাট, ব্রাহ্মণ, সাধু প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে জাহির করেছে।

এরা সাধারণতঃ মুদ্রা জালে পারদর্শী, বিশেষ করে নিকেল সিকি। এরা দড়ী, চামড়া, ঝুটা পাথর, কাপ ডিস্ প্রভৃতি বিক্রয়ের ছুতায় গৃহস্থের কুটীরে প্রবেশ করে নিম্ন জাতীয় শিশু-কন্যাদের চুরী করে। কথনও কথনও এরা সোনা বলে পিত্তলও তাদের নিকট বিক্রয় করেছে। এদের প্রতি দলে দুই একজন ধুরন্ধর মুদ্রা জালিয়াত থাকে, কিন্তু মুদ্রা সম্পর্কীয় যন্ত্রপাতি ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি এরা ছাউনিতে না রেখে দূরের জঙ্গলে পুঁতে রাখে। এরা স্ত্রীলোক ও বালকদের মারফৎ এই সকল জালি মুদ্রা মুদির দোকান, মেলায়, তীর্থ স্থানে ও পূজা প্রাঙ্গণে চালিয়ে দিয়ে থাকে। ধরা পড়লে এরা কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলে যে ঐ সকল মুদ্রা তারা ভিক্ষা করে বা দ্রব্য বিক্রয় করে পেয়েছে। এইরূপ অবস্থায় তল্লাস এড়াবার জন্য এদের একজন তৎক্ষণাৎ তাদের ডেরা বা ছাউনিতে এসে খবর দেয়। এবং এইরূপ সংবাদ পাওয়া মাত্র এরা বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে

বিভিন্ন দিকে সরে পড়ে। এরা তপ্ত লৌহ-শলাকা যোগে এদের দেহে বহু মুদ্রাকার চিহ্ন ধারণ করে, কারণ এদের বিশ্বাস যে ঐরূপ চিহ্ন ধারণ করলে এরা নিরোগ হবে ও বিপদ মুক্ত থাকবে। এই সকল চিহ্ন হতে রক্ষিগণ সহজে এদের জাতীয় স্বরূপ নির্ণয় করে থাকেন।

বনফর

বনফরগণ মাল্লা জাতীর একটী শাখা। এরা পাটনা ও মুঙ্গের জিলার অধিবাসী। স্বগ্রামে এরা মাঝি-মাল্লা, চাষবাসের এবং ব্যবসায়ের কাজ করে। বাংলা দেশে এরা ভাগীরথী বক্ষে ডিঙ্গি ও ছোট ছোট নৌকা চালায়। এরা একাধারে চুরি, ছিঁচকা-চুরি ও ডাকাতিতে ওস্তাদ। এরা ছোট নৌকা করে মাল বোঝাই করার অছিলায় বড় নৌকার কাছে এসে মাঝি-মাল্লাদের রাত্রিকালীন নিদ্রার সুযোগে দ্রব্যাদি অপহরণ করে। কখনও কখনও এরা 'তামুক দেবো গো, আগুন দেবো গো' বলে আক্রান্ত নৌকায় উঠে লুটপাট করেছে। প্রয়োজন হলে তবে এরা বল প্রকাশ করে থাকে। কয়েকটী ক্ষেত্রে এরা পুলিশ ও কাসটাম্ কর্ম্মচারী রূপে পরিচয় দিয়ে যাত্রী নৌকা প্রভৃতিকে হাঁক দিয়ে বলেছে যে তারা উহা তল্লাস করবে। এইরূপ বাকচাতুর্য্য দ্বারা এরা যাত্রী ও মালবাহী নৌকা থামিয়ে ডাকাতি কার্য্য করে থাকে। এরা অসাধু মাঝি-মাল্লারদের সামান্য অর্থ দিয়ে তাদের মনিবদের বা নিয়োগ-কর্ত্তাদের দ্রব্যাদি নিজেদের নৌকায় তুলে নিয়ে তা নিজেরা বা বামাল গ্রাহকদের মারফৎ বাজারে বিক্রয় করে থাকে। কখন কখন তারা স্থলে নেমেও ডাকাতি করে এসেছে। সাধারণতঃ এরা কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া ও ২৪ পরগণাতে অপকর্ম্ম করে।

দোসাদ

এদের পূর্ব্বপুরুষরা আগে বিহারবাসী ছিল, পরে এরা নেপাল তরাই-এ ঝিঁঝিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করে। এদের বস্তিকে দোসাদ-টুলি বলা হয়। দ্বারভাঙ্গার মধ্যেয়া দোসাদরা বিতাড়িত হয়ে এইখানে এসে জমা হয়। এই অপরাধীদের উৎপীড়নে একসময় দ্বারভাঙ্গাবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। এই দল হিন্দু ধর্ম্মীয় কালী উপাসক। কালীর বেদী মূলে ছাগ বলি দিয়ে এরা অপকর্ম্মে বার হয়। রাহু নামেও এদের এক দেবতা আছে। সম্প্রতি শৈলেশ নামক চৌকীদার ও চোহরমল নামে এক প্রখ্যাত চোরও তাদের উপাস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা একজন প্রধানের নেতৃত্বাধীনে থাকলেও ঐ প্রধান তাদের সঙ্গে অপকর্ম্মে বার হয় না। এই প্রধান তাদের বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দেয় এবং কোর্টে এদের মামলার তদ্বির করে।

এই দল নেপালী আদিমবাসীদের সহযোগে সিঁদেল চুরি ও ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ করে বেড়ায়। এরা অপকর্ম্মের জন্য পূর্ব্ব দিকেই যায়, পশ্চিমে কখনও যায় না, এমনিই এদের কুসংস্কার। এরা বাসভূমির নিকটেই অপকর্ম্ম করে। কখন কখন রেলযোগে বহু দূর দেশে এসেও ডাকাতি করেছে। এরা অমাবস্যা পড়ার পরই অভিযানে বার হয় এবং বিশেষ একটি আড্ডাস্থলে সমবেত হয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নির্দ্ধারিত স্থানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পথে প্রস্থান করে। অপকর্ম্মের পর কোনও এক পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট তারিখে এদের দলগুলি ফিরে এসে সেই একই আড্ডা স্থানে পুনর্মিলিত হয়। এরা পরিকল্পিতরূপে অপরাধ সমূহ সমাধা করে। এইজন্য এদের বিভিন্ন দলের করণীয় কার্য্য, কার্য্যের বিভিন্ন অংশ এবং সময়-আদি পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এই সকল কার্য্য

আক্রমণকারী সামরিক দলের কায়দানুযায়ীই করা হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ অধুনা দৃষ্ট নাগা সন্ন্যাসিদের ন্যায় এদেরও পূর্ব্বপুরুষরা মারসিনারী কিংবা অনিয়মিত সেনারূপে ব্যবহৃত হতো।

এরা সিঁদ কেটে বা তালা ভেঙে কিংবা ঝাঁপ খুলে অথবা গুর্শ উপড়ে চুরি করে। দেওয়াল হতে টিন উপড়ে নিতেও এরা সিদ্ধহস্ত। লম্বায় বার ইঞ্চি পক্ষ সূচ্যগ্রমুখী এক লৌহযন্ত্র ভাঙাভাঙির কালে তারা ব্যবহার করেছে। এই যন্ত্র তারা কাপড়ের ভিতর লুকিয়ে রাখে, কিন্তু বাধা পেলে যষ্টি ব্যবহার করে। যাতায়াতের পথে এক রাত্রে বহু সিঁদ চুরিতেই লিপ্ত হয়েছে। এদের স্ত্রীলোকেরাও ক্ষেত্র বিশেষে এদের সঙ্গে থেকে স্বগ্রামে চোরাই মাল পাচারে সাহায্য করে।

ডাকাতি কার্য্যে এরা গালপাট্টা পরে ভীষণাকৃতি হয়। অস্ত্র হিসাবে এরা পাথরও ছুঁড়েছে। তবে বাধা না পেলে বা নিষ্প্রয়োজনে এরা কখনও বলপ্রকাশ করে নি। এদের আজকাল ইলেকট্রিক টর্চ্চ সঙ্গে রাখতেও দেখা গিয়েছে। কখন কখন এরা পুলিশ বা টেলিগ্রামের নাম করে গৃহস্থদের দরজা খুলাতে প্ররোচিত করেছে। কোন গৃহস্থের বাড়ী আক্রমণের পূর্ব্বে এরা যুদ্ধ-নিনাদের মত জয় কালী-ই, জয় দুর্গা-আ, প্রভৃতি হেঁকে আক্রমণ করে থাকে। এরা কখন কখন নিজেদের ধালুক, বেওট, লুনিয়া প্রভৃতি জাতিরূপেও পরিচয় দেয়। এদের নিজস্ব বহু খেউড় বা পরিভাষা আছে। এই সকল দুর্ব্বোধ্য শব্দের সাহায্যে এরা কথা চালাচালি করে। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এই সব শব্দ সঙ্কেত সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

এরা দ্বারভাঙ্গা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া ও মজাফরপুর প্রভৃতি জিলায় অপকর্ম্ম করে বেড়ায়।

মিনা

এই দল ভরতপুর, যোধপুর, জয়পুর, বিকানির ও আলোয়ারবাসী। এদের পাঞ্জাবের গুরুগাঁও জিলাতেও দেখা গিয়েছে। এরা মাড়োয়ারী প্রভৃতি রাজপুত ভাষা, হিন্দি ও উর্দ্দুতে কথাবার্ত্তা বলে। এদের চেহারা রাজপুতদের ন্যায় সুঠাম। এরা মস্তক মুণ্ডন করে, তিলক চন্দন পরে ব্রাহ্মণের বেশে সারা ভারতে ভ্রমণ করে কিন্তু এইরূপ ভ্রমণে এরা বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকদের কখনও সঙ্গে নেয়নি। এরা তুকরূপে কর্ত্তিত ছাগের শুষ্ক জিহ্বার কয়েক টুকরা এবং তামাক পাতা প্রভৃতি ঝুলিতে করে সঙ্গে নিয়ে যায়।

এরা বগলী সিঁদ সহযোগে চুরি করতে পাবদর্শী, কখনও দেওয়ালে বৃহদাকার চৌকা ফুটা করে এরা বড় বড় বাক্স বার করে এনেছে। এদের স্বভাব এমন, যে গ্রামে এরা অপকর্ম্মের জন্য প্রবেশ করে সেই গ্রামের প্রান্তে এক বৃক্ষের ডালে এদের কাপড় চোপড়, থালা বাসন ইত্যাদির পুঁটলি বেঁধে উগা ঝুলিয়ে রাখে। এবা অস্ত্ররূপে কুঠার ছুরি, এবং ইট পাটকেল ব্যবহার করে। অন্ধকারে চুরি করার সুবিধার জন্য এরা ছাই-রঙের কাপড় দিয়ে দেহ আবৃত করে রাখে। এদের নিজস্ব খেউড় আছে; যথা—রুমাল অর্থে সিঁদকাটী, ফাজলীটে অর্থে অন্ধকার রাত্র, ইত্যাদি।

মিনকা

এদের পুরুষদের মিনকা এবং স্ত্রীলোকদের মিনকিনি বলা হয়। এরা ধর্ম্মে মুসলমানরূপে পরিচিত। এরা জিন্দা মাদার নামক পীরের পূজা করে, এইজন্য এদের মাদারীও বলে। এরা ধর্ম্মান্তরিত যাযাবর মুসলমান হলেও অন্য মুসলমানদের সহিত মেলামেশা বা বিবাহ আদি না ক'রে

নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বন্য আদিম জাতির ন্যায় এরা নাচিয়ে বাঁদর ও কায়দা দেখাবার দ্রব্যাদি সঙ্গে রাখে। এদের মেয়েরা কর্ম্মপটু এবং উচ্চতায় ও গঠনে মাঝারি। এদের মেয়েরা কাঁচের ও রূপারী গহনা পরে এবং মুখে নাকে, হাতে, উল্কি চিহ্ন ধারণ করে। গলায় মালা ধারণ করা এদের বিশেষত্ব। এরা বাঙালীরূপে চালু হবার জন্য বাঙালী মেয়েদের কায়দায় শাড়ী পরে এবং স্ত্রী-পুরুষে বাঙ্গালী, হিন্দি এবং উড়িয়া অনর্গল বলে। ধর্ম্মে মুসলমান হলেও এদের মেয়েরা হিন্দু নাম গ্রহণ করে থাকে।

এরা বিহার ও উড়িষ্যার গাঙ্গপুর দেশীয় রাজ্যে দৃষ্ট হলেও এদের আদি নিবাস মধ্য প্রদেশের রায়পুর ও বিলাসপুর। এই দুই স্থানে এদের জ্ঞাতগোষ্ঠী মাদারি ও গাজুবিগণ এখনও বাস করে।

হাতের কায়দা দেখিয়ে লোকের মনোরঞ্জন ও ভিক্ষাবৃত্তিই এদের উপজীবিকা হলেও চৌর্য্য কার্য্য দ্বারাই এরা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে। তবে এই অপকার্য্যে পুরুষ অপেক্ষা এদের স্ত্রীলোক ও বালিকারাই সাধারণতঃ নিযুক্ত থাকে। এরা বয়সে চৌদ্দ পনেরো হলে বিভক্ত হয়ে রেল-যোগে দূরে এসে রেল ষ্টেশনের নিকটে চুরি চামারি করেছে। এরা দোকান হতে দ্রব্য তুলে, শিশুদের গাত্র হতে অলঙ্কার ছিনিয়ে পথচারীর পকেট মেরে বা কেটে, স্নানের ঘাট হতে দ্রব্য সরিয়ে এবং খাদ্যের জন্য মোরগ মুরগী অপহরণ করে অপকর্ম্ম করে থাকে। গৃহস্থদের অবর্ত্তমানে এরা বাড়ি হতেও চুরি করেছে। অপকর্ম্মের জন্য এরা জনবহুল হাটবাজার, রেলষ্টেশন, ফেরীঘাট, তীর্থস্থান প্রভৃতি স্থান বেছে নেয়। এদের পুরুষেরা চোরাই মাল পাঁচারেই ওস্তাদ। সোনা রূপা এরা তখুনি গালিয়ে ফেলে এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি এরা লেপের ও কাঁথার মধ্যে সেলাই করে রাখে, এরা দ্রব্যাদি বাঁধা দিয়েও মদ্যপান করে। ধরা পড়লে এই জাতি মিথ্যা

নামধাম লিখায়। কখন কখন এরা কর্ম্মীরূপে নিজেদের পরিচিত করে। এরা একদল হতে অপর দলে দ্রব্য পাচার করে। এইজন্য চোরাই দ্রব্যের জন্য পাঁচ ছয় মাইল দূরে অবস্থিত দলগুলির ডেরাও তল্লাস করা উচিত।

এরা ২৪ পরগণা, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, কলিকাতা, বর্দ্ধমান, বীরভূম, দিনাজপুর, হুগলী, মালদহ, নদীয়া, দার্জ্জিলিঙ, বগুড়া, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মৈমনসিং, পাবনা, রাজসাহী, রঙ্গপুর ও ত্রিপুরাতে অপকর্ম্মে রত আছে। কিন্তু এদের স্বদেশ গাঙ্গপুর ষ্টেটে এরা কখনও অপকর্ম্ম করে না।

আউধিয়া

আউধিয়াদের অর্দ্ধপুরীও বলা হয়। এরা যোগী, ভিখারী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বেশধারণ করে এবং রুদ্রাক্ষী ও তুলসীর মালা, গোপীচন্দন, কমণ্ডলু, চিমটা ধারণ করে এবং ঝুলিতে সিঁদকাটি ও অন্যান্য ভাঙন যন্ত্র বাসন পত্রের সহিত একত্রে বহন করে। এরা সাধারণতঃ ফতেপুরে বাস করে এবং সেখান হতে দিকবিদিক ভ্রমণ করে।

এরা সিঁদেল চোর ও মুদ্রা জালিয়াত। এরা পকেট মারতে বিড্সুইণ্ডিলিং ও দোনা খেল অপরাধে সিদ্ধহস্ত। চাপ্পাবাঁধ অপদলের অনুকরণে এরা মুদ্রা প্রভৃতি জাল করে।

কেওড়া

কেওড়া দল হাড়ি জাতির একটী উপশ্রেণী। এরা খেজুর গাছের রস থেকে গুড় তৈরী করে এবং শূকর পোষে। এদের কেউ কেউ ইউরোপীয়, ইয়োরেশিয়ো এবং এ্যাংলো ভারতীয়দের পাচক রূপেও বাহাল হয়। এদের কয়েক দল বাগদী, পোদ ও ধর্ম্মান্তরিত

মুসলমানদের সহযোগে সিঁদেল ও সাধারণ চুরি এবং ডাকাতি অপকর্ম্ম করে। এদের স্ত্রী-পুরুষ সমভাবে এই বিষয়ে পাকাপোক্ত। এরা ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় অপকর্ম্ম করে।

কামারী

কামারীরা ডেকারদলের সমগোত্রীয় তবে তাদের মত এরা অতো ... অপকর্ম্মে লিপ্ত নেই। সম্ভবতঃ সভ্যতার সংস্পর্শে এদের এই উপশ্রেণীর মধ্যে অপস্পৃহা ধীরে ধীরে সুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে। এদের একদল একাধারে সাধারণ ও সিঁদেল চুরিতে লিপ্ত হয়। বিশেষ করে এরা ছাগল চুরিতেই হাত পাকিয়েছে। এদের অনেকে এখন বাঁকুড়া জেলা নিবাসী কর্ম্মকার। সেখানে এদের অনেকে কামারের কাজকর্ম্ম করে।

পোদ

পোদগণ চারিটী উপশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—উড়িয়া, বাংলা, বঙ্গাদ, খোটা বা মানা। এরা ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও যশোহরের অধিবাসী। এরা ধর্ম্মে হিন্দু এবং ব্রত ক্ষত্রিয় রূপে পরিচিত। চিঁড়া তৈরী ও চাষবাস এদের উপজীবিকা। এদের কোনও কোনও দল বাগ্দী, মুসলমান ও কেওড়া জাতীয় লোকদের সহযোগে ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে ডাকাতি করে বেড়ায়।

রাইম্যাটাল

এই দল মালপাহাড়ীদের সহযোগে উহাদের অনুরূপ পদ্ধতিতে বাড়ি হতে এবং রেলের ওয়াগান ভেঙে বা বিশ্রাম স্থান প্রভৃতি হতে চুরি করে। এদের একজন একটা বঁড়শী কাপড়ে আটকে রেখে বাড়ী ঢুকে। ঐ

বঁড়শীর মুখে লাগানো থাকে একটা সুতা। এই সুতার অপর মুখ "রিল" সহ দলের অপরজন মুঠি করে বাহিরে পাহারা দেয়। বিপদের সম্ভাবনা হলে বাহিরে পাহারারত ব্যক্তি ঐ সুতায় টান দেয়। কোমরের সুতায় টান পড়া মাত্র ভিতরের ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বাইরে বেরিয়ে আসে বা ভিন্ন পথে পলায়ন করে। এই দল ধর্ম্ম, সমাজপ্রথা ও আচার ব্যবহারের দিক হতে মালপাহাড়ীদের অনুরূপ হলেও এরা একটা ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বলেই মনে হয়। সম্ভবতঃ নিবিড় সহ-যোগিতার জন্য এরা এইরূপ প্রকৃতিগত সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়েছে। এই রাইঘাটালগণ দিনাজপুরের অধিবাসী। পশ্চিমবঙ্গের রায়বেশে বীরদের ন্যায় রাইঘাটালরাও কোনও প্রাচীন যোদ্ধজাতি কি'না তাহা অনু-সন্ধানেয়। সম্ভবতঃ এদের সাহায্যে পূর্ব্বতন রাজরাজড়ারা রাজ্য বা জায়গীরের ঘাঁটী সমূহ রক্ষা করতেন।

চৈন চামার

অপরাধী সমাজে চৈন অর্থে ছিঁচকে চুরি বুঝায়। সম্ভবতঃ ওস্তাদ চোরেরাই অবজ্ঞা সূচক এই নাম তাদের দিয়ে থাকবে। এরা গৃহস্থ বাড়ীতে পথিক বা সাধুর বেশে এসে রাত্রির জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর গভীর রাত্রে ঐ গৃহের দ্রব্যাদি অপহরণ করে সরে পড়ে। এরা অপকর্ম্মে প্রায়ই চৈন মাল্লা ও পালওয়ার দোসাদদের সহকর্ম্মী রূপে নিয়েছে। বহু বিষয়ে এরা চৈন মাল্লাদের অনুরূপ হলেও অপকর্ম্মে তত বেশী পাকাপোক্ত নয়। এরা অপকর্ম্মে এদের অপরিণত বালকদের সাহায্য গ্রহণ করে। এমন কি এদের স্ত্রীলোকেরাও দক্ষ পিকপকেট ও প্রবঞ্চক। এরা গাজীপুর, জোনপুর ও বেলিয়ার অধিবাসী হলেও হাওড়া, ২৪ পরগণা ও মুর্শিদাবাদেই অধিক অপকর্ম্ম করেছে।

চৈন মাল্লা

চৈন মাল্লা জাতিদের মধ্যে যারা চোরা তাদেরই সম্ভবতঃ চৈন মাল্লা বলে। এরা অজিমগড়, বেলিয়া, গোরক্ষপুর, গাজীপুর ও মির্জ্জাপুরের অধিবাসী হলেও নৌকাযোগে গঙ্গা ও অন্যান্য নদী দিয়ে কাঠের ব্যবসার অছিলায় হাওড়া, খুলনা, যশোহর, নদীয়া, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় আসে এবং নদীর কিনারায় অবস্থিত গ্রামে সাধারণ ও সিঁদেল চুরি করে। এদের মধ্যে যারা আগ্রা, মথুরা ও আলীগড় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে, তারাই দুর্দ্দান্ত অপরাধী। এরা নারায়ণগঞ্জ নাটোর ও সিরাজগঞ্জে অপকর্ম্ম করে বেড়ায়।

এদের অনেকে ছোট ছুরী বা ঘসা কাঁচের সাহায্যে পকেটমারীর কাজ করে। মেয়েদের কাপড়ের খুঁট বেমালুম কেটেও এরা দ্রব্য অপহরণ করেছে। এরা কেউ কেউ স্ত্রীলোক ও শিশুদের গাত্র হতে অলঙ্কারও ছিনিয়ে নিয়েছে। এরা ধরা পড়লে নিজেদের হুনিয়া বলে মিথ্যা পরিচয় দেয়; কিংবা নির্ব্বিবাদে নির্ব্বোধ সাজে। এরা বিভিন্ন দলে দল বেঁধে আগমন করলেও অকুস্থলে এসে এদের এক এক বা দুই দুই জন করে এক এক দিকে ছড়িয়ে পড়ে অপকর্ম্ম সুরু করেছে। এরা অপহৃত দ্রব্য চলতি পথে বৃক্ষের তলায় পুঁতে রেখে তার উপর বিছানা পেতে শুয়ে থাকে।

ঢাকাই দোসাদ

মুঙ্গের জেলার জুমাই মহকুমার ঢাকাই হতে এদের নাম ঢাকাই দোসাদ। এরা বিহারের দোসাদ ও বাইবিয়া জাতি হতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। এরা বাংলার কয়লা খনির অঞ্চলে

দলে দলে এসে খনির কাজ করে এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে এদের এক দল চুরি চামারী বা কদাচিৎ ডাকাতিও করে। এরা অপকর্ম্মে বলপ্রকাশ কদাচিৎ করেছে এবং ডাকাতি অপেক্ষা চুরিই এদের অধিক কাম্য। অপকর্ম্মের পূর্ব্বে এরা দলের কারো বাড়ীতে কিংবা অরণ্যে এসে জমায়েত হয়। সিঁদেল চুরির সময় এদের এক ব্যক্তি মাত্র সিঁদ-পথে গৃহে প্রবেশ করে পলায়নের সুবিধার জন্য সম্মুখের ও পিছনের একটী করে দরজা খুলে রেখে বাকীগুলি বন্ধ করে দেয়। এর পর একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে চারিদিক ভালো করে চকিতে দেখে নেয়। কোনও ভারী বাক্স বহন করতে হলে বাইরে থেকে এরা দুই একজন সাথীকে ভিতরে ডেকে এনে তা না ভেঙ্গে পুরা বাক্সটাই তাদের সাহায্যে বাইরে নিয়ে আসে। ছোট ছোট দ্রব্য এরা জানালা দরজা বা সিঁদের গহ্বর পথে বাইরের সাথীদের নিকট ভিতর হতেই পাচার করে।

এই দল এক্ষণে বীরভূম, মুঙ্গের, ভাগলপুর, হাজারীবাগ ও সাঁওতাল পরগণার অধিবাসী।

এদের মনে বহু কুসংস্কার আছে। যদি সম্মুখে শিয়াল, এবং দক্ষিণ দিক হতে পেচক ডেকে উঠে তা'হলে তারা অপকর্ম্ম না করে ফিরে যাবে এবং সঙ্গে চোরাই মাল থাকলে তা কোনও নিরালা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে চলে যাবে।

ছাপ্পার বান্দ

এরা 'সাহ' উপাধীধারী মোসলেম এবং বোম্বাই প্রদেশের বিজাপুর জিলার অধিবাসী। মোসলেম দরবেশের বেশে তিন হতে দশজন করে এক এক দলে বিভক্ত হয়ে এরা সারা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করে বেড়ায়।

এরা এই সময় রঙিন পাগড়ী ও ঘুঁটির মালা ধারণ করে। কখনও কখনও এরা হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীর বেশও ধারণ করে থাকে।

এদের নেতাকে এরা বলে থগড়া। ইনি অধিক হিস্যা গ্রহণ করেন। এঁর আদেশ দলের লোকজন নির্ব্বিচারে মেনে চলে। এরা জালি মুদ্রা তৈরি ও প্রদান করে থাকে। জালি মুদ্রা প্রদানকারীদের এরা বলে ভোঁদড়। বালকদের এদের সঙ্কেত ভাষায় বলে হিন্দিয়াল। এরা জালি মুদ্রা লেঙটীর বিভিন্ন গোপন অংশে বহন করে থাকে।

এরা ভ্রমণরত অবস্থাতেই মুদ্রা জাল করেছে। এরা আঁটাল মৃত্তিকা রৌদ্রে শুষ্ক করে ছাঁচ তৈরী করে নেয়। মুদ্রা জালের জন্য এরা তাম্র টিন্ এবং কাঁসা ব্যবহার করে। এরা সামান্য তৈলসিক্ত মুদ্রার উভয় পার্শ্বে মৃত্তিকা রেখে ছাঁচের দুইটী অংশ প্রথমে তৈরী করে নেয়। এর পর এই যুক্ত ছাঁচের গোলকের একটি স্থানে ফুটা করে উহার মধ্যে গলিত ধাতু ঢেলে জালি মুদ্রা তৈরী করে নেয়। সাধারণত এরা এমন এক বৃদ্ধাকে বেছে নেয় যার চক্ষুর জোর কমে এসেছে। এর পর তাকে ১৭টী আনি দিয়ে একটি টাকা গ্রহণ করে। কখন কখনও এরা টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে বলেছে যে ঐ টাকা তাদের দেশে চলে না। এই অজুহাতে ভাঙানি ফিরত নিয়ে টাকা ফিরত দেবার সময় আসল টাকাটী সরিয়ে রেখে নকল জালি টাকা মানুষকে গছিয়ে দিয়েছে।

এরা লাঙ্গুটীর কাপড়ের মধ্যে পকেট তৈরী করে তার মধ্যে কিংবা মুখের মধ্যে কৃত থলীতে কিংবা গুহ্যদেশে জালি টাকা লুকিয়ে রাখে।

এরা রাস্তার মোড়ে বা পথের ধারে মৃত্তিকা ও পাথরের সাহায্যে পশ্চাদ-গামীদের অবগতির জন্য তাদের গন্তব্যস্থানের দিক নির্দ্দেশক বহু চিহ্ন স্থাপন করে রাখে। যেখানে তারা ছাউনি ফেলে তার আশপাশের পথের উপরও তারা অনুরূপ বিবিধ চিহ্ন স্থাপন করে তাদের পশ্চাদগামীদের

সেই সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে। পথের সংযোগ স্থলে এরা প্রস্থে ও উচ্চতায় ছয় ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্যে এক ফুট তিনটি মৃত্তিকা পিণ্ড একশত গজ দূরে দূরে স্থাপন করে উহাদের মুখে একটি তীর চিহ্ন এঁকে তাদের পথের দিক নির্ণয় করে রাখে যাতে পশ্চাদগামীরা তা দেখে বুঝে নিতে পারে যে অগ্রগামীব দল কোন দিকে গিয়েছে। ছাউনি ফেলার পর নিকটের পথে তুইটি রেখা এঁকে একটি রেখার মুখ ছাউনির দিকে ঐ একই কারণে ফিরিয়ে রেখেছে।

এরা একটি চামড়ার ব্যাগে করে মুদ্রা জালের যন্ত্র-পাতি সূক্ষ্ম মৃত্তিকা-কণা, নানা প্রকার ধাতুর দ্রব্য বহন করে এবং গন্তব্য স্থানে এসে তা মৃত্তিকা তলে প্রোথিত করে রাখে।

কারি ফক্কর

এরা ফকির বা সাধুর বেশে দেশে দেশে ঘুরে মানুষ ঠকায়। ত্রিপুরা জিলার সঁড়াইল নামক স্থানে কতিপয় কুটীরে এরা বাস করে। ফক্কর অর্থে ফাঁকি বা উড়ান, ইহা ম্যাজিকের একটি অবোধ্য উচ্চারণ। এই ফক্কর হতে কারি ফক্কর নামের উৎপত্তি। এরা বংশানুক্রমে এই প্রকার ফাঁকিবাজিতে পাকাপোক্ত হয়েছে।

এরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে অপকর্মে বহির্গত হয়। দলের এক এক ব্যক্তির উপর এক একটী কাজের ভার অর্পিত থাকে। এদের অগ্রগামী চরেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে, ধনী ব্যক্তিরা কোনও বিপাকে পড়েছে কি'না তা প্রথমে অবগত হয়ে আসে। এর পর এদের একজন রাত্রিযোগে এই সকল বাড়ীর প্রাঙ্গণে বা অন্য কোনও স্থানে গোপনে মানুষ বা বিড়ালের মাথার খুলি প্রোথিত করে রেখে আসে।

এর পর এরা ঐ সকল বাড়ীতে এসে নানা প্রকার ভেল্কীবাজী

দেখায়। মালার সুতায় নানা প্রকার গন্ধ বা মিষ্টি মাখিয়ে রেখে উহা অতর্কিতে জলপাত্রে ডুবিয়ে ঐ জল গন্ধযুক্ত বা সুমিষ্ট করে তুলে গৃহস্থকে মুগ্ধ করে তুলে। কখন কখন এরা পেনসিলাকার বৈদ্যুতিক টর্চ্চ কাপড়ের তলায় লুকিয়ে রেখে উহা কৌশলে টিপে নিজ দেহ আলোক দ্বারা আভাযুক্ত করে মানুষকে চমৎকৃত করেছে। এর পর এরা বলে যে বাড়ীর কোনও স্থানে বিড়াল বা মানুষের কঙ্কাল পুঁতা আছে, এইজন্য বাড়ীতে আপদ বিপদ ও রোগের মুক্তি হচ্ছে না। তারা নানা রূপ ধ্যান ও পূজা করে ঐ স্থানটী খুঁজে বার করে খুঁড়ে ঐ সকল কঙ্কাল সর্ব্বসমক্ষে তুলে গৃহস্থকে আরও মোহিত করে তুলেছে।

এই ভাবে অজ্ঞ মূর্খ গৃহস্থগণ ভীতত্রস্ত হয়ে এই সাধু ও ফকিরের নিকট কেঁদে পড়লে তারা বিপদের শান্তির জন্য গৃহের সোনা দানা একত্রে এক স্থানে রেখে পূজা করবার অছিলায় গোপনে ঐ সকল দ্রব্য সমেত চম্পট দেয়।

এদের কেউ কেউ নোট ডাবলিঙ্ ট্রিক্সেরও আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এদের কেউ কেউ পিতলকে সোনা করবার অছিলায় গৃহস্থকে ঠকাতে পেরেছে। এরা কখনও কখনও পুরানো গহনা বিক্রয় করবার অছিলায় লেনদেনের সময় সোনার গহনার মোড়ক হাত সাফাইয়ের দ্বারা অলক্ষ্যে সরিয়ে তৎস্থানে পিত্তলের গহনার একটী মোড়ক ক্রেতাকে গছিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে।

এই সকল ফকিরগণ কখনও বড় বড় চুল রাখে, কখনও কখনও আবার চুল ছোট করে ছেঁটে ফেলে। এরা প্রায়ই লাল রঙের সালুর আলখাল্লা পরে ঘুরে বেড়িয়েছে। এদের প্রায়ই ধ্যানস্থ হয়ে মালা ঘুরাতে ঘুরাতে বিড় বিড় করে দুর্ব্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করতে দেখা গিয়েছে। কখন কখন অবোধ্য শব্দ উচ্চারণ করে এরা চেঁচিয়েও উঠেছে।

এদের সাথী চেলারা কিন্তু সুবিধা মত এই সকল শব্দের ব্যাখ্যা করে মুগ্ধ মানুষদের শুনিয়ে দিয়েছে। কখনও কখনও এই সকল ফকিররা গাত্রাচ্ছাদন দূরে নিক্ষেপ করে ভাবে বিভোর হয়ে পাগলের মত ব্যবহারও করেছে। এই সময় এ'রা দাও বা যষ্টি হস্তে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়ে উপস্থিত সকলকে ভীত ত্রস্ত করে তুলেছে। এঁদের সাথী চেলারা প্রায়ই অল্পবয়স্ক যুবক। এই যুবকরা ব্যাগে করে ছদ্মবেশ ধারণের বহু দ্রব্যাদি ও পোষাক বহন করে। এরা কাপড় জামা ও জুতা ভালোই পরে থাকে। কিন্তু সর্ব্বদাই ভান করে যে এঁদের জীবন ফকিরের পাদপদ্মেই উৎসর্গীকৃত। এদের পৃথক সত্বা যেন এরা বহুদিন হারিয়ে ফেলেছে। এরা ফকিরের তল্পী বহন ও তার সেবা করে থাকে।

এই দলের বহু:সাঙ্কেতিক ভাষা আছে, যথা—মানকড়ী অর্থে শিকার; নাগু'রা অর্থে টাকাকড়ি; গুচ্চা অর্থে অপকর্ম্মের উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত গৃহ; মানপাট্টা অর্থে কপর্দ্দকহীন শিকার; দাঁ অর্থে সফলতা; বুড্ডা অর্থে পুলিশ।

মাল্লা

মাঝিমাল্লা শব্দ হতে মাল্লা নাম সৃষ্টি হয়েছে। মাল্লা অর্থে নৌকা চালক বুঝায়। এই দলে পাশি, চামার, পালয়ার, দোসাদ, ভোর প্রভৃতি জাতীয় লোকেরাও যোগ দেয়, কিংবা এই প্রতিটি জাতি পৃথক মাল্লা দলের সৃষ্টি করে। এরা অবশ্য সকলেই বিহার বা যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী। এরা জেলে ও ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে নৌকাযোগে বাংলা দেশে যাত্রী ও মালবাহী নৌকা লুঠ করে। কখনও কখনও এরা তীরে নেমেও সিঁদেল চুরি ও ডাকাতি করেছে।

এক এক স্থানের মাল্লা দল এক এক প্রকার হয়ে থাকে।

এদের মধ্যে আলিগড়, মথুরা, আগ্রা এবং মির্জ্জাপুরের মাল্লা উল্লেখযোগ্য।

আগ্রা, মথুরা ও আলিগড়ের মাল্লাগণ চৈন মাল্লাদের ন্যায় পকেটমারি ও সাধারণ চুরিতে দক্ষ। এদের চেহারা ও আচার ব্যবহার চৈন মাল্লাদের অনুরূপ হলেও এরা পৃথক গোত্রীয় মানুষ বলে মনে হয়। এরা চৈন মাল্লাদের মত নিজেদের ঠাকুর ব্যবসায়ী বা বেণে বলে পরিচয় দেয় এবং ধরা পড়লে প্রকৃত নাম-ধাম বলে না। এরা কলিকাতা ও উহার চতুর্দ্দিকে অপরাধ করে বেড়ায়।

মির্জ্জাপুরের মাল্লাগণ পাথর, তামা ও কাষ্ঠ ব্যবসার অছিলায় নৌকা যোগে নদীতে নদীতে ভ্রমণ করে। এরা ছোট ছোট দলে ছোট ছোট নৌকাতে করে যাত্রী বা মালবাহী নৌকার ঝাঁপ অন্ধকারে কেটে দেশালাই কাঠি জ্বেলে উহার আলোয় ত্বরিতগতিতে ভিতরের যা কিছু দেখে নিতে অভ্যস্ত। এরা কিনারায় নেমেও সিঁদ চুরি করে থাকে। কিন্তু প্রথামত এরা সিঁদ কাটবার জন্য একজন পার্শীকে সঙ্গে রাখে। কারণ এই পার্শীরা সিঁদ কাটতে ওস্তাদ বা সিঁদ বিশেষজ্ঞ। এদের একজন নৌকায় পাহারা থাকে এবং অপর জনেরা চুরি করতে গৃহস্থ বাড়ীতে যায়। এরা চোরাই দ্রব্য একটা দড়ীতে বেঁধে উহার একটা মুখ নৌকার তলদেশের পেরেকে বেঁধে দ্রব্য সহ উহার অপর মুখ জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। কথনও কখনও এরা চোরাই দ্রব্য নৌকার ছাদে বা মাস্তুলেও লুকিয়ে রেখেছে। এরা সনাক্তযোগ্য দ্রব্যাদি কখনও সঙ্গে রাখে নি। অলঙ্কারাদি তৎক্ষণাৎ এরা গালিয়ে ফেলে স্থানীয় খাদ বা গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় করে এসেছে। এরা রাজসাহীর গোদাগারী, মুর্শিদাবাদের ঢুলিয়া প্রভৃতি বাংলা ও আসামের বহু স্থানের নদীবহুল জেলায় অপকর্ম করে বেড়ায়।

মালপাহাড়ী

মালপাহাড়ী নাম হতেই বুঝা যাবে যে উহারা একশ্রেণীর পাহাড়ী। এরা সাঁওতাল পরগণার ডোমে-ই-খো উপত্যকার চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতের চূড়াতে বাস করে। এক্ষণে এরা দিনাজপুর অঞ্চলে দলে দলে এসে বাস করছে। এরা ধর্ম্মে হিন্দু এবং কালীভক্ত। অপকর্ম্মে বার হবার পূর্ব্বে এরা কালীর নিকট সাফল্যের জন্ম প্রার্থনা করে। এই সময় এরা একটি যজ্ঞকুণ্ড স্থাপন করে মনুষ্য মস্তকের খুলি ও সিঁদুর মাখানো পত্র, ধান্ত ইত্যাদি সহযোগে পূজা দেয়। এরা কালীর সহিত দুর্গা পূজাও ছাগবলি সহযোগে করে থাকে। কিন্তু বলিদানের পূর্ব্বে যদি ঐ ছাগ দেবীর সম্মুখে রক্ষিত বেলপাতা ও ধান্য বা চাউল ভক্ষণ করে তবেই উহাকে বলি দেওয়া হয়। তা না হলে এরা অন্য এক বৃহৎ ছাগের সন্ধানে বহির্গত হয়। মা দুর্গার সম্মুখে ডাঁটা, ছাগ, মাগুর মাছ বলি দেওয়ারও রীতি আছে। বহুক্ষেত্রে দেবীর পাদপীঠে বাতাসা ছড়িয়ে এরা হরির লুটও দিয়েছে। পূজার সময় এরা মদ বা তাড়ী খেয়ে উদ্দাম নৃত্যও করে থাকে।

এদের স্ত্রীলোকেরা নির্ব্বিচার যৌন মিলনে পরাঙ্মুখ নয়। এ'ছাড়া এদের মেয়েরা সারা অঙ্গে উল্কি চিহ্নও ধারণ করে থাকে। এদের সাঁওতালদের সম শ্রেণীর নিজস্ব ভাষা থাকলেও বাংলা ভাষা এরা অনর্গল বলতে সক্ষম।

এই দল বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ করে এবং তাদের কেউ সন্দেহ করলে তারা নিজেদের নাম বদলে অন্য এক স্থানে সরে গিয়ে ছাউনি ফেলে। এরা সাধারণতঃ জনবহুল স্থান হতে দূরে তাদের ছাউনি ফেলে স্থানীয় বড় বড় জোতদার বা ধনী ব্যবসায়ী বা জমিদারদের

অধীনে নকরী বা মজুরী করে, এবং সুবিধামত ছাউনির চতুর্দ্দিকের স্থানে বগলী সিঁদ সহযোগে গৃহস্থ বাটী হতে বাসন ও চাল ডাল অপহরণ করে।

মেক্কা মোয়াল্লেম

এই দল ধর্ম্মের আশ্রয় নিয়ে অর্থাৎ মক্কাগামী হাজী রূপে ধর্ম্মপ্রাণ স্বধর্ম্মীদের অর্থাপহরণ করে। এরা হজ যাত্রার প্রাক্কালে ছোট ছোট দলে দেশে দেশে ভ্রমণ করে মোসলেম গ্রামবাসীদের হজ যাত্রায় তাদের অনুগামী হতে বলে। কিংবা গ্রামবাসীদের পক্ষ হতে হজে গিয়ে এদের হয়ে ধর্ম্মাচরণ করবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেয়। এই সুযোগে তাদের একজনের হজ যাত্রার প্রয়োজনীয় অর্থাভাব হয়েছে বলে বহু অর্থ গ্রামবাসীদের নিকট হতে এরা আদায় করেও নেয়। গ্রামবাসীদের কেহ এদের সহগামী হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে দু'শ বা তিন'শ টাকা তারা এদের নিকট হতে নিয়ে নিজেদের কাছে গচ্ছিত রাখে। এবং তার কিছু পরই ঐ অর্থসহ ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে পড়ে। সাধারণতঃ এদের মধ্যে যে মোয়াল্লেম তার কাছেই ঐ অর্থ গচ্ছিত রাখা হয়েছে। ঐ অর্থ এনে তা গচ্ছিত রাখতে কেউ অস্বীকৃত হলে এরা তাকে মারধর করে উহা কেড়েও নিয়েছে। দুই এক ক্ষেত্রে এই সকল ব্যক্তিকে সুযোগমত এরা নৌকা হতে জলে ফেলেও দিয়েছে।

এরা 'জাম জাম' নামক পবিত্র উদক যা মক্কার এক কুয়া হতে আনা হয় এবং সর্ব্বরোগহর তাবিজ প্রভৃতি বিতরণ করে মানুষের আস্থাভাজন হতে সচেষ্ট হয়। ধরা পড়ার পর প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের নামধাম সহ একটা বড় তালিকা প্রায়ই এদের নিকট পাওয়া গিয়েছে। এরা পূর্ব্ব পাকিস্তানের নোয়াখালি, বরিশাল, ফরিদপুর, ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহ প্রভৃতি জিলাতেই অপকর্ম্ম করে বেড়ায়।

ব্যাধ

পাখী শিকারীদের এদেশে ব্যাধ বলে। এরা নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু এবং যশোহর, নদীয়া ও ২৪ পরগণার অধিবাসী। এরা স্ত্রীপুত্রসহ দেশে দেশে ঘুরে শতনলী ও বেত বা বাঁশের ঝুড়ির সাহায্যে পাখী ধরে। এরা কখনও কখনও নিজেদের পাইক মারা বাঁশফোর ডোম ও কুরুয়া নামেও পরিচিত করেছে। এরা বহুদিন একস্থানে ছাউনি ফেলে পল্লীবাসীদের সহিত হৃদ্যতা করে, পরে সুযোগমত তাদের প্রবঞ্চনা করে। এদের মেয়েরা অজ্ঞ নারীদের 'অক্ষয় লক্ষ্মীর ভাঁড়' পদ্ধতির সাহায্যে ঠকিয়ে থাকে। এরা তাদের এই ভাঁড়ের টাকা কখনও শেষ হবে না অর্থাৎ তা ফুরাবা মাত্র পুনরায় ভরে যাবে, এই কথা বলে অধিক মূল্যে ঐ ভাঁড় তাদের গছিয়ে দিয়েছে। এদের পুরুষরা ভাঙা বাড়ী বা ডুবো জাহাজ হতে কয়েক হাঁড়ি মোহর পেয়েছে বলে অজ্ঞ পুরুষদের নিরালা স্থানে এনে প্রবঞ্চনা করে। কেউ যদি ঐ ব্যক্তিকে ধরে ফেলে তা'হলে লুকানো স্থান হতে এদের সাথীরা বেরিয়ে এসে বন্ধুকে বাহুবলে উদ্ধার করেছে। এরা টাকাকড়ি দ্বিগুণ করে দেবে বলে কয়েকটি টাকা কাপড় চাপা হাঁড়িতে রেখে ও পরে তা সরিয়ে লোভী মানুষদের ঠকিয়ে থাকে।

বৈদ মুসলমান

এরা একপ্রকার ঠগী দল। এরা প্রায় ভারতের সর্ব্বত্রই এবং বাংলা দেশের মুর্শিদাবাদ, বগুরা, বাঁকুড়া, নদীয়া, ২৪ পরগণা ও পাবনা জিলায় অপকর্ম করে। এরা বৈদ্য বা ডাক্তারিতেও পারদর্শী। দেশীয় গাছ-গাছড়ার ঔষধ এরা ভালই তৈরী করে। বৈদ্য হতে বৈদ শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। রাজপুতানার উদয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি

রাজ্যবাসী বানদার জাতির উপশ্রেণী হলেও এরা হিন্দু হতে মুসলমান হয়েছে।

এরা বৈরাগী বা রামানন্দ হিন্দু সাধুর বেশে রোগমুক্তির জন্য বিভূতি বিতরণ করে। এরা পরশমণির অধিকারী রূপেও নিজেদের প্রকাশ করেছে। এরা রূপার টাকা সোনার করতে পারে কিংবা টাকাকড়ি দ্বিগুণ করতে পারে বলে হাতের বা কেমিকেলের কায়দা দেখিয়ে লোক ঠকায়। এরা রূপার টাকা সর্ব্বসমক্ষে কেমিকেলের সাহায্যে স্বর্ণাভ করে পরে সেই টাকা হাত সাফাইএর সাহায্যে সরিয়ে তার স্থানে মোহর এনে প্রথমে লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করে। এর পর একটী হাঁড়ীতে রূপার টাকা রেখে বা ঐ হাঁড়ী উনানে বসিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। তার পর কথায় ভুলিয়ে বা গৃহস্থদের ধাপ্পা দিয়ে অন্যত্র সরিয়ে ঐ হাঁড়ী হতে টাকাকড়ি তুলে নিয়ে চম্পট দিয়ে থাকে।

পাইকমারা

এরা কখনও কখনও ডাকাতি করলেও প্রায়শঃ সিঁদেল চুরিই করেছে। এরা চাল, বাসন, কাঁথা কাপড় প্রভৃতি সামান্য মূল্যের দ্রব্যও চুরি করে; এইজন্য এরা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে গৃহস্থ বাড়ীতে সিঁদ দেয়। এই সিঁদ এরা জানালার নীচে ও দুয়ারের উপরে চৌকা-ঘরের আকারে দিয়ে থাকে। কখনও কখনও এদের বালকেরা সন্ধ্যায় বাটীতে ঢুকে তক্তপোষের তলায় বা অন্য কোনও স্থানে লুকিয়ে থাকে এবং পরে গভীর রাত্রে উঠে বয়স্কদের প্রবেশের জন্য দরজা খুলে দেয়। এদের কেউ কেউ পাঁচিল টপ্‌কে গৃহে ঢুকে। পলায়নের জন্য সদর দরজা খুলে রাখে এবং তার পর ঘুমন্ত নারীর অঙ্গ হতে বেমালুম অলঙ্কার খুলে নেয়। কোনও বাড়ীতে চুরি করার পূর্ব্বে এরা স্ত্রী-পুরুষে বাঁদর-নাচ

দেখাবার বা পানার্থে জল বা খাদ্যার্থে অন্ন ভিক্ষার অছিলায় পুরুষদের অবর্ত্তমানে ঐ বাড়ীতে ঢুকে চারিদিক ভালো করে দেখে রাখে। এরা বিশেষ এক স্থানে বহু দিন ছাউনি ফেলে উহার চতুর্দ্দিকে অপকর্ম্ম করে, কিন্তু স্থানীয় লোক তাদের সন্দেহ করা মাত্র তারা স্থান ত্যাগ করে দূরে চলে যায়।

এরা স্ত্রীপুত্রসহ দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। এদের অধিকাংশই বাঁকুড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকের মত দেখতে। তবে এদের স্ত্রীলোকেরা দেশবালী মেয়েদের মত শাড়ী পরলেও মানভূমবাসী পাইকমারদের মেয়েরা ঘাগরাও পরে। এরা হাতে মুখে উল্কি চিহ্ন ধারণ করে এবং জাল ও শতনলীর সাহায্যে পাখী ধরে। এদের অনেকে বাঁদর নাচ দেখায় বা শিতলা ঠাকুর সহ ভিক্ষায় বার হয়। এদের কেউ কেউ গলায় দড়ি বেঁধে গরুর মত শব্দ করেও লোক জড় করেছে।

এই দল বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার অধিবাসী। এরা নিজেদের ব্যাধ, অগোরী, গুল্‌গুলি, চামার ও জুনিয়া রূপেও স্থানবিশেষে পরিচয় দেয়।

মজঃফরপুর সোনার

এরা মূলতঃ বিহার যুক্তপ্রদেশের সোনারদের জাতভাই, কিন্তু এদের পুরুষানুক্রমে অপরাধপ্রবণতার জন্য এদের জাতভাইরা এদের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে। এ'ছাড়া এই শ্রেণীর এক দল বিতাড়িত হয়ে এখন নেপাল তরাই-এর কয়েকটি গ্রামে এসে বাস করছে। এদের দেশের জমিদাররাও এদের পৃষ্ঠপোষক, কারণ তারা এদের চোরাই দ্রব্য হতে ভাগ পায়। বিনিময়ে এই সকল ক্ষুদ্র অসাধু ভূস্বামিগণ, এরা জেলে গেলে এদের স্ত্রী পুত্রকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে, এমন কি আদালতে এরা

মামলারও তদ্বির করে এদের মুক্ত করতে চেষ্টা করেছে। তবে অপকর্মের অভিযানে এরা স্ত্রীদের কর্মক্ষেত্রেই সঙ্গে রেখেছে। এরা পথিমধ্যে বৃক্ষতলে রান্নাবান্না করে খেয়েদেয়ে চলে যাবার সময় একটি তীরযুক্ত ত্রিকোণ ঘর এঁকে রাখে যাতে পশ্চাৎগামীরা ঐ তীরের মুখ হতে বুঝে নিতে পারে যে তাদের অগ্রগামী দল কোন দিকে চলে গিয়েছে। এরা ভ্রমণকালে নিজেদের মিথ্যা নাম ধামে পরিচিত করে। কখনও কখনও এরা নিজেদের বেণিয়া, গোয়ালা ও কৈরিয়া বলেও পরিচয় দিয়েছে।

এই দল অপকর্মের সুবিধার জন্য রেলষ্টেশনের নিকট প্রথমে একটি দোকান বা বাটী ভাড়া করে। এদের কেউ কেউ পান বা মিষ্টির সাহায্যে মানুষকে অচৈতন্য করেও তাদের অর্থ অপহরণ করেছে। কখনও কখনও এরা জোর করে মানুষের দ্রব্যাদি কেড়েও নিয়ে থাকে। এরা বালা ট্রিক ও টপকা ট্রিক পদ্ধতির সাহায্যেও ভালমানুষদের অর্থ অপহরণ করে থাকে। এই টপকা ঠগী প্রভৃতিদের সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

শতনামী চামার

এরা কাউকে প্রণাম জানাবার সময় শতনাম শব্দটি বার দুই উচ্চারণ করে। এইজন্য এদের বলা হয় শতনামী চামার। এরা রায়পুর ও বিলাসপুর জেলার অধিবাসী। একাধারে এরা দুই প্রকার অপরাধ করে, যথা—সিঁদেল চুরি এবং বিষপ্রয়োগে গবয় হত্যা। সিঁদেল চুরিতে এদের চার পাঁচজনের দল কর্মরত থাকে। পথে ঘাটে এরা পাহারা রেখে তবে এদের অপর জনেরা গৃহে প্রবেশ করে। বাধা পেলে বা গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য এরা প্রতি-আঘাত হানতেও প্রস্তুত। অপকর্মের পূর্বে

প্রাঙ্গণে ও কক্ষে এরা বিষ্ঠা ত্যাগ করেছে। সমাজসেবীদের চেষ্টায় এরা আজকাল কিছুটা উন্নততর হয়েছে।

দিল্লীওয়ালা বাউরিয়া

এই দল মূল বাউরিয়া দলেরই একটি উপশ্রেণী। এরা ভাগলপুর, হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু ও মজঃফরপুরের অধিবাসী। এরা বৈরাগী কাশীর ব্রাহ্মণ এবং গোঁসাইদের ছদ্মবেশে অঙ্গে বিভূতি ও গোপীচন্দন ধারণ করে, তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরে, চিমটা ও কমণ্ডলু হাতে করে যত্র তত্র ভ্রমণ করে। কিন্তু এরা সাধারণতঃ পবিত্র স্থান মন্দিরাদির সম্পর্কশূন্য কোনও এক নিরালা স্থানে এসে ছাউনি ফেলে। তবে গ্রামের প্রান্তদেশে কোনও ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়ী বা মন্দির থাকলে সেখানেও এরা আড্ডা গেড়েছে। এরা সঙ্গে কুকুর রাখে এবং মুরগী, ছাগ, মেষ ও হরিণ মাংস খেতে ভালবাসে। এদের মেয়েরা কানের উপরাংশে চারিটী ছিদ্র রাখে ও নানাবিধ রৌপ্যালঙ্কার পরে। এদের মেয়েরা নাকে ও চোখের নিকট উল্কিচিহ্নও ধারণ করেছে। এরা বহু প্রকার চিত্র বা সঙ্কেতও পশ্চাদগামীদের জন্য এঁকে রাখে। এই উল্কিচিহ্নাদি ও চিত্র সঙ্কেত সম্পর্কে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে।

এরা বিবিধ দলে বিভক্ত হয়ে সারা ভারতবর্ষে অপকর্ম্ম করে বেড়ায়। এদের দলপতিকে এরা বলে কমন। নিজেদের ছাউনির নিকট এরা কদাচিৎ অপকর্ম্ম করেছে। এরা গভীর অমাবস্যা রাত্রে পাঁচ ছয় জনের এক একটী দলে বিভক্ত হয়ে রেলযোগে বা পথ হেঁটে বহু দূরে গিয়ে অপকর্ম্ম করে। পূর্ব্বাহ্নে এদের মেয়েরা কোনও এক গৃহে ভিক্ষা বা ঔষধ বিক্রয়ের অছিলায় ঢুকে সুলুক সন্ধান আনে। এরা বগলী সিঁদ দ্বারা বা দড়ী ও বাঁশের সাহায্যে জানালার গরাদ ভেঙে বা উপড়ে ঐ সকল গৃহে

প্রবেশ করেছে। এরা জানালার কাঁচ সরিয়ে বা শিকল ভেঙেও নির্দ্ধারিত গৃহে প্রবেশ করেছে। বলাবাহুল্য যে অপকর্ম্মের সময় এরা সাধুবেশ পরিহার করে মাত্র তাদের নেঙ্গট্ পরে অপকর্ম্ম করেছে। এরা অপর বহু দলের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করে তথায় বিষ্টা ত্যাগও করে থাকে। অপকর্ম্মের সুধিধার জন্য এরা দেশলাই ও মোম বাতি সঙ্গে নেয়। এদের ছাউনি থেকে দুই তিন মাইল দূরে কোনও স্থানে এরা চোরাই দ্রব্য পুঁতে রাখে এবং তা সুবিধা মাত্র স্থানীয় বামাল গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় করে।

এরা কুসংস্কারের কারণে একটা বাক্স করে জোয়ার, চাল প্রভৃতি সঙ্গে নেয়। এদের কেউ কেউ গাইন নামক চামচ-যন্ত্রও সঙ্গে রাখে। এরা কালীরভানী প্রভৃতি দেব দেবীর উপাসক ও ধর্ম্মে হিন্দু। এরা মৃত্যুর পর শিশুদের কবর দেয় কিন্তু বয়স্কদের দাহ করে কিংবা নদীতে ফেলে দেয়। এরা এ'ও দাবী করে যে এরা দক্ষ মৎসজীবী ও শিকারী, চোর ডাকাত নয়। কিন্তু এরা এই ব্যবসায় দক্ষতা দেখালেও সৎভাবে জীবন যাপন করে নি।

মারওয়াড়ী বাউরিয়া

এরা স্ত্রীপুত্র সহ বিভিন্ন দলে দেশে দেশে এসে জাল মুদ্রা তৈরী করে তা চালায়। এরা বরদা ও যোধপুরের অধিবাসী নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং এদের দেহ কৃষ্ণ বর্ণ নাতিদীর্ঘ। কিন্তু বিদেশে এরা গির ও গোঁসাই ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়। এদের পুরুষেরা ময়লা ধুতি, ছোট কুর্ত্তা ও মারওয়াড়ীর ন্যায় পাগড়ী পরে। এদের শিশুদের উদরে তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা তিনটি জাতি নির্দ্দেশক চিহ্ন উৎকীর্ণ করে দেওয়া হয়। এই বিশেষ চিহ্ন ব্যতীত এদের কন্যারা

মুখে চারিটি ও চোখের কোণের নিকট কয়েকটি উল্কীচিহ্ন ধারণ করে। এরা নাম ধাম ও জাতি প্রায়ই গোপন করে থাকে।

সাধু, তীর্থযাত্রী বা ব্রাহ্মণের বেশে সামান্য কিছু ক্রয় করে এরা দোকানীকে একটি ফরাক্কাবাদ মুদ্রা দিয়ে ভাঙানী চায়। ঐ দোকানী ঐ মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃত হলে সবিস্ময়ে বলে উঠে, "এঁ্যা এই মুদ্রা চলে না! তাহলে এখানকার মুদ্রা কিরূপ?" এর পর দোকানীর বাক্সতে হাত দিয়ে এখানকার মুদ্রা দেখার অছিলায় হাত সাফাইয়ের সাহায্যে দুই একটি মুদ্রা বেমালুম সরিয়ে ফেলে। কিংবা ঐ মুদ্রা তুলে পরীক্ষা করে তা ফেরত দেবার সময় একটি জালি মুদ্রা ঐ দোকানীকে এরা গছিয়ে দেয়। এই সময় হাত-সাফাই-এর সুবিধার জন্য এরা একটি ছোট ছড়ি হাতে রাখে, কথনও কখনও এরা কোনও সওদা কিনে তা খারাপ এই অজুহাতে তার টাকা ফেরত নেয় এবং পরে মিটমাট করে ঐ আসল মুদ্রার স্থলে একটি নকল মুদ্রা দোকানীকে গছিয়ে দেয়। এরা কথনও কথনও নাগরিকদের নিকট মোহর বাঁধা রেখে পরে তা ফেরত নিয়েছে সুদ বেশী দিতে পারবেনা বলে। পরে কিন্তু অনুরূপ ভাবে মিটমাট করে তাকে আসল মোহরের স্থলে একটি নকল মোহর ফেরত দিয়েছে। এই স্থলে গৃহস্থ নিঃসন্দেহ থাকায় ঐ মোহর পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন মনে করে নি। কারণ সে উহা পূর্ব্ব মোহরই মনে করেছে।

মুদ্রা জালের জন্য এরা ছাঁচ ব্যবহার করে না। এরা এই কার্য্যে টাকার দুই পিঠ ও একটি রিঙএর সাহায্য নেয়। এবং সূক্ষ্ম মৃত্তিকা, তৈল, ঘী, সোল্ডার তামা প্রভৃতির সাহায্য নেয়। এরা একজন সুদক্ষ মিস্ত্রীকে সঙ্গে রেখে থাকে এবং এদেব দ্বারা তারা মুদ্রার কাণা মোল্ড করিয়ে নিয়েছে। এদের মেয়েরা মুদ্রাজালের উপকরণ, যন্ত্রপাতি

ও ফরাক্কাবাদ মুদ্রা তাদের ঘাঘরার মধ্যে লুকিয়ে রাখে। লুকানোর সুবিধার জন্য এদের পুরুষরাও তাদের পরিচ্ছদে বহু গোপন পকেটও তৈরী করে রেখেছে। এরা দোনাখেল ও বিড্ সুইওলিও পদ্ধতিতেও সুদক্ষ।

এরা মুদ্রাজালের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নিজেদের ছাউনিতে, উহার দূরে, বিছানার বা উনানের তলায় লুকিয়ে রাখে। এরা অতি চতুর জাতি। এদের মেয়েরা পথে ছড়ির ও পুরুষরা মৃত্তিকা খণ্ডের সাহায্যে বহু সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও চিত্র এঁকে রাখে।

ভাদক

ভাদকরা বাউরিয়া জাতিরই একটী উপশ্রেণী। এদের মধ্যে খেরী, সাহারানপুর, বদাওন ও মথুরা জিলার ভাদকরা সাংঘাতিক। এরা রেল যোগে ভারতের বহুস্থানে ভ্রমণ করেও বগলী সিঁদ দ্বারা অপকর্ম্ম করে। বগলী সিঁদ দ্বারা দুয়ারের পাশে গর্ত্ত করে উহার মধ্যে হাত দিয়ে এরা খিল ও ছিটকিনি খুলে ফেলেছে। এরা নগদ টাকা অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি চুরি করে, ছোট ছোট গহনা, জুতা, বস্ত্রাদি বিছানার মধ্যে সেলাই করে রাখে। এরা সন্ন্যাসী ও বৈরাগীর বেশে গিরি, পুরি ও দাস প্রভৃতি পদবীতে পরিচয় দেয় এবং সঙ্গে রাঁধা খাবার, আটা ময়দা ও যোয়ারী রাখে। কখনও কখনও এরা গবয়াদি বিক্রেতা গৃহস্থ বলেও পরিচয় দিয়েছে।

ভাগারী

এই দল গুর্জ্জর ও কাথিয়াড়ের বাসিন্দা হলেও সারা ভারতে স্ত্রীপুত্র সহ ভ্রমণ করে বগলী সিঁদ দ্বারা সাধারণ ও সিঁদেল চুরি এবং পকেটমার ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বিবিধ অপরাধ করে। এদের মেয়েরাও

চুরি চামারীতে অভ্যস্ত। এরা দোনাখেল পদ্ধতিতে পারদর্শী ; এ'ছাড়া শিশুদের দেহ হতে অলঙ্কারাপহরণও এরা করেছে।

সাধারণতঃ নাম মাত্র মূল্যে অলঙ্কার বিক্রয় করবে বলে এরা লোভী ও অজ্ঞ ব্যক্তিদের কোনও এক নিরালা স্থানে এনে দর দস্তুর করতে থাকে। ইতিমধ্যে তাদের অপর কয়েকজন পুলিশের পরিচয়ে অকুস্থলে এসে এদের ধরপাকড় সুরু করে। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল লোভী ব্যক্তিদের উপরন্তু ঐ জাল পুলিশদেরও আক্কেল-সেলামী স্বরূপ ঘুষ দিতে হয়েছে। এ'ছাড়া ইতিপূর্ব্বেই পূর্ব্বেকার লোকেরা তাকে অলঙ্কার না দিয়েই তার অর্থ সহ পলায়ন করেছে। এই ভাবে এদের কারসাজীতে মানুষ এদের নিকট পাঁয় পঁয়জার দুইই লাভ করে থাকে।

ভাত্রা

এই দল বাংলা দেশে কলিকাতা ও হাওড়াতে মাত্র অপরাধ করে। এরা যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের অধিবাসী হলেও এক্ষণে এদের সারা ভারতেই দেখা যায়। এরা সাত বা আট জনের দলে বিভক্ত হয়ে নানা স্থান ঘুরে পরে একটী নির্দ্ধারিত স্থানে এসে পুনর্মিলিত হয়। এদের মেয়েরা প্রায়ই সস্তা মনোহরী দ্রব্য ফেরী করে থাকে, আবার ভিক্ষাও করে। এরা মদ্যপান ও জুয়া খেলাতেও অভ্যস্ত।

এরা সাধু সন্ন্যাসী ও বৈরাগীর বেশে বা গণৎকারের ভূমিকায় অভিনয় করে পয়সা উপার্জ্জন করে। কখনও কখনও এরা সৎকার্য্যের বা মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ বা মেরামতির কার্য্যের কিংবা কন্যাদায় উদ্ধারের জন্য ধাপ্পা দিয়ে গ্রামবাসীদের নিকট হতে চাঁদা সংগ্রহ করেছে। এরা নামকরা মঠের মহান্তের চেলারূপেও মঠ মেরামতের জন্য মিথ্যা কথা বলে চাঁদা আদায় করেছে।

ভুর

ভূরগণ মাপের ফিতা ও খুড়ি প্রভৃতি সহ কনট্রাকটার বা ঠিকাদার কিংবা সাধারণ মজুরের বেশে কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, নদীয়া, মেদিনীপুর, হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, দিনাজপুর, মালদহ, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিং, রাজসাহী ও রংপুর জিলাতে সিঁদেল চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, পকেটমার, দোকান হতে চুরি প্রভৃতি অপকর্ম্ম করে বেড়ায়। এদের দুই একজন দুয়ার খুলে বা পাঁচিল-বয়ে গৃহে ঢুকে সাথীদের প্রবেশের পথ সুগম করে দেয় এবং অনায়াসে লৌহ ও কাষ্ঠ সিন্দুক ভেঙে ফেলে। এদের কেউ কেউ পল্লীবাসীদের ভীত করবার জন্য ডিনামাইটও ব্যবহার করেছে। এ'ছাড়া এরা একক সিঁদেল চুরিতেও সুদক্ষ।

এই দল কালী ও শিব পূজারী হিন্দু। এরা নিজেরা মদ পান করে এবং মদ দিয়ে দেব দেবীর পূজাও করে। এদের মধ্যে বিধবা বিবাহের বা নিকা করার চল আছে। বাংলা দেশে এদের বহু ব্যক্তি কুলী মজুর, পাল্কি বাহক, গোশকট চালক প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এরা ফৈজাবাদ, চাম্পারণ, বেনারস, সাবান, শাহাবাদ, গাজীপুর, গোরখপুর, মিরজাপুর, বেলিয়া, জৈনপুর ও আজমগড়ের অধিবাসী।

ডালেরা

এরা ডালা প্রস্তুতকারী মাল্লা জাতির একটী উপশ্রেণী। কেউ এদের দো-আঁশলা কাহার জাতিও মনে করেন। এরা এক্ষণে পুমীপারা গোরগাঁও-এ বসবাস করলেও এরা বেরিলী, রামপুর, মিরাট, বুদাঁও, ও মোরাদাবাদেই বাস করে। এরা ছয় বা সাত জনের দলে বিভক্ত হয়ে সারা ভারত ঘুরে বারয়ারদের পন্থানুযায়ী চুরি চামারী করে থাকে। এরা কোনও এক জনবহুল স্থান বা মেলা প্রভৃতি হতে কিছু দূরে বৃক্ষের

তলায় ছাউনি ফেলে ঐ সকল জনবহুল স্থানে এসে চুরি করে। এদের বয়স্করা নিরীহ দোকানী ও পথচারীদের কথাবার্ত্তায় ভুলিয়ে রাখে এবং ইত্যবসরে এদের বালকেরা তাদের দ্রব্যাদি সরিয়ে নেয়। ধরা পড়লে কিন্তু এরা কখনও নিজেদের বা সঙ্গীদের নামধাম প্রকাশ করে নি।

দারিয়াল কামীশ

এরা বর্ত্তমানে ভুটান জলপাইগুড়ি এবং আসামের সীমান্তে বাস করলেও পূর্ব্বে নেপালের দ্বাবয়া গ্রামে স্বর্ণকার বাসিন্দা ছিল। এরা ব্রিটীশ ভারতে ব্যবসার অছিলায় শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগমন করে এবং বর্ষার শেষ পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া ও দার্জ্জিলিঙ জিলায় অপকর্ম্ম করে। সাধারণতঃ এরা গভীর রাত্রে ডাকাতি ও গৃহের ভিতর ও বাহির এবং বিপনী হতে চুরি করে।

ঢাকা বাঙ্গী

এবা ঢাকা ও মৈমনসিংএর অধিবাসী হলেও ব্রহ্মের বেসিন মংমা জিলায় স্থানীয় অপরাধীদের সহযোগিতায় ডাকাতি করে। এরা ব্রহ্ম ভাষায় কথাও বলে। গ্রামবাসীদের ভয় দেখাবার জন্য এরা চিনে-পটকার আওয়াজ করে, কিন্তু বাধা পেলে নিজেরাও ভয় পেয়ে পলায়ন করে। ডাকাতির সময় মুখে চূণ মেখে লাঠি ও দাও হাতে ঘরে ঢুকে। ব্রহ্মদেশে এদের কেউ কৃষিকার্য্যও করেছে কিন্তু সেখানে নৌকা কখনও চালায় নি। এরা ছদ্মনামে নিজেদের সর্ব্বদাই পরিচিত করে।

যোধপুর মারুতা

এরা মাদ্রাজ ও বাংলায় টাট্টু ও খচ্চর প্রভৃতি নিয়ে ভ্রমণ করে এবং গভর্ণমেণ্টের নামে জাল করা পরিচয়পত্রের সাহায্যে নিজেদের বন্যাপীড়িত

বা দুর্ভিক্ষাঞ্চল হতে আগত দুঃস্থ গ্রামবাসী বলে পরিচয় দিয়ে নাগরিকদের নিকট হতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে। এরা কারন্নাল নাট জাতিরই একটি উপশ্রেণী।

কালান্দার

এরা আন্তর্জাতিক অপরাধী দল এবং এদের অপকর্ম্ম বাংলা, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব্ব আফ্রিকাতে বিস্তৃত। এরা প্রবঞ্চক দল কিন্তু এক্ষণে এদের কেউ কেউ চুরিও সুরু করেছে। এরা ফকিরের বেশে মসজিদ নির্ম্মানের আছিলায় চাঁদা সংগ্রহ করে। এরা কাপড়ের বা ঝুলির ভিতর হতে বেমালুম এক প্রকার দুধের মত শ্বেত রস হাতের তালুতে বার করে এনে লোককে চমৎকৃত করে। এরা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধন দৌলত দ্বিগুণ করে দেবারও লোভ দেখিয়েছে।

এরা লাহোরের অধিবাসী। প্রদেশে এরা হুঁকা ও ছিলিমের ব্যবসা করে, কিন্তু ফকিরের বেশে অর্থাৎ পীত-বস্ত্র পরে, লম্বা চুল ও দাড়ী রেখে এরা পরিক্রমণে বার হয়। এদের কেউ কেউ বাঁদর-নাচও দেখায়।

গাইন

গাইনরা নদীপথে ভ্রাম্যমান গায়কের দল। সান্দার জাতীয়; গান করা পূর্ব্বে এদের উপজীবিকা ছিল। এক্ষণে এদের এক দল স্থায়ী ভাবে বাস করে এবং স্থলে সাধু জীবন যাপন করলেও এদের অপর দল আজও ত্রিপুরা ও ঢাকা জিলায় মেঘনা প্রভৃতি নদীবক্ষে নৌকাযোগে ডাকাতি ও রাহাজানি করে বেড়ায়। এদের পুরুষদের কেউ কেউ ছিপ ফেলে মাছ ধরতে ও জুয়া খেলতে বিশেষ দক্ষ। এদের স্ত্রীলোকদের কেউ কেউ হাটে

বাজারে ফেরী করে বা দোকান করে সস্তা দ্রব্যাদি বিক্রয়ও করে। সারঙ্গ নামক দ্রুতগামী নৌকায় নদীর মধ্যস্থলে এসে এরাও 'আগুন দেবে গো বা তামাক দেবে গো' বলে যাত্রী বা মালবাহী নৌকাগুলি থামিয়ে ডাকাতি করে।

গোন্দা

গোন্দারা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—উড়িষ্যাবাসী 'ওড়িয়া', ছত্রিশগড়বাসী 'লাডিয়া', খোন্দমহলবাসী 'কুন্দলিয়া', কবীরপন্থী 'কাবারিয়া', আঙ্গুলবাসী 'পান' এবং কটকবাসী 'কান্দার'। এরা ভারতের একটী আদিম জাতি। এক্ষণে এরা উড়িষ্যার বামড়া, পাটনা, শোনপুর, সম্বলপুর ও আঙ্গুলে বাস করে। এদের মধ্যে ওড়িয়া, লাডিয়া ও কান্দুলিয়াগণ হিন্দুদের রীতিনীতি ও সামাজিক প্রথা মেনে চললেও দেলদার নামক এক পৃথক দেবতার পূজা করে এবং এদের মৃতদেহ না পুড়িয়ে কবর দেয়। এরা তাঁতি ও গায়কের কাজও করে। কিন্তু সুবিধে পেলেই এরা দিনের বেলায় হাটে বা মেলায় এসে পকেট-মারতে ও রাত্রে পর্ণকুটিরে সিঁদেল চুরি করতে বিশেষ আনন্দ পায়। রাজপথে রাহাজানি ও ডাকাতি করাও এদের কেউ কেউ সম্প্রতি সুরু করেছে।

এরা নিজেদের পাইকমারদের মত পক্ষী শিকারী লুলিয়া বা বিদেশী লুলিয়া বলে পরিচয় দিলেও আসলে পূর্ণিয়া জিলার পূর্ব্বতন বাসিন্দা এবং পৃথক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। এক্ষণে এরা মূলতঃ নেপাল ও পূর্ণিয়া জিলার সীমান্তে ও কাটিহার অঞ্চলে বসবাস করলেও পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও

দার্জ্জিলিং অঞ্চলে অপকর্ম্ম করে। এদের স্ত্রীলোকেরা ভিক্ষা ও পুরুষেরা ঔষধ বিক্রয়ের অছিলায় গৃহে গৃহে ঘুরে চুরির জন্য সুড়ুক সন্ধান নেয় ও সুবিধে পেলে সাধারণ সিঁদেল চুরিও করে। বাধা পেলে এরা প্রতি-আঘাতও হেনেছে।

লোধ

এদের বহু ব্যক্তি অধুনাকালে হুগলী জিলায় ও আসামের চাবাগান অঞ্চলে বসবাস এবং কুলী মজদুরের কাজ করে। পূর্ব্বকালে এরা মেদিনীপুর জিলার বনে জঙ্গলে বাস করতো। এরা ভূমিজ জাতিরই একটী উপশ্রেণী বলে জানা গিয়েছে। এদের কেউ কেউ বিষ-প্রয়োগে গবয়-হত্যা করলেও সাধারণতঃ এরা টাঙ্গি, যষ্ঠি ও তরবারি সহযোগে গ্রামবাসীদের বিতাড়িত করে দিয়ে ডাকাতি অপকার্য্যেই অভ্যস্ত। ডাকাতি কালে এদের একদল বহির্দেশে পাহারারত থাকে এবং অপর দল গৃহে ঢুকে কক্ষের চালা হতে খড় তুলে তা জ্বালিয়ে গৃহ প্রথমে আলোকিত করে। তার পর সারা গৃহ লণ্ডভণ্ড করে তো বটেই এমনকি স্ত্রীলোকদের দেহ হতেও অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। কখনও কখনও একই গ্রামে এরা একই রাত্রে দুইবার কিংবা একই গ্রামে পর পর দুই বাড়ীতে এরা হানা দিয়েছে। পূর্ব্বের লোকে এদের চুয়ার এবং এদের অপকর্ম্মকে চুয়ারী বলে অভিহিত করতো।

থারুভ

থারুরা নাট রূপে পরিচিত নেপাল, পূর্ণিয়া ও দুয়ারবঙ্গের সীমান্তের একটী ভ্রাম্যমান জাতি। এদের মেয়েরা রূপার টাকার পরিমাপের একটী চক্রাকার অলঙ্কার ডান নাকে পরে এবং এদের সাড়ী পরার ধরণ দেশয়ালী

মেয়েদের ন্যায়। কেউ কেউ এদের ব্রজবাসী ও বাওসিয়ার সমগোত্রীয়ও মনে করে। এরা কুচবিহার, গোয়ালপাড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি জিলায় চুরি চামারী ও রাজপথে রাহাজানি ও ডাকাতি করে বেড়ায়। এরা হাটবারে হাট হতে মহাজনদের অনুসরণ করে একটী নিরালা স্থানে আসামাত্র তাদের অর্থ অপহরণ করেছে।

এদের মধ্যে নাটগণ পূর্ব্বে গান গেয়ে বেড়াতো, এইজন্য এদের নাট বলে। নেপাল সীমান্তের থারুদের গায়ের রঙ ফরসা। কুসংস্কারের কারণে নেপালের একটী নদী এদের মেয়েরা কখনও পার হয় না।

স্করফিয়ন

অ্যাঙলো-ইণ্ডিয়ান, অ্যাঙলো-চাইনিজ, অ্যাঙলো-বারমিজ ও ইউরেসিয়ান শ্রেণীর বিপথগামী যুবক যুবতীদের দ্বারা এই দল কলিকাতা শহরে সৃষ্ট হয়। প্রথমে এই দলটী ব্ল্যাক মেইলিঙ করবার জন্য তৈরী হয়েছিল। চৌরঙ্গিতে রাত্রে কেউ মোটর রেখে হোটেলে বা সিনেমাতে গেলে এদের দলের একটী সুন্দরী মেয়ে অতর্কিতে ঐ গাড়ীতে উঠে বসে থাকতো। এর পর মালিক বা ড্রাইভার গাড়ীতে ফিরে এলে ঐ মেয়েটী টাইপকরা কাগজ তার হাতে তুলে দিত। এই কাগজটিতে লেখা থাকতো, 'ডোণ্ট সাউট্। গিভ্ মিই রূপিস্ ২০০, ইফ ইউ সাউট, আই উইল সাউট। মেনি ষ্ট্রেঙমেন বিহাইণ্ড মি। আই উইল চার্জ্জ ইউ ফল্‌সলিই।" লোকটী এই সময় দেখতে পেতো বহু গুণ্ডাপ্রকৃতির অ্যাঙলো যুবক চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দলের কেউ কেউ প্রবঞ্চনা অপরাধেও এবং সিঁদেল চুরিতেও লিপ্ত আছে। পরে এদের একটী দল 'রেড্ হট্ স্করফিয়ান গ্যাঙ' নামে একটী ডাকাত দলেরও সৃষ্টি করে। এই সম্পর্কে পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে উল্লেখিত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গ্যাঙ কেস্

দ্রষ্টব্য। এই দল যদি বংশানুক্রমে গড়ে উঠতে পারে তা'হলে এরা আরও অধঃপতিত হয়ে এক দুর্দ্ধর্ষ অপরাধী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করবে।

[বাঙলা দেশে উপদ্রবকারী উপরোক্ত কয়েকটী জাতি ব্যতীত বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য স্থানে আরও শত শত অনুরূপ জাতি আছে। উহাদের মধ্যে বেদার জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ ছিল বাগদি ও শেরশা-দেদীয়া মুসলমান প্রভৃতির ন্যায় পূর্ব্বতন সেনাবাহিনী। এদের পিতৃপুরুষগণ টিপু সুলতানের সেনা ও সেনানায়ক ছিল। আজ তারা মাদ্রাজের বনে জঙ্গলে ঘুরে ডাকাতি করে বেড়ায়।]

অপরাধ-বিজ্ঞান—গবেষণা

ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীন ঋষি ও মনীষিগণ বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রসঙ্গ ক্রমে বহু তথ্য প্রকাশ করে গেলেও ভারতের মধ্য ও আধুনিক যুগে এই বিজ্ঞানের চর্চ্চা আশানুরূপ হয় নি। বরং প্রাচীন হিন্দুরা অপরাধের মনোবিজ্ঞান, প্রাচীন পুলিশি কর্ম্মকৃত্য, রাজকীয় গুপ্তচর বিভাগ এবং শাসন ও আইন সম্বন্ধে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, উপনিষদ, বৌদ্ধজাতক এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ প্রচার করে গিয়েছেন। এ'ছাড়া 'ফিসিওগনমী' সম্বন্ধেও তাঁরা বহু পুস্তকে আলোচনা করেছেন। বাৎসায়ন প্রভৃতির প্রণীত গ্রন্থে দেহের আকৃতি হতে যে স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতি জানা সম্ভব তা বিস্তারিত রূপে বলা হয়েছে। য়ুরোপে লম্ব্রসো প্রভৃতি দ্বারাই এই বিদ্যার প্রথম অনুশীলন হয়। আমি অবশ্য এই ফিসিওগনমী বিদ্যাতে আদপেই বিশ্বাসী নই, এই কারণে এই বিদ্যা সম্পর্কে কোনও দিন মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করে নি।

[আজিকার গণতন্ত্র সম্বন্ধেও যে তাঁরা পরীক্ষা করে গিয়েছেন তা পূর্ব্বতন প্রবন্ধে বলা হয়েছে। আধুনিক গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির স্বার্থে লঘুসংখ্যক ব্যক্তিদের ক্ষতি স্বীকার। বর্ত্তমান ইউনিয়ন বোর্ডের ব্যাপারেও দেখা যায় যে, দশখানি গ্রামের মধ্যে ছয়খানির গ্রামবাসী একজোট হয়ে ঐ বোর্ডের শাসনযন্ত্র দখল করে নিজেদের গ্রামগুলির পথ ঘাটের উন্নতি সাধন করেছেন কিন্তু বাকী চারখানি গ্রামের পথ ঘাটে বৎসরান্তরেও এক ঝুড়ী মাটীও পড়ে না। এর কারণ সকলেব সকল গ্রামের উপর সমান স্বার্থ নেই। এই অসুবিধা দূর করার জন্মে প্রাচীন হিন্দুরা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ইউনিট রূপে মাত্র একটি গ্রামকে গণতন্ত্রের জন্য বেছে নিয়ে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অধীন করেছিল। কারণ প্রত্যেক গ্রামবাসীরই তাদেব গ্রামের প্রতিটী অংশের উপর দরদ আছে; যেহেতু গ্রামের প্রতিটি অংশে তাঁদের সম্পত্তি ও জ্ঞাত গোষ্ঠী থাকায় মুহুর্মুহুঃ তাদের যত্রতত্র যাতায়াতের প্রয়োজন হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ বুঝেছিলেন যে ক্ষুদ্রতম ইউনিট কিংবা বৃহত্তম ইউনিট অর্থাৎ প্রদেশবিহীন বিরাট দেশে একমাত্র গণতন্ত্র সফল হতে পারে; বিরাট এক সমগ্র দেশের গণতন্ত্রে নিজ প্রদেশের বা জেলার স্বার্থ বজায় রাখা কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি।]

হিন্দু ভারতের পতনের পর মোসলেম রাজত্বকালে অপরাধ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত পদচিহ্ন টিপচিহ্ন প্রভৃতি বিদ্যা হিন্দু গ্রামবাসীরা বহুদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিল। ইংরাজ রাজত্বকালে ইংরাজগণ এই উভয়বিদ্যা তাদের নিকট হতেই উদ্ধার করেন। গবেষণায় বহু ভুল লিখে গেলেও এহ বিষয়ে য়ুরোপীয়গণের প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য।

এদের মধ্যে প্রায় সকলেই জেলার হাকিম, পুলিশসাহেব বা অন্যান্য শাসক ছিলেন। তাঁরা যেখানেই কর্ম্মেবহাল হয়েছেন সেইখানেই

সরকারী কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেইখানকার মানুষদের আচার ব্যবহার সামাজিক ইতিহাস আদি সংগ্রহার্থে অগ্রণী হয়েছেন। কয়জন ভারতীয় অধস্তন কর্ম্মচারী তাঁদের সাহায্য করলেও তা তাঁরা করেছেন তাঁদের দ্বারাই উৎসাহিত হয়ে। কি মহামূল্য রত্নরাজী তাঁরা সাহেবদের জন্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন তা তাঁরা কোনও দিনই উপলব্ধি করেন নি, তাই সাহেবরা এই সকল কার্য্যের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকলেও তাঁদের ঐ ভারতীয় কর্ম্মচারীদের নাম আজ আর কেহ জানে না।

সর্ব্ব প্রথম Dr. John Freyer ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর "নিউ একাউণ্ট অব্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড পারসিয়া" নামক পুস্তকে ভারতের সিঁদেল চোরদের একটী অপপদ্ধতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁর বিবরণ হতে জানা যায় যে সেই যুগের সুরক্ষিত প্রাসাদ ও দুর্গ-প্রাচীর বা পর্ব্বতস্থ প্রাসাদ উল্লঙ্ঘন করবার সময় তস্করগণ ঘোরপাদ বা গোহাড়্গিল জীবের লেজ ধরে উপরে উঠতো। এর পর ভারতীয় অপরাধ বিজ্ঞানের যা কিছু চর্চ্চা তা ব্রিটিশ রাজত্ব কালে করা হয়। তবে এইরূপ চর্চ্চা কেবলমাত্র স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতির ইতিহাস সঙ্কলন এবং ভারতে পূর্ব্ব হতে প্রচলিত টিপ বিদ্যা ও পদচিহ্ন বিদ্যার উদ্ধার ও উহার উন্নত করণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মনস্তাত্বিক অপরাধ বিজ্ঞানের চর্চ্চা এঁদের কেহ কোনও দিনই করেন নি। তবে ডাক্তারি বিদ্যার প্রচলনের সহিত কিছু কিছু অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় ফোরেন্সিক সায়েন্স প্রয়োজন মত গড়ে উঠেছিল। তবে ইহা য়ুরোপীয় ডাক্তারী বিদ্যা হতে ধার করা বিদ্যা, সুতরাং ভারতে বসে কেহ ইহা আবিষ্কার করেন নি।

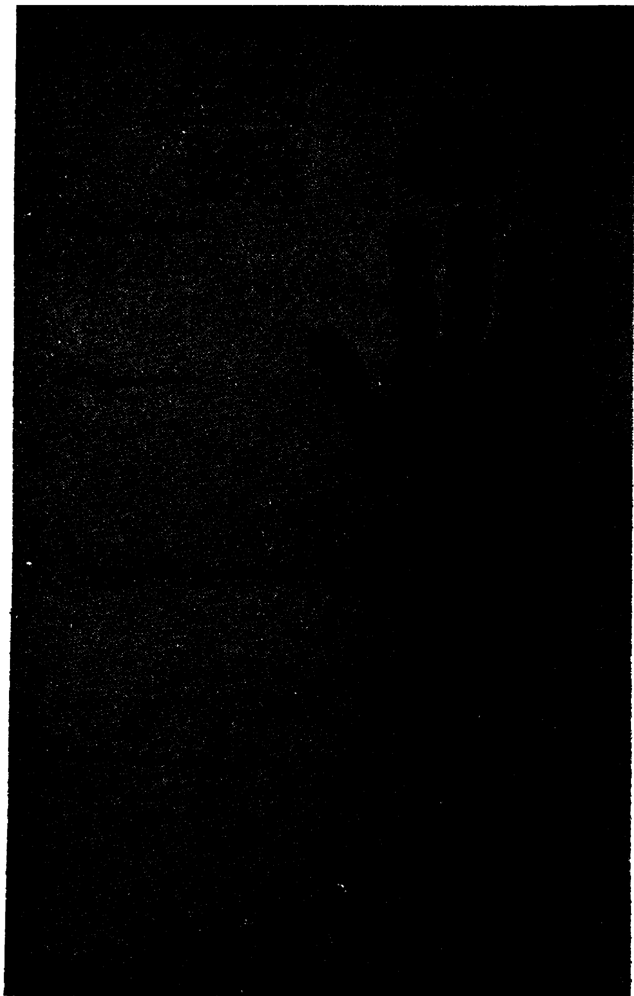
M. Kennely সাহেব তাঁর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ক্রিমিন্যাল ট্রাইব পুস্তকে, গাপ্পারাও নাইডু তাঁর ভারতের ক্রিমিন্যাল ট্রাইব পুস্তকে Majors Gumthrope তাঁর বোম্বাই, বেরার ও সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের

ক্রিমিন্যাল ট্রাইব পুস্তকে, মহম্মদ আবদুল গণি সাহেব তাঁর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ট্রাইব পুস্তকে, F. C. Dalay, C. I. E. I. P. সাহেব ক্রিমিন্যাল ট্রাইব সম্পর্কীয় পুস্তকে, ভারতের ক্রিমিন্যাল ট্রাইব বা স্বভাব দুর্ব্বৃত্ত জাতিদের জীবনাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তবে এই বিষয়ে আরও গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল এবং এখনও আছে।

পদচিহ্ন বিদ্যা যে ইংরাজগণ ভারতের এক অজ্ঞ মানব শ্রেণীর নিকট হতে উদ্ধার করেছেন, এ কথা আজ সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু জগতে প্রচারিত আছে যে, ভারতের বাংলা দেশে টিপ বিদ্যা প্রথম আবিষ্কৃত হলেও উহার আবিষ্কারক একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান। আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে মানি না, কারণ এই সম্পর্কে আমি অন্যসূত্রে ওয়াকিবহাল। আমার পিতামহ রায়বাহাদুর কমলাপতি ঘোষাল (1822—1908) তৎকালীন বাংলা পুলিশের প্রথম ভারতীয় এসিসটেণ্ট সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিদের নিকট বলেছেন যে, এ সময় হুগলী জিলার জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ বিদ্যার মূল তথ্য ঐ জিলার গ্রামবাসীদের নিকটই জ্ঞাত হয়েছিলেন।

আদিমযুগে গুহাবাসীরা নিজেদের পদচিহ্ন হতে গুহা বা সাথীদের খুঁজে বার করতো। ভাগবতের একটি শ্লোকে উল্লেখ আছে যে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের পদচিহ্ন হতে রাধার পদচিহ্ন খুঁজে বার করেছিলেন। হিন্দু ভারতে পূর্ব্ব হতেই পদচিহ্ন-বিদ্যা প্রচলিত ছিল।

অবশ্য চীন দেশেও টিপ সহি গ্রহণের প্রথার প্রচলন ছিল। কিন্তু ইহা ভারতের পূর্ব্বাংশ হতে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত চীনে প্রচারিত হয়েছিল কি'না তাহা জানা যায় নি। ভারতে টিপ-বিদ্যার প্রথম সূচনা হয় হিন্দু রাজত্বকালে হস্তরেখা বিদ্যার মধ্যে। হস্তরেখা পাঠের জন্য সেই যুগের জ্যোতিষীরা বহু ব্যক্তির অঙ্গুলি সমেত সমগ্র



সম্রাট সাজাহানের পাঞ্জা

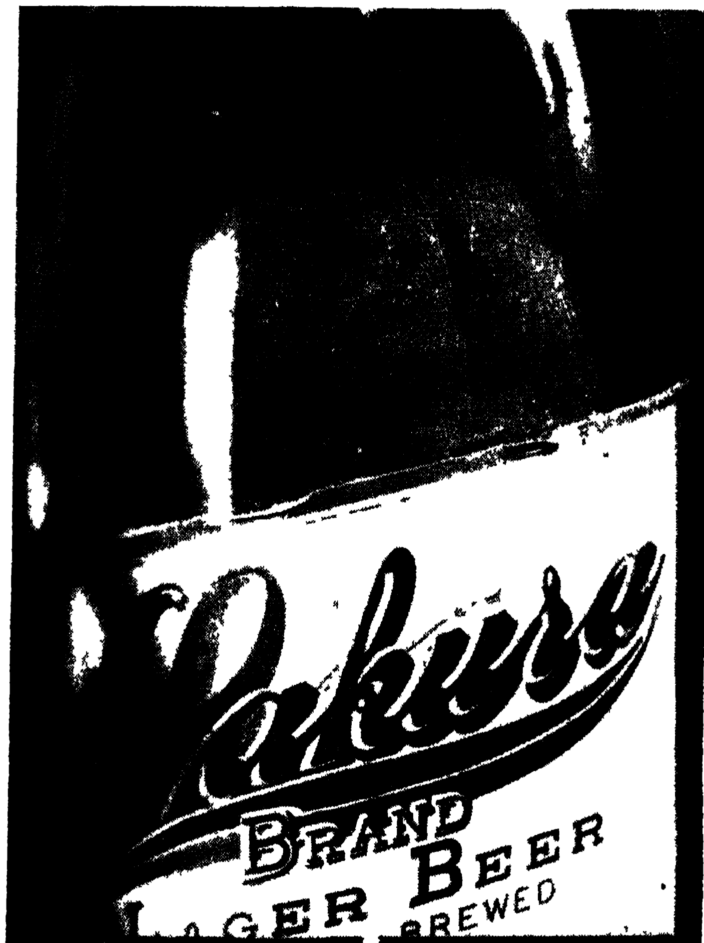
হাতের ছাপ স্বগৃহে তুলনা করার জন্যে রক্ষা করতেন। পরে মুঘল রাজত্বকালে বাদশাগণ ফরমান বা আদেশপত্র সমূহে অঙ্গুলী সহ পাঞ্জা অঙ্কিত করে দিতেন। ১৯৩৩ সালে আমি ও বর্ত্তমানে কলিকাতা পুলিশের ডেপুটী কমিশনার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী তৎকালীন ইমপিরিয়াল লাইব্রেরী হতে সম্রাট সাজাহানের একটী অনুরূপ পাঞ্জাসহ ফরমানের ফটো তুলে এনেছিলাম। ঐ ফটোর একটী প্রতিকৃতি বর্ত্তমান পুস্তকেও উদ্ধৃত করা হলো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে টিপ বিদ্যার আবিষ্কার ও অনুশীলন বাংলার হুগলী জিলাতেই সর্ব্বপ্রথম হয়।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম হারচেল নামক এক ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীব একজন কর্ম্মচারীরূপে বাংলায় কর্ম্মরত থাকাকালীন লক্ষ্য করেন যে হিন্দুগণ পাঠশালার শিক্ষকদের, জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারীদের, মুদী প্রভৃতি দোকানের বিক্রেতাদের এবং মজতুর দ্বারবান প্রভৃতিদের বেতন দিবার সময় ঐ সকল ব্যক্তিদের দস্তখতের সহিত ভূষা কালির সাহায্যে উহাদের অঙ্গুলির টিপও গ্রহণ করে থাকে। দলিল প্রভৃতি তৈরী করার পরও উহার উপর সহির সহিত বা উহা ব্যতীরেকে টিপসই লওয়া হতো। এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে হিন্দুগণ তাঁকে বলে যে, সই জাল করা সম্ভব হলেও টিপসই জাল করা সম্ভব নয়। এই সকল হিন্দুগণ ইহা কিরূপ ভাবে বিচাব করা যায় তার পদ্ধতি সম্বন্ধেও তাঁকে অবহিত করে দেয়। এর পর ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ হুগলী জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হলে তিনি পেনসনের ও কয়েদিদের কাগজে তাদের টিপ গ্রহণ করার পদ্ধতির প্রচলন করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হাসেল সাহেব রেজিষ্ট্রেশন অফিসেও টিপ গ্রহণ পদ্ধতির প্রচলন করেন। পরে এই পদ্ধতি ইংল্যাণ্ডেও প্রচারিত হয় এবং সেই দেশের স্যার ফ্রানসিস গ্যালটন সাহেব বহু গবেষণা করে ইহার উন্নতি সাধন করেন। ইতিমধ্যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে

বাংলার পুলিশ বিভাগ অপরাধীদের সনাক্তকরণের জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করে কলিকাতায় একটী টিপ-চিহ্ন-কেন্দ্র স্থাপন করে উহা চালু করে দেয়। বাংলা পুলিশের অনুকরণে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেও পুলিশ-বিভাগ অপরাধী নির্ণয়ার্থে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে একটী টিপ-চিহ্ন-কেন্দ্র স্থাপন করেন।

এই সময় প্রশ্ন উঠে যে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের টিপেরও পরিবর্ত্তন হয় কি না। এই সম্পর্কে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীর রেজিষ্ট্রেশন অফিসের দলীলে তৎকালীন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্যার উইলিয়াম হাচেল সাহেবের নির্দ্দেশে যাদের টিপ-সই গ্রহণ করা হয়েছিল তাদের খুঁজে বার করে পুনরায় তাদের টিপ গ্রহণ করবার জন্য গবেষক স্যার ফ্রানসিস্ গ্যালটন সাহেব ১৮৯২ সালে ঐ সময়কার হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ডিউক সাহেবকে অনুরোধ করে পাঠান। এই দুরূহ কার্য্যের ভার পড়ে কিন্তু তখনকার রেজিষ্টার বাবু রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। তিনি নিম্নোক্ত কয় ব্যক্তিকে খুঁজে বার করে আপন কর্ত্তব্য সমাধা করেন। ইনি তুলনা করে দেখেন যে এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে ঐ সকল ব্যক্তির অঙ্গুলীর টিপের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নি। এই সম্পর্কে নিম্নের তালিকাটী প্রণিধান যোগ্য।

		১৮৭৮ খৃঃ দলীলের নম্বর	১৮৯২ খৃঃ তৎকালীন বয়স
(১)	সাবুরণ বিবি	১৬২	৬৫
(২)	দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী	২৮	৬৪
(৩)	গিরিশচন্দ্র রায়	৪৩	৫২
(৪)	বুয়ারামদাস অধিকারী	২২	৪২



মদের বোতলে অঙ্কিত আঙুলের ছাপ বিশেষ পাউডারের সাহায্যে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে। (লেন্সের সাহায্যে দ্রষ্টব্য)

		১৮৭৮ খৃঃ দলীলের নম্বর	১৮৯২ খৃঃ তৎকালীন বয়স
(৫)	শ্রীনাথ শেঠ	৫১	৬২
(৬)	গগন শেঠ	৫৮	৫২
(৭)	মাধবচন্দ্র রায়	৫৪-৫৬	৫৪
(৮)	গিরিশচন্দ্র পণ্ডিত	৩২৯	৪৬

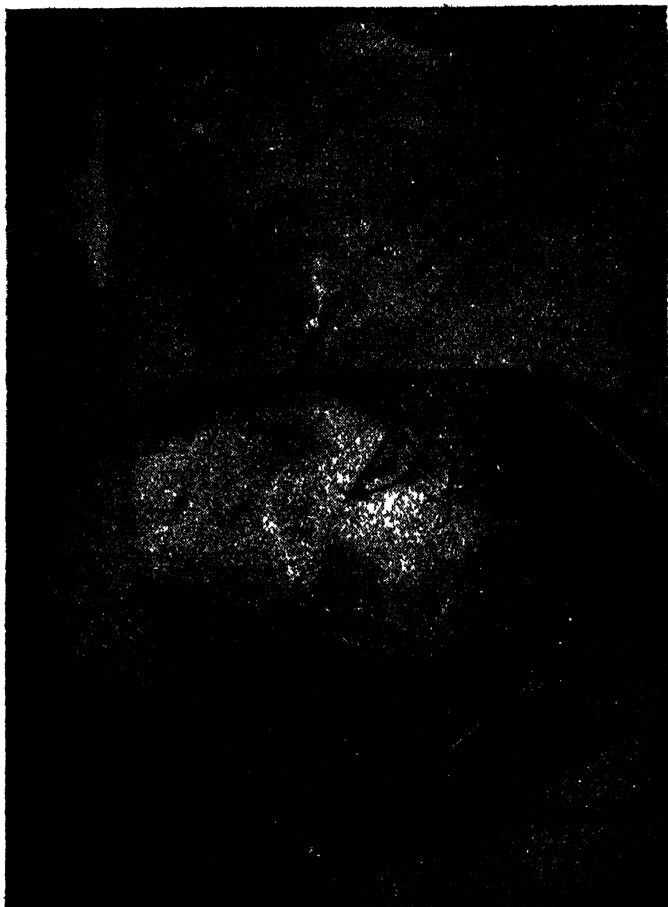
ইংল্যাণ্ড ও য়ুরোপের ন্যায় এই সময় হতে বাংলার টিপ-অফিসেও এই সম্পর্কে বহু গবেষণা চলেছিল। কারণ শীঘ্রই দেখা যায় যে সংগৃহীত সহস্র সহস্র টিপ-পত্র সমূহ হতে প্রয়োজনীয় টিপ-পত্রটী খুঁজে বার করা দুষ্কর। তৎকালীন ইনেসপেকটার জেনারেল অব্ পুলিশ একজন ইংরাজ মনীষী, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ডেপুটি সুপার-ইন্-টেনডেণ্ট অব্ পুলিশ, এন, হক্ সাহেবের সাহায্যে টিপ-পত্র সমূহের শ্রেণী বিভাগ সূচক ফরমূলা সমূহের আবিষ্কার করেন। এ'ছাড়া এই বিভাগের অপর একজন ডেপুটি সুপার-ইন্-টেনডেণ্ট বাবু হেমচন্দ্র দত্ত ১৯২০ সাল বরাবর শ্রেণী বিভাগের "সিঙ্গিল ডিজিট সিসটেমের" আবিষ্কার করেন। এর পর টিপ-বিদ্যার কোনও উল্লেখযোগ্য অবদান ভারতীয়দের মধ্যে হয় নি। যে সকল টিপ অলক্ষ্যে মসৃণ দ্রব্যাদিতে অঙ্কিত হয় তা ব্রাস ও পাউডারের সাহায্যে প্রস্ফুটিত করবার এবং ভারি দ্রব্য বা গেলাস কলস প্রভৃতির অভ্যন্তর ভাগ হতে ফো'লগান পেপারের সাহায্যে তুলে আনবার উপায় সম্বন্ধে আমি পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করেছি। এই সকল উপায় অবশ্য য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক য়ুরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সম্পর্কে দুইটী চিত্তাকর্ষক ফটো চিত্রও উদ্ধৃত করা হলো।

এর পর অবশ্য বাঙ্গালীদের মধ্যে বর্ত্তমান ইনেসপেকটার জেনারেল

অব্ পুলিশ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয় মোডাস্ অপেরেণ্ডাই বুরোর রেবর্ড রক্ষণ রীতি সম্পর্কে গবেষণা করে উহার উন্নতি করেন।

উপরোক্ত গবেষণোচিত গুণ ব্যতীত সুবিচার ও কৃতজ্ঞতা গুণ দুইটীও ইংরাজদের মধ্যে বিশেষ রূপে দেখা গিয়েছে। একজন ইংরাজ ও একজন ভারতীয়ের মধ্যে বিবাদ হলে এদের কেউ কেউ স্বজাতীয়দের পক্ষ নিয়েছে বটে, কিন্তু দুইজন ভারতীয়ের মধ্যে ঐরূপ বিবাদ হলে তারা চুল-চিরা বিচার করেছে। তবে এ'ও দেখা গিয়েছে যে, একজন ইংরাজ বিচারক স্বজাতিত্ব বোধের জন্য একজন স্বজাতীয় ব্যক্তিকে ফাঁসীর স্থলে জেল দিয়েছে, ১০ বছর জেলের স্থলে ১০ মাস জেল দিয়েছে, কিন্তু তাকে তার দোষের জন্য একেবারে কখনও মুক্তি দেয় নি। এদের সেন্স অব্ জাষ্টিসের জন্য এখনও এক একজন অজ্ঞ ঝাড়ুদার আমাদের কাছে না এসে লালমুখো অ্যাংলো সার্জ্জেণ্টের কাছে প্রথমে আসে। কারণ আজও তাদের বিশ্বাস এরা সুবিচারই করবে। আজও পর্য্যন্ত অজ্ঞ গ্রামবাসীরা কলহের সময় পুরুষানুক্রমে অভ্যাসের কারণে বলে উঠে 'ভয় করি না, আমরাও কোম্পানীর রাজত্বে বাস করি। এই গুণের জন্যই ভারতবাসীরা প্রায় বিনা বা নামমাত্র যুদ্ধেই দেশটা এত সহজে তাদের শাসনাধীন করে দিয়েছিল বলেই আমার বিশ্বাস।

এই সুবিচারিতা জ্ঞান ছাড়া তাদের গুণ ছিল ডিসিপ্লিন ও শান্তি রক্ষা। এইজন্য তারা নির্ম্মম হতেও কখনও কুণ্ঠিত হয় নি। তারা জানতো যে ছোট অপরাধকে বাড়তে দিলে বড় অপরাধের প্রাবল্য ঘটে। এইজন্য ডিসিপ্লিন ও সামান্য শান্তি ভঙ্গের কারণে তারা কামান দাগতেও কখনও পেছপাও হয় নি। তবে শাসন কার্য্যে তাদের দরদের কখনও অভাব হয় নি। আমাকে ডিসিপ্লিন সম্পর্কে কোনও এক ইংরাজ নিম্নোক্ত এক উপদেশ দিয়েছিল।



ভারী আলমারীর উপর অঙ্কিত ছাপ বিশেষ পাউডার ও
ফোলিয়ন পেপারের সাহায্যে তুলে নেওয়া হয়েছে।
(লেন্সের সাহায্যে দ্রষ্টব্য)

"ডিসিপ্লিন রাষ্ট্র কাঠামোর মূল ভিত্তি। তুমি যদি অধস্তনদের উপর অতিশয় 'সফ্‌ট' হও, তা'হলে তুমি তার ক্ষতি করবে। কারণ চিরকাল সে তোমার কাছেই কাজ করবে না। ক্ষমা পেয়ে পেয়ে গাফিলতী করা তার এক অভ্যাসের সামিল হয়ে যাবে। পরে অন্যত্র বদলী হয়ে অন্য এক অফিসারের কাছেও সে ঐ একই রূপ গাফিলতি করায় তার চাকরীই চলে যাবে। এই ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে তার চাকরিটী হারানোর জন্য তুমিই হবে দাযী। কারণ তোমার অহেতুক উদারতার জন্যই সে ওরূপ অভ্যাস অর্জ্জন করেছে। এ'ছাড়া তোমার অধীনে এইরূপ কয়েকজন প্রশ্রয়প্রাপ্ত অলস অফিসার তৈরী করে তুমি সমুদয় বাহিনীর দক্ষতার মনের হ্রাসও ঘটাচ্ছ।

ইংরাজরা একোনমিক্যালী আমাদের নিদারুণ এক্সপ্লয়েটেড্ করলেও অন্যান্য কয়েকটী বিষয়ে আমাদের উপকারই করেছে। একদিক থেকে যেমন তাদের ফিসিক্যাল অপেক্ষা কালচারাল কণ্ডকোয়েষ্ট কমপ্লিট্ তেমনি অপর দিকে তারাই আমাদের হারানো কালচার উদ্ধার করতে সাহায্যও করেছে। কিন্তু শেষের দিকে এদের পূর্ব্বতন সুবুদ্ধির হ্রাস ঘটে এবং এদের কারো কারো মন কোন কোনও দিক থেকে হীন হয়। এদের মধ্যে স্বার্থপরতা ও দাম্ভিকতা দানা বাঁধে। এদের পরবর্ত্তী পলিশি 'ডিভাইড্ এণ্ড রুলই' এদের মনের মলিনতার জন্য অধিক দায়ী। আখেরে দেখা গিয়েছে যে অন্যায় একবার আরম্ভ হলে উহা একটী মাত্র ক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকে না, উহা মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যাপকতা লাভ করে অনভিপ্রেত স্থানেও সন্নিবেশিত হয়। এমন কি উহা নিজেদের বিরুদ্ধেও প্রযোজিত হয়ে নিজেদেরই সর্ব্বনাশ সাধন করে। শেষের দিকে য়ুরোপীয়দের বাটীতে চুরি হলে ডেপুটীদের নিজেদের তদন্ত করতে হবে,

এমন বিভেদকর আদেশ দিতেও এদের একজন কুণ্ঠিত হয় নি। এই সম্পর্কে কয়েকটী হাস্যকর গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক থানায় বাহাল থাকাকালীন একদিন রাত্রে বড়কর্ত্তা টেলিফোনে জানালেন, 'তোমার এলাকা থেকে টেলিফোনে জানাচ্ছে যে সেখানে ভারি গোলমাল, অথচ তোমরা কিছুই করছো না।' বিব্রত হয়ে আমি জানতে চাইলাম, 'কোথায় স্যার?' ততোধিক বিরক্ত হয়ে বড়কর্ত্তা জানালেন, সাম্ হোয়েয়ার এ্যাট্ ষ্টোর রোড্। গো এণ্ড ফাইণ্ড ইট আউট।' এই বলে বড়কর্ত্তা টেলিফোন রেখে দিলেন কিন্তু আমি পড়ে গেলাম অকুল পাথারে। অগত্যা কপাল ঠুকে ষ্টোর রোড্ বয়ে চলতে থাকলাম। সহসা লক্ষ্য করলাম একজন ইংরাজ একটী গেটের নিকট রুদ্রমূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে যেন কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে তিনি ক্রুদ্ধভাবে স্বভাষায় এইরূপ উক্তি করেছিলেন, 'দেখো বাপু, ব্যাপার হয়েছিল এই যে রাত্রি দেড় ঘটিকায় আমার বাড়ীর কুকুরটা চেঁচাতে আরম্ভ করে। এরপর তার সঙ্গে রাত্রি দুই ঘটিকায় চেঁচানীতে যোগ দেয় আমার দুই প্রেতিবেশীর দুইটী কুকুর। এবং তার পর তাদের চেঁচানী শুনে পথ হতে রাস্তার তিনটী কুকুর চেঁচাতে চেঁচাতে এখানে এসে জুটে। কিন্তু বারে বারে টেলিফোন করা সত্ত্বেও এই গোলমাল থামাবার জন্য থানা হতে এখনও কেউ এলো না।' এই সম্পর্কে আর এক দিনের একটী ঘটনার কথাও বলা যেতে পারে। এই দিন অমুক সাহেবের বাড়ীতে একটী চুরি হওয়ায় আমি আমার একজন জুনিয়ার অফিসারকে সেখানে তদন্তে পাঠাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই অফিসারটীর বর্ণ ছিল কুচকুচে কালো। তাঁকে দেখে বাড়ীর মেম সাহেব বলে উঠলেন, 'ইউ ডোণ্ট লুক লাইক এন অফিসার। আই ওয়াণ্ট এ ফেয়ার অর এ ব্রাউন অফিসার।' সৌভাগ্য ক্রমে আমার সেকেণ্ড

অফিসারের বর্ণ ছিল গৌর এবং আমি ছিলাম ব্রাউন বা শ্যামবর্ণের। আমি খবর পেয়ে আমার ঐ গৌরবর্ণের অফিসার সহ সেখানে গিয়ে বললাম, 'এ সব কি কথা আপনি বলছেন। আপনাদের বাইবেল গ্রন্থ কালো কালীতে লেখা হয়েছে, না সাদা কালীতে লেখা হয়েছে?"

তবে সকল সাহেব কোনও দিনই উপরোক্ত রূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়নি। বরং স্বদেশ হতে হুকুম আসা মাত্র যে ভাবে দেশীয় অফিসারদের নিকট অফিসগুলির ভার অর্পণ করে তারা এই দেশ ছেড়ে চলে গেলো তা বিশেষ রূপে প্রশংসনীয়। তারা যে সকল তৈরী বিষয় ও প্রতিষ্ঠান আমাদের উত্তরাধিকারী সূত্রে দিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে গবেষণামূলক মনোবৃত্তিকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। গবেষণা করবার জন্য বহু তথ্য তালিকাও তাঁরা সংগ্রহ করে রেখে গিয়েছেন যা থেকে আমরা বহু সত্য সংগ্রহ করতে পারি। এ'ছাড়া পুরাতন সংবাদ-পত্র হতে আমরা এদেশের সাময়িক অপরাধ সমূহের ইতিহাস উদ্ধার করতে সক্ষম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী মাত্র ঘটনা আমি পরিশিষ্ট 'ক'এ উদ্ধৃত করলাম। তবে তাঁরা আমাদের এমন ভাবে ইংরাজী ভাবাপন্ন করে গিয়েছেন যে, আজ আমরা একটি 'অভিযোগ' পর্য্যন্ত আইনের ধারানুযায়ী বাংলাতে বা হিন্দিতে লিপিবদ্ধ করতে পারি না। কিন্তু এই কার্য্য যে অসম্ভব নয় এবং তা যে দেশীয় ভাষায় লেখা যায় তার নমুনা স্বরূপ কয়েকটী বাংলা অভিযোগ পরিশিষ্ট 'খ'এ লিপিবদ্ধ করলাম।

এক্ষণে সব চেয়ে বড় কথা অপরাধ সম্পর্কে মনস্তাত্বিক গবেষণা, যা সাহেবরা কোনও দিন করেন নি। এই সম্পর্কে তাদের বড় বাধা ছিল এদেশের সমাজ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা। সাধারণ ভাবে অপরাধীরাও মনস্তাত্বিক উপায়ে মানুষকে ঠকায় অথচ মনস্তত্ব সম্বন্ধে

এদেশের রক্ষীদের কোনও শিক্ষাই দেওয়া হয় না। এইজন্য কম ক্ষেত্রেই তাঁরা অপরের মনের নাগাল পেতে পেরেছেন। এই সম্পর্কে নিম্নের একটী বিবৃতি প্রণিধান যোগ্য।

"আমি বিরক্ত হয়ে ফরিয়াদীকে বললাম, 'ও কথা কি বললেই হলো না'কি। এই তো আপনি টাকা পেয়েছেন বলে রসিদ সই করে দিয়েছেন।' পরে অবশ্য আসামীর স্বীকারোক্তি শুনে আমি আমার পূর্ব্ব ধারণা বদলে ফেলি। ফরিয়াদীর সৌভাগ্য ক্রমে আসামী তার বিবৃতিতে এইরূপ বলেছিল, 'প্রবঞ্চিত ব্যক্তি ঐ দিন বিহ্বল হয়ে আমাদের অফিসে এসে টাকা ফেরত চাইতে আমি বললাম, 'আচ্ছা, এই সম্বন্ধে একটা মিটমাট আমরা করবো, কিন্তু এ সপ্তাহে নয়। আচ্ছা, দিন তো এই কাগজে লিখে আপনার নাম ও ঠিকানাটা, যাতে আপনাকে দরকার হলে পাওয়া যেতে পারে।' এই কথা বলে আমি একটা 'আধখানা' কাগজের উপর দিকটা মুঠি করে ধরে তার নীচেটা তাকে দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু ফরিয়াদীর মন তথনও পর্য্যন্ত এমনই উতলা ছিল যে, সে এবারেও আমার ধাপ্পায় ভুলে সেইখানে তার নাম ও ঠিকানাটা স্বহস্তেই লিখে দিলে। এর পর আমরা টাইপ করে ঐ সই'এর উপরে মানানসই ভাবে লিখে দিলাম, আমি দুই হাজার টাকা বুঝিয়া পাইলাম,' ইত্যাদি।"

ইংরাজ শাসকগণ অবশ্য শাসন সম্পর্কেও ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের পরিচয় দিতেন। প্রমাণ স্বরূপ খেতাব দিয়ে ভুলিয়ে রাখা, চাকুরিতে বদলীর ব্যবস্থা, অবিরাম প্যারে করানো, গ্রাম্য নিরক্ষর ব্যক্তিদের নিম্ন পদ সমূহে গ্রহণ প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। সকলেই অর্থের ও পদের কাঙাল নয়, অনেকে মান সম্মানের পক্ষপাতী। এ'ছাড়া অর্থ ও পদ সীমাবদ্ধ, কিন্তু মর্য্যাদা জ্ঞানের সীমা নেই।

এইজন্য তারা বহু অবৈতনিক সম্মানর্হ পদের সৃষ্টি করেছিল। একই স্থানে অধিক দিন বাহাল থাকলে মানুষের এতো অধিক ব্যক্তির সহিত বাধ্যবাধকতা আসে যে তার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব বোধ আসতে বাধ্য। বেশী লোকের সহিত জানা-শুনাতে সুবিধার ন্যায় অসুবিধাও আছে। অনেক সময় অধস্তনদের সহিত উর্দ্ধতনদের বনিবনা নাও হতে পারে। এইরূপ বা অন্য কোনও অঘটন ঘটলে একজনের অন্যত্র বদলীর দ্বারা সমস্যার সমাধান ঘটে। এই একই কারণে আপন নিবাস স্থানে কাহাকেও নিয়োগ করা হয় নি। অবিরাম প্যারেড দ্বারা ডিসিপ্লিন অভ্যাস দ্বারা মজ্জাগত হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে আদেশ শোনা ও তামিল করার জন্য মানুষের মন সদা উন্মুখ। ইংরাজগণ স্বদেশেও আর্ম্মি ও পুলিশে সাবধানে লোক নিযুক্ত করে থাকেন। কোন কোনও য়ুরোপীয় দেশে কর্তৃপক্ষকেই পুলিশের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বার করতে হয়েছে, কিংবা সরাসরি গ্রাম হতে হাল চাষীদের মধ্য হতে লোক এনে তাদের বিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হয়েছে। শহুরে লোকেরা নিজেদের মনে করে সবজান্তা ও মন থাকে তাদের 'প্রিডিস্পোসড্' কিন্তু গ্রাম্য লোকের মন থাকে একান্ত নিরপেক্ষ ও যে কোনও শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। ঐ সকল দেশে নিযুক্ত ব্যক্তির পিতামাতা, পরিবেশ, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও খোঁজ খবর নেওয়া হয়। এ'ছাড়া নিয়োগ করার পূর্ব্বে ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক এবং মানসিক গঠন ও বুদ্ধিমত্তার উপর অধিক মনোনিবেশ করা হয়েছে।

কোনও স্থানীয় পুলিশের কর্ম্মকৃত্যের ইতিহাস সংগ্রহ করতে হলে ঐ স্থান ও নগরের গঠনের ইতিহাস পূর্ব্বাহ্নে অবগত হওয়া উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলিকাতা মহানগরীর কথা বলা যেতে পারে। অনেকের ধারণা

কলিকাতা মহানগরী গোবিন্দপুর কলিকাতা ও স্থতানটী নামক গ্রাম ত্রয়ের সমষ্টি, কিন্তু ইহাদের চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলির কথা তারা বলেন নি। অথচ বর্ত্তমান কলিকাতার মধ্যে ঐ সকল পূর্ব্বতন গ্রামগুলিও পড়ে। উহাদের নাম ছিল—শিয়ালদহ, মির্জ্জাপুর, চৌরম, চৌরঙ্গি, ইণ্টালি, চিৎপুর, সিমলা, দক্ষিণ পাইকপাড়া, দক্ষিণ বাড়ী, বেলগেছিয়া, হোগলকুড়িয়া, উল্টাডিঙ্গি, মাকোণ্ডা, কামার পাড়া, কাঁকুড়গাছি, বাগমারী, আরকুলী, কুলিয়া, ট্যাঙরা, শুঁড়া, বাহির শুঁড়া, শেখপাড়া, দালাণ্ডা, বিরজী, তিলজলা, তপসিয়া, সাপগাছি, কলিঙ্গা, গোবরা, বাহির দক্ষিণবাড়ী, শ্রীরামপুর, জয় কলিঙ্গা ও গণ্ডলপাড়া। সারকুলার রোডের পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের বিখ্যাত লাণ্ডা হাউসের নামকরণ এই দালণ্ডা গ্রামের নাম অনুসারে হয়েছে।

পূর্ব্বে এইরূপ কয়েকটী গ্রাম সমষ্টির জন্য একটি করে থানা ছিল। এইজন্য কিছুকাল পূর্ব্বেও এই সহর বহু ছোট ছোট থানায় বিভক্ত ছিল। থানাগুলির এলাকা ছোট হলে অপরাধ-নিরোধের এবং শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সুবিধা হয় বলে আমি মনে করি। এইরূপ ক্ষেত্রে অফিসারগণ স্বল্পসংখ্যক শান্ত্রী দলকে এবং নাগরিকদের আয়ত্তাধীন রাখতে সক্ষম হবে। পূর্ব্বে কলিকাতা শহরে বর্ত্তমান অপেক্ষা থানার এলাকা ছোট থাকায় থানার সংখ্যাও ছিল অধিক। পূর্ব্বেকার কয়েকটি থানা কালক্রমে উঠে গিয়েছে কিংবা ফাঁড়ীতে পরিণত হয়েছে। উহাদের কয়েকটির নাম এই সম্পর্কে দেওয়া হলো। যথা,—ফিনিক বাজার থানা, বর্ত্তমানে মাউণ্টেড্ পুলিশ গার্ড; বামুনবস্তী থানা, ইলিয়ড রোড; দৈহাট্টা থানা, হেষ্টিং ব্রিজ; হাটখোলা থানা, নিমতলা ঘাট; কলুটোলা থানা, কলুটোলা রোড; কালীঘাট থানা, ইত্যাদি।

উপরোক্ত রূপ বিশ্লেষণ ব্যতীত আদি, মধ্য ও অধুনা, এই তিনটি যুগের

অপরাধীর সংখ্যার আধিক্য বা অনধিক্যের কারণ সম্পর্কেও গবেষণা করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ এই সম্পর্কে তিনটি কারণের কথা বলা হয়ে থাকে, যথা—অর্থনৈতিক প্রাচুর্য্য, ধর্ম্মের প্রকোপ হ্রাস ও নৈতিক শিক্ষা এবং শাস্তির কঠোরতা প্রভৃতি, এবং অবিভাবকদের অক্ষমতা ও অমনযোগিতা। গবেষণার কারণে বিভিন্ন যুগে প্রদত্ত শাস্তি সম্বন্ধে প্রথম গবেষণা করা প্রয়োজন।

হিন্দুযুগের কোনও এক সময় শূলে দেওয়ার রীতি ছিল। সকাল ছটায় শূলে বসিয়ে দিলে সন্ধ্যা ছয়টায় সে শূলের মূলে নামত। হাঁটুতে কাঁটা দিয়ে মৃত্তিকার তলে পুঁতে রাখা এবং মশানে এনে শিরচ্ছেদের কথাও শুনা গিয়েছে। বিরূ অপরাধে অঙ্গচ্ছেদ করা ছিল এক সাধারণ শাস্তি। কিরূপ অমানুষিক শাস্তি অপরাধীদের দেওয়া হতো তার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

(১) মাথার খুলি ফুটো করে তার মধ্যে একটী তপ্ত লৌহ গোলক ফেলে দেওয়া হতো, এবং এর ফলে মাথার ঘিলু টগ্ বগ্ করে ফুটে উঠত। (২) সাঁড়াশী দিয়ে মানুষের মুখ হাঁ করিয়ে তার ভিতর জলন্ত প্রদীপ বা মশাল প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হতো। (৩) সমস্ত দেহ তৈলসিক্ত করে তার পর তাতে অগ্নি সংযোগ করা হতো। (৪) গলদেশ হতে হাটু পর্য্যন্ত গাত্রহতে চর্ম্ম ছাড়িয়ে নেওয়ারও রীতি ছিল। (৫) আগুনে নিক্ষেপ করে বিদগ্ধ করার কথাও শোনা গিয়েছে। (৬) হস্তে ও পদে পেরেক মেরে টাঙিয়ে দেওয়া এবং দেহ হতে মাংস তুলে নেওয়াও হয়েছে। (৭) চুরি করলে চোরকে পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

এইরূপ কঠোর শাস্তির দৃষ্টান্ত মানুষকে যে বিবিধ সাংঘাতিক ও সামান্য অপরাধ হতে বিরত রাখতো তা খুবই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে

ধর্ম্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক শাসনও ঐ যুগে অপরাধের স্বল্পতার কারণ ছিল। তবে এই সকল শাস্তি শুনতে ভীষণ হলেও ইহা সাধারণ হত্যারই সামিল, কারণ 'শকের' কারণে প্রারম্ভেই মানুষ অচৈতন্য হওয়ায় নিদারুণ যাতনা ভোগ করে নি। কিন্তু যারা এই শাস্তি কানে শুনেছে বা চক্ষে দেখেছে তাদের ইহা অতীব ভীত করে তুলেছে।

মোসলেম আমলেও শাস্তি ছিল প্রয়োজন বোধে অতীব কঠোর। জিহ্বা কর্ত্তন, হস্তীপদতলে নিক্ষেপ, গাত্র হতে চর্ম্মস্খলন প্রভৃতির কথাও শোনা গিয়েছে। প্রাচীন মোগল সম্রাট ও নবাবগণ মুসলমানদিগকে ইংরেজদিগের প্রথানুযায়ী ফাঁসীকাষ্ঠে মৃত্যু বরণ করতে দিতেন না, কারণ তাঁদের বিশ্বাস মুসলমানদের পক্ষে ঐরূপ মৃত্যু নিতান্ত অপমানজনক। এইজন্য তাঁরা প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধের স্থলে মুসলমান ও জেণ্টু (হিন্দু) অপরাধী প্রজাদের কশাঘাত দ্বারা হত্যা করতেন। এঁদের 'চাবুক সাওয়ার' নামক জহ্লাদগণ এইরূপ কর্ম্মপটু ছিল যে, চাবুকের দুই তিন আঘাতে এদের মৃত্যু ঘটাতে পারত। প্রাচীন কলিকাতার ইংরাজ জমীদার শাসক ফাঁসীর দণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারতেন, কিন্তু চাবুক দ্বারা হত্যা করতে হলে তাঁকে বণিক কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিতে হতো।

ভারতের পল্লী পঞ্চায়েতদের কিন্তু শাস্তি প্রদান ছিল অতীব দয়ার্দ্র। পারত পক্ষে তারা কেউঅনুতপ্ত বা ক্ষমা প্রার্থী হলে তাকে শাস্তি দেন নি। বিশেষ প্রয়োজনে তারা সামাজিক শাস্তি বা অর্থদণ্ড দিয়েছেন, কিংবা সাধারণের কাজ করিয়ে বা বেগার খাটিয়ে নিয়েছেন। গ্রাম্য জমীদার শাসকগণও বেত্রাঘাত ও বন্দী করা প্রভৃতি শাস্তির উপরে কম ক্ষেত্রেই নির্ভর করেছেন। এইজন্য সেই যুগে ভারতের গ্রামাঞ্চলে সুখী, নির্ভিক আর সম্মানী নিরপরাধী মনুষ্যগোষ্ঠি সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

এ'ছাড়া পঞ্চায়েত আদালতে বিচারের সহিত চলতো উপদেশ ও অনুরোধ। এবং এই উপদেশ মত সেই ব্যক্তি পরবর্ত্তীকালে চলে কিনা তাও তাঁরা লক্ষ্য করতেন।

থানাবাড়ীগুলির পুনঃ নির্ম্মানও গবেষণা মূলক হওয়া উচিত। আমার মতে অভিযোগ-গ্রহণ কক্ষের অফিসারদের এবং সমাগত জনাসাধারণের বসবার মধ্যস্থলে একটি ব্যাঙ্কের কাউণ্টারের ন্যায় একটি নীচু কাউণ্টার থাকা উচিত। এ'ছাড়া হাজত-ঘর ও জিজ্ঞাসা-ঘর প্রভৃতিরও পরিবেশ সম্ভবতঃ পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে।

ইহা ব্যতীত অপরাধীদের মনস্তত্ব জ্ঞান সম্বন্ধেও অবহিত হতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মৎস্য-চোরদের অপ-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যাক্। মৎস্য-চোরেরা পুকুরের জলের উপরিভাগ রাত্রি যোগে আলোড়ন করে, ফলে অক্সিজেনের অভাবে মৎগুলি আধমরা হয়ে জলে ভেসে উঠে। এই চোরেরা তখন ঐ সকল মৎস্য হাতে ধরে তুলে আনে। এদের কোনটী কোনটী ভয়ে পাঁকে মাথা গুঁজে ও তার ফলে পাঁকের গ্যাসে আহত হয়ে উপরে ভেসে উঠে। মৎস্যদের যে শ্বাস গ্রহণের জন্য মধ্যে মধ্যে উপরে উঠতে হয় তা অজ্ঞ চোরেরাও জ্ঞাত আছে।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট ক

নিম্নের উদ্ধৃত প্রাচীন পত্রিকার নিবন্ধ হতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার তৎকালীন সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে কিরূপ অপরাধ সঙ্ঘটিত হবার সুযোগ সুবিধা ছিল এবং তজ্জন্য কিরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া হতো তা জ্ঞাত হওয়া যায়।

Calcutta Courier, dated January 11th 1840; Edited by an European.

"The sudden and unaccountable disappearence of the Editor of Bhaskar, Srinath Roy is but too true an occurence. All the native community are lost at the bare thought of the fact that yester morn, in broad day light at 8 A. M. that, unfortunate individual, as he was getting in to a harkery near the junction of the four-cross road at Pataldanga was on a sudden seized by twenty or twenty-five armed men in gurb of Hindoostany door-keepers, most severely assaulted, stripped almost-naked, immidiately gagged and forcibly dragged in a western direction as far as puthery ghata near the river side, where he and his conductors simultaneously disappeared. The alleged extremly probable cause of this extraordinary restraint on person liberty is as follows :—"

Nearly three weeks ago, the Editor of Bhasker had inveighed with just severely against the mal practices

of a certain Zaminder Raja……residing in the vicinity of Calcutta.

Being personally acquainted with the Editor of the Bhaskar, I can vouch of the truth of the above statements."

নিম্নের উক্ত পত্রিকার আখ্যানভাগ পাঠ করে বুঝা যায় যে, তৎকালীন কলিকাতা পুলিশ তৎক্ষণাৎ তদন্তরত হয়েছিল। এ'ছাড়া আরও জানা যায় যে ঐ সময় সংবাদপত্রের সাহায্যও পুলিশি কার্য্যের জন্য গ্রহণ করার রীতি ছিল।

Calcutta Courier, January 21st 1840.

"An advartisement appeared in the Prabharkar of the 18th inst, stating, that Raja……had concealed himself. Any person able to get him apprehended will receive a reward of five hundred rupees."

এক্ষণে নিম্নের আখ্যান ভাগ হতে বুঝা যাবে যে তৎকালীন কলিকাতা শহরের শাসন ব্যবস্থায় ঘটনার কত অল্পদিনের মধ্যে মামলার বিচার কার্য্য পর্য্যন্ত সমাপ্ত হয়ে যেতো।

From History of Indian Literature ; while commenting on Editor of সংবাদ ভাস্কর।

"At first Raja was in prison for some days. By the decision of Supreme Court on 20th March 1840 he was compelled to pay fine of Rs. 1000."

সমাচার দর্পণ, 1840, 18th Januaryর সংখ্যায় নিম্নোক্ত সংবাদ উক্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা হতে বুঝা যায় যে তৎকালীন সামাজিক প্রথাও বহু অপরাধ সৃষ্টি করেছে।

"রাজা * * * *এর অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি। ভাস্কর সম্পাদকের প্রতি

রাজা * * * * বল প্রয়োগে যে আইন বিরুদ্ধ আশ্চর্য্য ব্যাপার করিয়াছেন তাহাতে জনসাধারণের দৃকপাত হইয়াছে, এবং বোধ হয় যে ঐ মকদ্দমা অতি শীঘ্র আদালতে আনীত হইবেক।"

দৃষ্ট হইতেছে যে, ভাস্কব সম্পাদকের নিকট এক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাতে এই লেখে যে উক্ত রাজা দুইজন ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। এবং আন্দুল নিবাসী একজন ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবের কন্যার সহিত বিবাহ দেওন উপলক্ষে অন্যান্য ব্রাহ্মণেব প্রতি বলপ্রকাশ কবিযাছেন। ঐ পত্রের মধ্যে আরও রাজবংশীযদের কুকর্ম্মের বিষয় উল্লিখিত ছিল। তাহা প্রায় সকল লোকেবেই সুবিদিত আছে কিন্তু ঐ সম্পাদক মশাই ঐ পত্র প্রকাশ না কবিযা কেবল এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে এতদ্রূপ করা অনুচিত। কিন্তু রাজা ইহাতেই উন্মাদ হইয়া দিবাভাগে কলিকাতা সহরের রাস্তাব মধ্যেই ঐ সম্পাদক মহাশয়কে প্রহার পূর্ব্বক ধৃত-করণার্থে কযেক জন অস্ত্রধাবী লোক পাঠাইলেন। তাহাতে ঐ সকল লোক অতি নির্দ্দয় রূপে তাকে মাবপিট করিয়া লইযা যায়। কথিত আছে যে, আন্দুল পর্য্যন্ত লইযা গিয়াছে। এবং তৎপরে শুনা গেল যে তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে দুইক্রোশ অন্তরে এক গ্রামের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছে।

কলিকাতা পুলিশ তদন্তে তৎপর হইয়াছে।

সংবাদ সাগর 1852, 12th July, সংখ্যা ৪০।

"আমরা সিটিজন পত্র পাঠ করিযা এক ভয়ানক হত্যার ব্যাপার অবগত হইলাম। তাহার স্থুল মর্ম্ম এই যে শুকচার গ্রামের এক সামান্য জাতির স্ত্রী মদন্মোত্ত হইয়া স্বীয় উপপতি সম্ভোগে নিযুক্ত থাকাকালীন ঐ দুশ্চরিত্রের এক ৮।১০ বৎসর বয়স্ক সন্তান তাহা দেখিয়াছিল। ব্যভিচারিণী আপন দুষ্কর্ম্ম সংগোপন করিবার অন্য কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সহস্তে

আপন পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে ; হায় কি পরিতাপ ! মদনরাজ কি না করিতে পারেন ?'

পুরাতন সংবাদ পত্রাদির মধ্যে J. C. Marchman সম্পাদিত, (1818-1845) সমাচার দর্পণ, Hicky সম্পাদিত (1817) দিক দর্শন, শ্রীনাথ রায় সম্পাদিত (1838) সংবাদ ভাস্কর, অপরাধ সম্পর্কীয় পত্র, অনুসন্ধান (1892) 1808 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত Calcutta Courier এবং Calcutta Gazatte, 1813 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত Bengal Gazatte পত্রিকাতেও পুরাণো দিনের বহু অপরাধ ও তদন্ত সম্পর্কে সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে।

পরিশিষ্ট খ

(১) তাং ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯-৪৭ সন, শ্যামপুর থানার ২নং মামলা

শ্রীমথুরাপ্রসাদ রায়, সাং ৫নং শ্রীহরি রোড, কলিকাতা। গ্রাম ও পোঃ মাগনা, জিলা যশোর

বনাম

শ্রীরাধানাথ দাসরায়, সাং ২৭নং মাধব লেন, কলিকাতা। গ্রাম দাসপুরা, পোঃ সাপুর ; জিলা ২৪ পরগণা।

অভিযোগ :—অদ্য দিবা বেলা দুই ঘটিকায় আসামী ফরিয়াদীর ৫নং শ্রীহরি রোডের বাড়ী ঢুকিয়া তাহার দখলীভুক্ত ৩০্ টাকার মূল্যের একটি কাঠের চেয়ার উহার মালিকের অজ্ঞাতে তাহার ঐ বাড়ী হইতে চুরি করার অপরাধে ভারতীয় দঃ বিঃ-র ৩০৮ ধারা মতে অভিযুক্ত হইল।

(২) তাং ৭ই পৌষ, ৪৭ সন, শ্যামপুর থানার ৫০ নং মামলা।

শ্রীহরিচরণ ঘোষরায়, সাং ২৭নং ঠনঠনিয়া রোড, কলিকাতা। গ্রাম ও পোঃ সাপুর, জিলা ২৪ পরগণা।

বনাম

শ্রীহরিচরণ বাগ, পিতার নাম শ্রীরামহরি বাগ, সাং ঠাকুরবাড়ী লেন, কলিকাতা। গ্রাম মতিহারী, পোঃ সান্দার, জেলা মানভূম।

অভিযোগ :—অদ্য সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় হ্যারিসন রোডে আসামী একটি পিত্তল নির্ম্মিত পিণ্ডকে মিথ্যা বলিয়া সোনা বুঝাইয়া গছাইয়া উহাকে

বদলে ফরিয়াদীকে তাহা ক্রয় করিবার জন্য ৭০৲ টাকা প্রদান করিতে প্ররোচিত করে, যাহা ফরিয়াদী ঐরূপে প্রবঞ্চিত হওয়ার কারণে আসামীকে সরল বিশ্বাসে নিশ্চয় প্রদান করিত, যদি না ইতিমধ্যে প্রকৃত বিষয় ভিন্নরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িত ; এই কারণে আসামীকে প্রতারণার প্রচেষ্টার অপরাধে ভাঃ দঃ বিঃ-র ৫১১।৪২০ ধারা মতে অভিযুক্ত করা হইল।

(৩) তাং ১লা চৈত্র, ৪৭ সন, শ্যামপুর থানার ১০২নং মামলা।

শ্রীহরিপদ বন্দোপাধ্যায়, ১৫নং হালসীবাগান রোড, কলিকাতা। গ্রাম ও পোঃ তালুকরামপুর, জিলা খুলনা।

বনাম

শ্রীহরি মাধবচন্দ্র সাহা, ২নং বৈঠকখানা রোড, গ্রাম শাস্তান, পোঃ হাসপাণি, থানা হাসপাণি, জিলা ২৪ পরগণা।

অভিযোগ :—ফরিয়াদীর ২০০০৲ টাকা মূল্যের একটি হীরক খচিত স্বর্ণহার যাহা ফরিয়াদী আসামীর নিকট ২রা মাঘ তারিখে বিদেশ যাত্রাকালে সাময়িক ভাবে বিশ্বাস করিয়া গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহা আসামী আপন প্রয়োজনে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ ১০০৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে ; এইজন্য বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাহাকে ভাঃ দঃ বিঃ-র ৪০৩ ধারা মতে অভিযুক্ত করা হইল।

[উপরোক্ত অভিযোগ সম্বলিত কেতাবের পাতায় সহ ও উপনগরপালগণ আদেশ বা নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করেন, যথা—জেল হাজত ৬ তাং পর্য্যন্ত কিংবা পুলিশ হেপজতি ৭ তারিখ পর্য্যন্ত, এই সকল আদেশনামা সংক্ষেপে এইরূপ লিখা যেতে পারে, যথা—পুঃ হেঃ ৭ তাং পর্য্যন্ত বা জেঃ

হাঃ ৯ তাং পর্য্যন্ত, কিংবা খালাস, চালান এতো ধারা মতে, ইত্যাদি। এ ছাড়া এতো ধারা মতে মামলা সত্য বা মিথ্যা কিংবা ভুল—আইনগত বা বিষয়সম্পর্কীয়; বা মামলা অমীমাংসীত ইত্যাদিও সংক্ষেপে লেখা হয়ে থাকে।]

নিম্নে আরও দুইটি অভিযোগ লিখন প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হলো।

(৪) গত ১০ই পৌষ, ৩২ সনে, আসামী ফরিয়াদীর ১৪ বৎসর ন্যূন বয়স্কা নাবালিকা কন্যা মালতী যে তখনও তাহার পিতার অবিভাবকত্বাধীন তাহা সম্যকরূপে জ্ঞাত থাকা সত্বেও তাহাকে তাহার পিতার গৃহে আসিয়া তাঁহার অবিভাবকত্ব হইতে হরণ করার উদ্দেশ্যে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া স্বগৃহে লইয়া যাওয়ায় তাহাকে এই অপরাধে ভাঃ দঃ বিঃ-র * * * ধারা মতে অভিযুক্ত করা হইল।

ভারত রাষ্ট্র

বনাম

সুরেশচন্দ্র ঝা

(৫) অদ্য বেলা (দিন) দশ ঘটিকায় আসামী ইচ্ছাকৃতভাবে খুনের উদ্দেশ্যে শ্রীবলাই সেন নামক ব্যক্তিকে চিৎপুর রোডে ছুরীকাহত করায়, ক্ষতের আশু চিকিৎসার কারণে সে 'মেয়ো হাসপাতালে' নীত হইলে, সেখানে তার ঐ ক্ষতজনিত মৃত্যু ঘটে; এইজন্য ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে অভিযুক্ত করা হইল।

পরিশিষ্ট—আমার কথা

অপরাধ ও অপরাধীদের সমস্যা পৃথিবীর সকল দেশেই আছে। এই সমস্যা সমাধান করবার জন্যেই মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং আইন প্রণয়ন করে থাকে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান সভ্যতার যা কিছু উৎকর্ষ তা অপরাধ নিরোধ দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। আজ যদি মানুষ অপরাধ নিরোধে অসমর্থ হয় তা'হলে তাদের পুনরায় বর্ব্বরতার যুগে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অপরাধ-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথিবীতে আজও পর্য্যন্ত আশানুরূপ হয়নি। য়ুরোপে কোনও কোনও দেশে এই বিদ্যার চর্চ্চা হয়েছে, এ কথা সত্য। কিন্তু ভারতবর্ষে এই বিদ্যার চর্চ্চা হয়নি বললেও চলে। প্রতিটি দেশের ধর্ম্ম বিশ্বাস, সামাজিক গঠন, আচার ব্যবহার, অর্থ নৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, স্থানীয় জল বায়ু ও ভূমির গঠন এবং সভ্যতাব মিশ্ররূপ ও প্রাচীনত্ব সেই সেই দেশীয় অপরাধ ও অপরাধীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এইজন্য অপরাধ-শাস্ত্র কয়েকটী মূল বিষয়ে এক প্রকাব হলেও দেশভেদে অপরাধিগণ বিভিন্ন চরিত্রের হতে বাধ্য। এইজন্য কোনও বিদেশীয়—বিশেষ কবে পাশ্চাত্য অপরাধ-বিজ্ঞান কখন ভারতবর্ষে প্রযোজ্য হতে পারে না। ভারতবর্ষে প্রয়োগ করতে হলে পৃথক ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য। একমাত্র ইহার দ্বারাই এই দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সম্ভব। কারণ অধিকাংশ অপরাধী তাদের স্বদেশীয় নিরপরাধী মানুষের বিচ্ছিন্ন অংশ; বহু ক্ষেত্রে তাদের দ্বারাই তারা সৃষ্ট হয়েছে।

এইবার ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান কারা সৃষ্টি করতে পারে সেই সম্বন্ধে

আলোচনা করবো। বলা বাহুল্য, সাধারণ পণ্ডিত বা উচ্চপদস্থ কর্ম্ম-চারীদের দ্বারা ইহা সৃষ্ট হতে পারে না। টু ষ্টাডি বার্ডস ইন্ কেজ এণ্ড টু ষ্টাডি বার্ডস্ ইন্ ওয়াইল্ড ষ্টেট্—অর্থাৎ খাঁচায় আবদ্ধ রাখা পাখী এবং মুক্ত অবস্থায় পাখীর পর্য্যালোচনা এক বস্তু নয়। কি য়ুরোপে বা কি অন্য দেশে দেখা গিয়েছে যে কেবল মাত্র জেলে আবদ্ধ কয়েদীদের পরিদর্শন দ্বারা অপরাধ-বিজ্ঞান গড়ে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এইরূপ প্রচেষ্টায় বহু ভুল ত্রুটি হওয়া অনিবার্য্য। আমার মতে যে সকল সাবর্ডিনেট সার্ভিসের পুলিশ অফিসার হাতে কলমে কাজ করে এবং দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন অপরাধীদের নিয়ে নাড়া-চাড়া করে বা নানা কার্য্যব্যপদেশে সদা সর্ব্বদা তাদের সংস্পর্শে আসে, একমাত্র তাদের দ্বারাই কোনও এক দেশের অপরাধ-বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে। এমন কি উচ্চপদস্থ পুলিশ বা জেল কর্ম্মচারিগণ যারা দূর হতে মরা নথিপত্র পড়ে বা তা সই করে তাদের পক্ষেও এই বিদ্যা চর্চ্চা করা সম্ভব হবে না। যে সকল কর্ম্মচারী দীর্ঘকাল যাবৎ তদন্ত ব্যপদেশে শত শত অপরাধীদের সংস্পর্শে এসেছে ; এবং তাদের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি যারা সাক্ষাৎ ভাবে অপরাধীদের ডেরায় নিজেরা গিয়ে পর্য্যালোচনা করেছে, একমাত্র তারাই এই দুরূহ কার্য্য সমাধা করতে সক্ষম। এইজন্য ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান কেবল মাত্র ভারতবর্ষে ভারতীয় তদন্তকারী অফিসারগণই গড়ে তুলতে পারেন। কিন্তু এর মধ্যেও অপর আর একটি কথা আছে। উপরোক্ত রূপ গুণের অধিকারী সকল ভারতীয় অফিসারগণই এই বিষয়ে সফলতা লাভ করতে কথনই পারবেন না। ঐ সকল গুণের সঙ্গে তাদের জীব-বিজ্ঞান বা বায়লজি, মন-বিজ্ঞান বা সাইকোলজি এবং দেহ-বিজ্ঞান বা ফিসিওলজি সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। তা না হলে বিবিধ শ্রেণীর অপরাধীদের চরিত্র অনুধাবন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।

উপরোক্ত ত্রিবিধ বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধীদের ব্যবহার বিবেচিত না হলে অপরাধ-বিজ্ঞান বা সমাজ-বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না।

এইরূপ এক ধারণা নিয়ে আমি ১৯৩১ সালে জানুয়ারী মাসে কলিকাতা আরক্ষ বাহিনীতে প্রবেশ করি। এবং আমার কর্ম্মজীবনের প্রথম দিন হতেই গবেষণার মনোবৃত্তি নিয়ে অপরাধীদের পর্য্যালোচনা সুরু করে দিই। এই কার্য্যে আমার একটি বিশেষ সুবিধা ছিল। তার কারণ B. Sc. পরীক্ষায় মন-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান এবং দেহ-বিজ্ঞান —এই তিনটী বিদ্যা আমার পাঠ্য বিষয় ছিল এবং এ ছাড়া আমি প্রাণী-বিদ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন M. Sc. এইজন্য জৈব-বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় অপরাধীদের বিচার করার আমার সুযোগ হয়েছিল।* অধিকন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের রীতিনীতি সম্বন্ধেও আমার বিশেষ স্পৃহা ও ধারণা ছিল। ১৯৩৩ সাল হতে আমি যখনই সময় পেয়েছি তখনই ডাঃ এস, সি, মিত্র এম-এ, ডি-ফিল (লেপজিগ),—পরলোকগত ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ও অন্যান্য অধ্যাপকদের সহিত দেখা করে বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করে উপদেশ গ্রহণ করেছি।

ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান গঠনের উদ্দেশ্যে আমি প্রথমে কয়েকখানি ইংরাজী অপরাধ সম্পর্কীয় পুস্তক পাঠ করি এবং দেখতে পাই যে ভারতীয় অপরাধীদের সহিত অন্যান্য দেশের অপরাধীদের বহু মূল বিষয়ে মিল নেই। এই সম্পর্কে কলিকাতায় য়ুরোপীয় এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অপরাধীদের সহিত ভারতীয় অপরাধীদের তুলনা করে আমার এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। যুদ্ধের সময় আমি কিছুকাল ব্রিটিশ ও আমেরিকান

* I. Sc. পরীক্ষায় আমার উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা পাঠ্য বিষয় থাকায় এই সম্বন্ধে আমার আরও সুবিধা হয়।

মিলিটারী পুলিশকে বিভিন্ন তদন্তে সাহায্য করেছিলাম। এই সময় বহু য়ুরোপীয় অপরাধীও জরুরী তাগিদের কারণে ব্রিটিশ ও আমেরিকান বাহিনীতে প্রবেশ করে। এই কারণে মিলিটারী পুলিশের সহিত সহযোগিতা করার সময় এই সকল বিদেশী অপরাধীদের চরিত্র অনুধাবন করতেও আমি সক্ষম হই। এইরূপে আমি বুঝতে পারি যে য়ুরোপীয় বা আমেরিকান অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পুস্তক পড়ে ভারতীয় অপরাধীদের বিচার করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

[যুদ্ধের শেষদিকে গোয়েন্দা বিভাগে বাহাল থাকাকালীন কয়বছর মিলিটারী পুলিশের সহিত কার্য্যরত থাকায় আমি যুদ্ধকালীন মনোবৃত্তি ও সুযোগ সুবিধার কারণে কিরূপে আবাল্য সাধু চরিত্রের মানুষেরও অন্তর্নিহিত অপস্পৃহা বহির্গত হতে পারে তা অনুধাবন করি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমাদের কলিকাতা নিধন যজ্ঞ তথা বিরাট সভ্যতা বিধ্বংসী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্মুখীন হতে হয়। এই সময় সৎ বংশে জন্মে সৎ পরিবেশে মানুষ হয়েও আমি বহু লোককে সহসা অপরাধী হতে দেখেছি। এই ভাবে অপরাধ স্পৃহার অবস্থিতি ও কিরূপে উহা জাত ও নির্গত হয় সেই সম্বন্ধে আমি বহু বিষয় অবগত হই।]

এতদ্ব্যতীত আমি দেখতে পাই ইংরাজী পুস্তকের কোনটীতেই সুসংবদ্ধ ভাবে সাধারণের বোধগম্য রূপে অপরাধী, অপরাধ এবং অপরাধ নিরোধ ও নির্ণয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি। এমন কি অপরাধ-বিজ্ঞানের মনস্তাত্বিক দিক সহ বহু মূল বিষয় ও বিভাগ সম্বন্ধে উহাতে আদপেই আলোচিত হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগামী য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণার কয়েকটি ক্রটী বিশেষ করে আমার চক্ষে পড়ে। প্রথম ক্রটীর কথা আমি ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় ক্রটী হচ্ছে এই যে তাঁরা একটি অপরাধীর মাত্র একবার বিবৃতি গ্রহণ করেছেন। আমার বিশ্বাস,

একজন অপরাধীর ১৪ বৎসর বয়স হতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তার জীবন-ইতিহাস তাঁরা কম ক্ষেত্রেই পর্য্যালোচনা করেছেন বা তা তাঁরা আদপেই করেন নি। একজন অপরাধীকে যথাক্রমে তার ১৪, ২০, ৩০, ৩৫, ৪৩, ৪৬ ও ৫০ বৎসর বয়সে পর্য্যালোচনা না করলে তার চরিত্রের ক্রমিক পরিবর্ত্তন অনুধাবন করা অসম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে বহু অপরাধীকে তার প্রথম অপরাধের দিন হতে তার বিভিন্ন বয়স কালে তাকে পরিদর্শন করার সুযোগ ও সুবিধে আমার হয়েছে, কেবলমাত্র এই জন্যই আমি এক নূতন ধরণের অপরাধ-বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। তিন বা চারি বৎসরের গবেষণায় অপরাধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন কোনও মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। এই বিষযে অন্ততঃ ২০ বৎসর যাবৎ ধারাবাহিক পর্য্যালোচনার প্রয়োজন হয়।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে আমি আমার পুস্তক কয়খানি ইংরাজীতেই লিখব। কিন্তু পরে আমি এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। কারণ ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান রচনা করবার সময় আমাকে এমনিই বহু ভারতীয় পরিভাষা ব্যবহার করতে হযেছে। এ'ছাড়া আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি যে কোনও ভারতীয় ভাষায় আজও পর্য্যন্ত একখানি অপরাধ-বিজ্ঞান বা তৎসম্পর্কীয় পুস্তক রচনা করা হয়নি। এমন কি এই সম্পর্কে 'অপরাধ-বিজ্ঞান' এই শব্দটীও আমাকে তৈরী করে নিতে হয়েছিল। কারণ ক্রিমিনোলজির বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে সেই সম্বন্ধে তখনও পর্য্যন্ত এই দেশে কেহ মাথা ঘামায়নি। আজ হতে পঞ্চাশ বৎসর পরে ইংরাজীকে পরিহার করার কথা অনেকে বলেন। কিন্তু আজই থেকে যদি আমরা মৌলিক পুস্তক বাংলা ভাষায় রচনা করতে সুরু না করি তা'হলে আজ হতে একশত বৎসর পরেও হিন্দি বা বাংলা ইংরাজীর স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। বরং আমি এইরূপ মনে করি

যে পরে পুস্তক কয়টীর ইংরাজীতে অনুবাদ করে নেওয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যে পুস্তকের চারিটি খণ্ডের ইংরাজী অনুবাদ সমাপ্তও করা হয়েছে। মৌলিক রচনার সম্মান বাংলা ভাষাই পাক এইটেই হচ্ছে আমার কাম্য।

একথা সত্য যে আমি পুস্তক কয়টিতে দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহ সাধারণের সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য রূপে পরিবেশন করেছি। কারণ আমি চাইনি যে এই পুস্তক কেবলমাত্র পণ্ডিতের ঝুলির মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ থেকে যায়, বরং আমি অন্তরের সহিত চেয়েছি যে আমার অর্জ্জিত জ্ঞান যেন জনসাধারণের সুখপাঠ্য হয়ে থাকে। এই পুস্তক কয়খানি জনসাধারণের সহজবোধ্য করে তৈরী করতে বরং আমাকে অধিক বা বাড়তি পরিশ্রম করে বিশেষ রচনা কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছে। আমার এই আন্তরিক প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছে তা আমার এই পুস্তক কয়খানির একাধিক সংস্করণ প্রমাণিত করে। এই পুস্তক কয়খানির জনপ্রিয়তা আজ সর্ব্বজনবিদিত। এক্ষণে পণ্ডিতদের আমি অনুরোধ করব যে তাঁরা যেন হংসের ন্যায় উহার অন্তর্নিহিত ক্ষীরটুকু মাত্র আহরণ করে নেন, কারণ জনস্বার্থের কারণে আখ্যানভাগ কথঞ্চিৎ তরলাকৃত বা Diluted করতে আমি বাধ্য হয়েছি। পুস্তক কয়খানি পড়তে কারো যাতে অযথা কষ্ট না হয় তার জন্যে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট সত্য কাহিনীর অবতারণা করে তাদের জন্যে সুখপাঠ্য করবারও ব্যবস্থা করেছি। এই জন্য পাঠকগণ এককালীন সমস্ত পুস্তকখানি পড়ে ফেলতে পারে। জনতার উপকারের জন্যে জ্ঞান অর্জ্জন করা যদি কাম্য হয় তা'হলে এতে আমি কোনও অন্যায় করিনি।

পুস্তক কয়খানিতে যে সকল অপরাধীর বিবৃতি উদ্ধৃত করা হয়েছে তা আমি ভাষার উৎকর্ষতার জন্য নিজের ভাষাতেই লিখে নিয়েছি। এ ছাড়া পুস্তকে ঐ সকল অপরাধীদের নাম ধামও প্রকাশ করা হয়নি। এর কারণ

প্রকৃত অপরাধীরা কম ক্ষেত্রেই এক নামে পরিচিত। তারা প্রতিবারে তাদের নাম ধাম ও পিতার নাম এবং জাতি ও বর্ণ পাল্টিয়ে দিয়ে থাকে। এদের মধ্যে যারা প্রাথমিক অপরাধী তাদের বংশের সুনাম রক্ষার জন্য তাদের নাম ধাম প্রকাশও বিধেয় নয়।

এইরূপ অনুসন্ধানের কারণে আমার অপর একটি সুবিধা ছিল। রক্ষী বিভাগে নিজে বাহাল হবার পূর্ব্ব হতেই আমার এই সম্পর্কে চিত্ত-প্রস্তুতি বা Predisposition ছিল। ইহা বংশগত ও পরিবৈশিক, এই উভয়বিধ কারণে আমি অর্জ্জন করতে পেরেছিলাম। আমি এমন এক জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করি যাদের হাতে ব্রিটিশ অধিকারের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত শান্তিরক্ষার ভার ছিল। জমীদারদের নিকট হতে পুলিশের ভার ব্রিটিশ সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করার সময় আমার প্রপিতামহ দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল জিলা-সরকারকে এই বিষয়ে বিশেষরূপে সাহায্য করেছিলেন। আমার পিতামহ রায়বাহাদুর কমলাপতি ঘোষাল পুলিশের একজন এসিসটেণ্ট সুপার-ইন-টেনডেণ্ট ছিলেন। ইনি সাহিত্যসম্রাট রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক ও তাঁহার আপন মাসতুতো ভাই। শৈশবে পিতামহীর নিকট হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর চোর ডাকাত প্রভৃতির সত্য ঘটনা সম্ভূত কাহিনীও আমার অবগত হওয়ার সুবিধে হয়েছে। আমার জ্যেষ্ঠতাত রায়সাহেব কালিসদয় ঘোষাল কলিকাতা পুলিশের একজন এসিসটেণ্ট কমিশনার ছিলেন। আমি আশৈশব তাঁর কাছে থেকে পুলিশে ঢোকার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত পুলিশ কোয়াটারেই বসবাস করেছি। এ'ছাড়া আমার বহু আত্মীয় স্বজন এই সময় বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। বাল্যকাল হতেই বিভিন্ন থানায় ঘোরাঘুরি করে চোর ডাকাত পরিদর্শন এবং তাদের কাহিনী শ্রবণ করা ছিল আমার নেশা। এই সকল কারণে অপরাধ সম্পর্কীয়

অনুসন্ধানে সহজাত ভাবে আমি অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠি। এইরূপ চিত্তপ্রস্তুতি সহ রক্ষী বিভাগে স্বয়ংপ্রবেশ আমার গবেষণার বিশেষ সুবিধে হয়। আমি সাবর্ডিনেট সার্ভিসে প্রবেশ করে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে উন্নীত হওয়ায় সৌভাগ্যান্বিত মনে করি, তা না হলে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিজ্ঞানের সেবা করার এতো সুযোগ আমি কখনও পেতাম না।

আমার যা কিছু অভিজ্ঞতা তা মূলতঃ বাংলা ও কলিকাতার অপরাধীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কলিকাতা ভারতবর্ষের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। এইখানে যেমন বিভিন্ন প্রদেশীয় ও জাতীয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে, তেমনি এইখানে বিভিন্ন প্রদেশীয় ও জাতীয় অপরাধীদেরও বাহুল্য দেখা যায়। এইজন্য এই একটীমাত্র শহরে বসে সমগ্র ভারতের অপরাধীদের সম্পর্কে গবেষণা করা সম্ভব। বিভিন্ন প্রদেশীয় মানুষ তাদের স্ব স্ব দৈহিক ও মানসিক গঠন (সবল বা দুর্ব্বল), স্বভাব চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধের অধিকারী রূপে নিজেদের কিয়ৎ পরিমাণে বিভক্ত করে নিয়েছে। বাঙ্গালী ও উড়িয়ারা সাধারণতঃ অধিক সংখ্যায় প্রবঞ্চক হয়। বেহারী এবং নেপালী হিন্দুরা সাধারণতঃ দক্ষ তালাতোড় হয়ে থাকে। হিন্দিভাষী মুসলমানরা আজও পর্য্যন্ত অধিক সংখ্যায় পকেটমার বিদ্যায় পারদর্শী। সাধারণ ভাবে মুসলমান এবং বাঙ্গালীদের একাংশ ছুরী মারায় অভ্যস্ত। দেশবালীরা সাধারণতঃ লাঠি ব্যবহার এবং চড় চাপড়ে পারদর্শী। পটকা প্রভৃতি ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার বাঙ্গালীরা পছন্দ করে; অবশ্য ইহার পিছনে ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি আছে। স্বদেশীযুগে সম্ভবতঃ ইহা তাদের প্রথম আয়ত্তাধীন হয়। অনুরূপ ভাবে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী ছুরী মারা আয়ত্ত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রতিরোধার্থে বা প্রতিশোধার্থে। এইরূপ অস্ত্র ব্যবহারের পিছনেও ঐতিহাসিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া

যায়। ডাকাতি কার্য্য সাধারণতঃ একশ্রেণীর বাঙ্গালী ও দেশবালী এবং পাঞ্জাবী দ্বারা সমাধা হয়ে থাকে। মাদ্রাজী অপরাধীদের মধ্যে সাধারণতঃ প্রবঞ্চকদেরই আধিক্য দেখা গিয়েছে। এইরূপ জাতিগত এবং চরিত্রগত ভাবে এবং ঐতিহাসিক সূত্রে অপরাধী সম্পর্কীয় গবেষণা করতে হলে পাঁচ-মেশালী কলিকাতা মহানগরীই উপযুক্ত স্থান। এই মহানগরীর রক্ষীকুলে দীর্ঘদিন বাহাল থাকায় এই সুযোগ ও সুবিধাও আমি পেয়েছি।

আমি এইরূপ কোনও দাবী করি না যে আমার গবেষণায় কোনও 'কনট্রোভারসিয়াল' বিষয় বস্তু নেই। অপরাধ-বিজ্ঞান কোনও দেশেই এখনও সুগঠিত হয়নি, সামান্য সামান্য ভুল বা ক্রটী দুই একটি বিষয়ে থাকাও অসম্ভব নয়। তবে এ কথা সত্য যে অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় গবেষণার বা অনুসন্ধানের জন্য বহু সম্পূর্ণ নূতন ক্ষেত্রের সন্ধান আমি বলে দিতে পেরেছি। এই অনুসন্ধান আমার একার পক্ষে শেষ করা সম্ভবও নয়। অনাগতকালে গবেষক ছাত্রগণ আমার যা কিছু ভুল ক্রটী তা শুধরে এই সকল নূতন ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে সমাজের বহুবিধ উপকার করতে সক্ষম হবে। এইরূপ এক স্থির বিশ্বাস নিয়েই আমি এই পুস্তক কয়খানিতে আমার যা কিছু অভিজ্ঞতা তা সংযুক্ত করেছি। এই সকল তথ্যের অধিকাংশই আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতা প্রসূত। এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে বিবিধ নিকৃষ্ট শ্রেণী অপরাধীদের খাদ্য অর্থ ও বিবিধ সুযোগ সুবিধা দিতেও আমি কার্পণ্য করিনি। নিজের আভিজাত্যের অভিমান পরিপূর্ণ রূপে বিসর্জ্জন দিয়ে পঙ্কিল বস্তিতে অবস্থিত তাদের বিভিন্ন ডেরায় এসে বহুক্ষণ তাদের সহিত কথোপকথন করেছি নানা অছিলায় ও কৌশলে। কাউকে কাউকে গোয়েন্দার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে থানায় ডেকে আপ্যায়িত করেছি। তাদের প্রতিটী ব্যবহার স্বাকামী বা বজ্জাতি মনে

না করে উহার অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছি। আমি এমন বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছি যার সন্ধান কোনও ইংরাজী বইয়ে আমি পাইনি। তাই এই সম্পর্কে কোনও বিদেশী পণ্ডিতদের উদ্ধৃতি আমি দিতে পারিনি। আমি যা নিজের চোখে দেখেছি, বা যা আমি নিজে জেনেছি, বিশ্বস্তসূত্রে যা আমি পুরানো রক্ষীদের নিকট শুনেছি, বা যা আমি নিজে উপলব্ধি করে বিশ্বাস করেছি তাই আমি আমার পুস্তক কয়খানিতে বিবৃত করেছি।

আমার সংগৃহীত তথ্য সমূহ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ইহাদের কতকগুলি একান্ত রূপে আমার নিজস্ব আবিষ্কার ও নূতন, কতকগুলি পুরাতন তথ্য কিন্তু উহাতে নূতন তথ্য সংযুক্ত হয়েছে। আবার এমন কতকগুলি পুরাতন তথ্যও আছে যাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ কৌশল সম্পূর্ণ নূতনরূপে আবিষ্কৃত ও বিবৃত করা হয়েছে। সর্ব্বোপরি প্রতিটী বিভাগীয় প্রতিটী তথ্য ধারাবাহিকরূপে পর পর সুসংবদ্ধরূপে সংগৃহীত ও পরিবেশিত হয়েছে এমন ভাবে যাতে একজন সাধারণ মানুষও তা উপলব্ধি করে উপকৃত হতে পারে। এইরূপ সকল বিভাগীয় ভারতীয় তথ্যসহ সহজ বোধ্যরূপে পৃথিবীতে আজও পর্য্যন্ত সুসংবদ্ধ এই সম্পর্কীয় পুস্তক রচনা করা হয়নি।

এক্ষণে পুস্তকের আখ্যানভাগ ও উহার মৌলিকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। মূল পুস্তকটীকে আট খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। এক্ষণে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটী খণ্ডের বিষয় বস্তু সম্বন্ধে বলা যাক।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে অপরাধ এবং অপরাধীদের মনস্তাত্বিক দিকটী আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আলোচনা করেছি। সাধারণতঃ পৃথিবীর মানুষের বিশ্বাস যে একমাত্র কঠোর রাষ্ট্রীয়

শাসন এবং ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা অপরাধীকে নিরপরাধী করা সম্ভব, কিন্তু বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়েছে যে এইরূপ ব্যবস্থা পৃথিবী হতে অপরাধীদের কোনও দিনই বিলীন করতে পারেনি। তাই এই উভয়বিধ উপায় ব্যতিরেকে মনস্তাত্বিক ও অন্যান্য উপায়ে তাদের নিরাময় করা যায় কি না, সেই সম্পর্কে এই পুস্তকে আমি আলোচনা করেছি, আমার এই নিজস্ব মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ভারতীয় অপরাধীদের জন্ম-কর্ম্ম ও রীতিনীতিও আমাকে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করতে হয়েছে।

পুস্তকের এই খণ্ডে আমিই সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক অপরাধের প্রকৃত সংজ্ঞা প্রদান করেছি। আমার মতে বৈজ্ঞানিক অপরাধ মাত্রের সহিত নিম্নোক্ত কয়টী বৈশিষ্ট্য যুক্ত থাকা চাই।

(১) ইহা গুরুতর হওয়া চাই। গুরুতর অন্যায়কে পাপ বলা হয়। এবং গুরুতর পাপকে অপরাধ বলা হয়। ইহাদের মধ্যে যা কিছু প্রভেদ হয় তা গুরুত্বের এবং বিষয়বস্তুর। অর্থাৎ বিষয়বস্তু বা kind থাকে একই, তফাৎ যা কিছু হয় তা degree বা গুরুত্বের।

(২) ইহা সর্ব্বযুগে, সর্ব্বদেশে সকল সভ্য মানুষ কর্ত্তৃক অপরাধ বলে স্বীকৃত হওয়া চাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আত্মহত্যার কথা বলা যেতে পারে। আত্মহত্যার প্রচেষ্টা এদেশে অপরাধ, কিন্তু জাপানে তা নয়, বিলাতে আত্মহন্তারকের সম্পত্তি পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়।

(৩) ইহা সকল ক্ষেত্রেই পূর্ব্ব কল্পিত হওয়া চাই। এমন বহু বিশ্বাস-ঘাতকতা ও ব্যভিচার অপরাধ আছে, যা পূর্ব্বকল্পিতভাবে মানুষ করেনি। প্রথমে সে পরস্ত্রীর সহিত সংলাপ করেছে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু পরবর্ত্তীকালে কোনও এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। কিংবা সে গচ্ছিত-দ্রব্য গ্রহণ করার সময় আত্মসাতের ইচ্ছা মনে কখনও পোষণ করেনি, পরবর্ত্তীকালে লোভে পড়ে সে উহা আত্মসাৎ করেছে।

কিন্তু কেহ যদি প্রারম্ভ হতে ব্যভিচারের ইচ্ছায় বাক্‌চাতুর্য্যতার সহিত পরনারীর সহিত আলাপ করে কিংবা আত্মসাতের ইচ্ছায় পরের গচ্ছিত-দ্রব্য কাউকে বিশ্বাস উৎপাদন করে গ্রহণ করে তা'হলে উহা নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক অপরাধ।

(৪) ইহা সর্ব্বদাই আদর্শবিহীন হতে হবে। এই কারণে রাজনৈতিক অপরাধকে বৈজ্ঞানিক অপরাধ বলা হয় না। তাই আজ যে দস্যু-পদবাচ্য কাল সে স্বদেশ-প্রেমিক বলে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্র বিপথগামী মনে করে এদের শাস্তি দেয় কিন্তু তা তারা দেয় সহানুভূতির সহিত।

(৫) ইহা সর্ব্বদাই অসামাজিক হওয়া চাই। অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমগ্র সমাজের ক্ষতি করে তাহা অপরাধ। স্ত্রী, ভগ্নী বা মাতার প্রতি যৌন অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে যদি কেহ কাকেও হত্যা করে তাহলে ইহা বৈজ্ঞানিক অপরাধ নয়। এই ব্যক্তি রাষ্ট্র-বিধির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে নয়। বরং ঐরূপ অসৎ ব্যক্তিকে হত্যা করে সে সমাজকে রক্ষা করেছে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের করণীয় কার্য্য নিজে গ্রহণ করায় সে অপরাধী। কারণ ফরিয়াদীর হাতে বিচার বা দণ্ডের ভার দেওয়া নিরাপদ নয়।

যে কারণে পাপ বা অন্যায়কে আমি অপরাধ মনে করিনি, সেই কারণে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যমুক্ত অপরাধকেও আমি অপরাধ মনে করিনি। এই সকল বিষয়ের উদাহরণসহ বিশদ ব্যাখ্যা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এর পর আমি বলেছি যে অপস্পৃহার কারণেই মানুষ অপরাধ করে এবং ইহা আমরা জৈব কারণে (Biology) প্রাপ্ত হয়েছি। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কয়েকজন আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের আপত্তির কারণ হিসাবে তাঁরা নিম্নোক্তরূপ কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন।

(১) পৃথিবীর সকল প্রাণীই হিংসাত্মক নয়, বরং এদের অনেকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন।

(২) আধুনিক আদিম মানুষদের মধ্যে বহু সৎগুণেরও পরিচয় পাওয়া যায়, এদের কেহ কেহ পরগোষ্ঠির মানুষদের প্রতি অপরাধমূলক কার্য্য করলেও স্বগোষ্ঠিদের বেলায় কম ক্ষেত্রেই অপরাধ করেছে।

এই সকল য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতামত যে আমি ভেবে দেখিনি তা নয়। তাঁদের এই উভয় প্রশ্নের উত্তরই আমি নিম্নে প্রদান করলাম।

(১) এঁরা ভুলে যান যে, মানুষ বিশেষ একটী ক্রমলুপ্ত গরিলা সদৃশ জীব হতে উৎপন্ন হয়েছে। এই কারণে অন্যান্য প্রাণীর ব্যবহারের প্রশ্ন এখানে আসে না। তা ছাড়া বানর হতে মানুষ উৎপন্ন হয়নি। বানর ও মানুষ—এই উভয় জীবই কোনও এক বানরানুরূপ ক্রমলুপ্ত জীব হতে উৎপন্ন হয়েছে। এখন বিবেচনা করতে হবে এই ক্রমলুপ্ত জীব-বংশের স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ছিল। পরস্বাপহরণ জীবদিগের যে আদি স্বভাব তাতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই।

(২) এই সকল পণ্ডিতগণ পৃথিবীর সকল আদিম মানুষদের মধ্যে কখনও বসবাস করেননি। মনুষ্যমস্তক শিকারী অসমীয় আদিম মানুষ ইহার চাক্ষুস প্রমাণ। এজন্য স্বসমাজে এখনও এরা বীররূপে বিবেচিত। এছাড়া এদের কোনও কোনও গোষ্ঠি মানসিক শিক্ষায় পশ্চাৎপদ হলেও নৈতিক শিক্ষায় সভ্য মানুষের ন্যায়ই অগ্রগামী। এ কথা স্বীকার্য্য যে অনন্তকাল ধরে এক স্থানে এদের কেহই দাঁড়িয়ে নেই। এদের কেহ কেহ য়ুরোপীয় পণ্ডিতদেরই মতে সভ্য জাতির অধঃপাতিত বংশধর। আধুনিক আদিম জাতি ও বর্ত্তমান সভ্য মানুষ—উভয়েই কোনও এক আদিম মানুষ হতেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছে। ঐ ক্রমলুপ্ত আদিম মানুষের হিংসাত্মক স্বভাবের পরিচয় কোনও কোনও আধুনিক আদিম

মানুষদের মধ্যে আজও পাওয়া যায়। এছাড়া এঁরা আরও পূর্ব্ববর্ত্তী একাচারী আদিম মানুষের কথাও ভেবে দেখেননি। এজন্য এঁদের এই মতবাদ আমি গ্রহণযোগ্য মনে করিনি।

এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এই গুণ বা দোষ বংশগত হয় কিনা। দৈহিক বৈশিষ্ট্য বীজকোষকে প্রভাবান্বিত করলে উহা বংশগত হয়, ইহা এক পরীক্ষিত সত্য। লাল ও নীল মাছের বর্ণ পরিবর্ত্তন সম্পর্কীয় পরীক্ষা ইহা প্রমাণিত করেছে। তাই যদি সত্য হয় তা'হলে মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুরূপ কারণে বংশগত না হওয়ার কারণ কি? বরং ইহা স্নায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, ইহা বংশগত হওয়া আরও সহজ। তবে অধুনা কালে অপরাধীর সহিত অপরাধীর মিলন কম ক্ষেত্রেই ঘটে, উহাদের সহিত নিরপরাধীদের রক্ত অধিক মিশ্রিত হয়। অভিজ্ঞতা হতে দেখা গিয়েছে যে উহা সকল ক্ষেত্রে বংশগত হয় না বরং উহা গোত্রগত হয়ে থাকে। এই বংশানুক্রম বা হেরিডিটি এবং গোত্রানুক্রম বা 'Atavism' এই খণ্ডে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এমন অনেক আধুনিক পণ্ডিতও আছেন যাঁরা এই সম্পর্কে হেরিডিটিতে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু চিত্ত-প্রস্তুতি বা Predisposition এ বিশ্বাসী, এঁদের মতে অপরাধীরা অপরাধ সম্পর্কীয় এক একটী Predisposition নিয়ে জন্মালেও জন্মাতে পারে। কিন্তু এতে প্রভেদ যা কিছু গুরুত্বের, বিষয়বস্তুর কোথায়? উৎকট বা দুর্দ্দমনীয় Predispositionকে তাঁরা কি বলবেন? অবশ্য এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

এমন বহু আধুনিক পণ্ডিত আছেন যাঁরা বলেন যে, দৈহিক ক্ষয় ক্ষতি (Degenaration) এবং পরিবৈশিক কারণে অপরাধীর সৃষ্টি হয়। এঁরা অপরাধ-স্পৃহার অবস্থিতি স্বীকার করেন না, অথচ প্রকারান্তরে বলে ফেলেন যে ক্ষয় ক্ষতি এবং পরিবৈশিক কারণে অপস্পৃহা মানুষ প্রাপ্ত হয়।

ইহাই যদি সত্য হয়, তা'হলে এই অপস্পৃহা মানুষ প্রাপ্ত হলো কোথা থেকে? বলা বাহুল্য, মাথা না থাকলে মাথা-ব্যথার প্রশ্নই আসে না। যারা অপরাধ সম্পর্কে কেবলমাত্র দৈহিক ক্ষয় ক্ষতি ও পরিবৈশিক কারণের উপর বিশ্বাসী তাদের এই উভয় মতবাদের প্রত্যুত্তর আমি নিম্নে প্রদান করলাম।

(১) একমাত্র ক্ষয় ক্ষতির কারণে মানুষ অপরাধী হলে, মনস্তাত্বিক উপায়ে স্বল্লায়াসে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে অপরাধীকে নিরাময় করা সম্ভব হতো না। 'অপরাধ চিকিৎসা' শীর্ষক অধ্যায়ে আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ ছাড়া উন্নততর সৎপরিবেশে এনেও অপরাধীকে নিরাময় করা সম্ভব হয়েছে। অপরাধ-সৃষ্টির একমাত্র কারণ দৈহিক ক্ষয় ক্ষতি হলে একমাত্র দৈহিক চিকিৎসা ছাড়া তাকে নিরাময় করা সম্ভব হতো না। দৈহিক ক্ষয় ক্ষতির কারণে একমাত্র অপরাধ-রোগীর সৃষ্টি হতে পারে, নিরোগ বা প্রকৃত অপরাধীর সৃষ্টি হতে পারে না।

দৈহিক ক্ষয় ক্ষতি সভ্য মানুষের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তির হানি ঘটিয়ে তরে অন্তর্নিহিত সুপ্ত বা জাগ্রত অপস্পৃহার বহির্বিকাশ ঘটায় মাত্র। মানব মনে অবস্থিত তিনটী বাধা আছে, যথা—(১) জন্মগত সংস্কার (২) শিক্ষা দীক্ষা ও (৩) সুপরিবেশ এই অপস্পৃহাকে নিম্নমুখী করে রাখে, প্রথম বাধাকে দ্বিতীয় বাধা এবং এই উভয় বাধাকে (Barrier) তৃতীয় বাধা আরও শক্ত করে। এইজন্ম মানুষের অন্তর্মুখী অপরাধ-স্পৃহা সহজে উপরে আসতে পারে না। এই সকল বাধার অপর নাম প্রতিরোধ শক্তি বা Resistance power.

দৈহিক বা মানসিক রোগের কারণে যখন মানুষের এই সকল বাধা অপসারিত হয় এবং তৎজনিত অপরাধ-স্পৃহা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহির্গত হয়ে পড়ে, তখন তাকে আমরা বলি অপরাধ-রোগী। কিন্তু সভ্য মানুষ

যখন লোভ, অভাব প্রভৃতির কারণে আপন চেষ্টা দ্বারা এই সকল বাধা অপসারণ করে অপস্পৃহাকে বহির্মুখী করে তখন তাকে আমরা বলি নিরোগ বা প্রকৃত অপরাধী।

'ক্ষয় ক্ষতি' মতবাদে বিশ্বাসী পণ্ডিতগণ কথনও অপরাধীদের সঠিক ভাবে শ্রেণী এবং উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করেননি। এই কারণে এইরূপ বহু ভুল অভিমত তারা বারে বারে প্রকাশ করেছেন। এই জন্য গবেষণার কারণে আমি প্রথমে অপরাধীদের বিবিধ শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করে নিয়েছি। এত সুদূরপ্রসারী শ্রেণী বিভাগ ইতিপূর্ব্বে আর কেহ কল্পনাও করেননি।

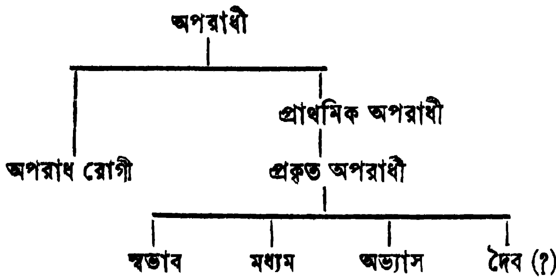
(২) একমাত্র কুপরিবেশ অপরাধী সৃষ্টির কারণ হলে সৎবংশে জন্মগ্রহণ করে ও সৎপরিবেশে মানুষ হয়ে বহু ব্যক্তি কথনই অপরাধী হতো না। এই সম্পর্কে প্রমাণ সহ বহু আলোচনা আমি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি। 'গোময়াদ্ বৃশ্চিকা জায়তে' অর্থে গোময় হতে বৃশ্চিক জন্মে, এইরূপ বুঝানো হয়নি। কারণ বীজ ব্যতীরেকে কোনও জীব জন্মাতে পারে না। গোময় হতে ঐ বীজ উত্তাপ সংগ্রহ করে স্ফুরিত হয় মাত্র। পতঙ্গেরা এইজন্য বাছিয়া বাছিয়া গোময়ের উপর বীজ পরিত্যাগ করে। এই বীজ দৈবাৎ অন্যত্র পতিত হলে উহার স্ফুরণ হয় না। এই জীব-বীজের সহিত অপস্পৃহার তুলনা করা চলে। সভ্য মানুষের মনে অপস্পৃহা এবং সৎপ্রেরণা—এই উভয় দোষ বা গুণ আছে। কুপরিবেশ অপস্পৃহাকে এবং সৎপরিবেশ সৎপ্রেরণাকে স্ফুরিত করে মাত্র।

সৎপরিবেশে বর্দ্ধিত শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ ক্লীপটোমনিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগে থাকে। অপরাধস্পৃহা অপরাধের কারণ না হলে, এদের মধ্যে এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অপস্পৃহা জাত ও আগত হয় কি করে? অপস্পৃহাই যে অপরাধের একমাত্র কারণ তা আমি এই পুস্তকের ছত্রে

ছত্রে উদাহরণ সহ প্রমাণ করেছি। বিবিধ দেশী ও বিদেশী—উদাহরণসহ দৈহিক ও মানসিক রোগ সম্ভূত অপরাধী-রোগীদের সম্বন্ধেও এই পুস্তকে আমি বিশদরূপে আলোচনা করেছি।

অপরাধস্পৃহা মনুষ্য দেহে দুই ভাগে বিভক্ত আছে। অধিকাংশ অপস্পৃহা থাকে উহার বীজকোষে এবং স্বল্পাংশ অপস্পৃহা থাকে উহার দেহকোষে। দেহকোষে স্বল্প অপস্পৃহা থাকে বলে সভ্য মানুষ উহা সকল সময় অত্যুগ্ররূপে অনুভব করেনি। দেহকোষস্থিত অপস্পৃহার উন্মেষ ঘটিয়ে যারা অপরাধী হয় তাদের আমরা অভ্যাস অপরাধী বলি, কিন্তু দৈবক্রমে যদি বীজকোষস্থিত অপস্পৃহা দেহকোষে এসে দেহকোষের অপস্পৃহার সহিত মিলিত হয় তা'হলে উহাদের সমন্বয় উৎকট স্বভাব অপরাধীর জন্ম দেয়। এই স্বভাব, অভ্যাস এবং দৈব অপরাধীর কথা কোনও কোনও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেছেন, কিন্তু তাঁহারা উহাদের সৃষ্টির প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে বিশদরূপে তাঁদের কোনও পুস্তকে উল্লেখ করেন নি। উপরন্তু আমি 'মধ্যম' অপরাধীরূপ অপর একটি মূল বিভাগ উহাতে সংযুক্ত করেছি। এবং উহাদের বিবিধ অপস্পৃহার উৎপত্তির জৈব কারণও আমি নির্দ্দেশ করে দিয়েছি। এই সকল মূল বিভাগের বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীও আমি আবিষ্কার করেছি। এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে আমি 'হিন্দু গবেষণা পদ্ধতির' সাহায্য নিয়েছি। যদি কোনও বস্তুর তিনটী গুণ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান থাকে তা'হলে তার চতুর্থ গুণটী যে কি, তা তার ঐ তিনটী গুণের স্বরূপ বিচার করে নির্ভুল ভাবে অবগত হওয়া যায়। অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতে ধুম দেখা যাচ্ছে; আগুন হতে ধুম নির্গত হয়। অতএব আমরা বলে দেবো যে ঐ পাহাড়ে আগুন আছে। ধরা যাক, মনুষ্য দেহে অপস্পৃহার অবস্থিতি প্রমাণ হলো। এই সভ্য

মানুষ কোনও এক ক্রমলুপ্ত * আদিম মনুষ্য গোষ্ঠি হতে জাত। এর পর অনুমান করে নেওয়া যায় যে ঐ ক্রমলুপ্ত মানুষ অপরাধ-প্রবণ ছিল, তা না হলে তাদের রূপান্তরিত সভ্য মনুষ্য অপস্পৃহা পেলো কোথা থেকে? অপরাধীদের প্রাথমিক বিভাগ কি ভাবে আমি সৃষ্টি করেছি তা নিম্নের মূল তালিকাটী দেখলে বিষয়টী বুঝা যাবে।



স্বভাব অপরাধীদের কেহ কেহ বলবেন যে উহাদের পৃথক সত্বা নেই, উহারাও মূলতঃ অপরাধ-রোগী। কিন্তু কয়েকটী বিষয়ে উহাদের চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকলেও বহু পার্থক্যও আছে। অপরাধী-রোগীদের অপরাধ অনিচ্ছাকৃত এবং তারা তাদের অপরাধের জন্য সকল সময়ই লজ্জিত ও ও অনুতপ্ত থাকে। এ ছাড়া কখনও ব্যক্তিগত বা দলগত লাভের আশায় তারা পরস্বাপহরণ করেনি। অপর দিকে স্বভাব অপরাধীরা এক দুর্দমনীয় অপস্পৃহা দ্বারা চালিত হলেও অপরাধের জন্য তারা কখনও অনুতপ্ত বা লজ্জিত হয় না। তারা অপকর্ম করে ব্যক্তিগত লাভের কারণে। অপরাধকে তারা অধিকারের সামিল মনে করেছে।

---

* ক্রমলুপ্ত এবং অধুনালুপ্ত দুইটী পৃথক বিষয়। যে মনুষ্য গোষ্ঠীর বংশ আজ অবশিষ্ট নেই তারা অধুনালুপ্ত। কিন্তু যারা পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়ে অপর এক নূতন মনুষ্য গোষ্ঠির সৃষ্টি করে, তাহাদের বলা হয় ক্রমলুপ্ত।

স্বভাব অপরাধীদের স্বভাব বহুলাংশে আদিম মানুষের অনুযায়ী হয়। কিন্তু অপরাধী রোগীরা সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করে। অপরাধ-রোগীরা কালে ভদ্রে অপরাধ করে থাকে, কিন্তু স্বভাব অপরাধীরা সুবিধে পেলেই অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। এই উভয় প্রকার অপরাধীদের চরিত্রগত পার্থক্য হতে বুঝা যায় যে উহাদের আদি-মূল বা সৃষ্টির কারণও নিশ্চয় বিভিন্ন।

আমি বিগত বিশ বৎসর যাবৎ যখনই সুবিধা পেয়েছি তখনই কোনও এক অপরাধ-রোগী পাওয়া মাত্র তাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মন-বিজ্ঞান বিভাগে নিয়ে গিয়ে অধ্যাপকদের সাহায্যে তাকে পরীক্ষা করিয়েছি। কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গীয় সরকারের অনুমত্যানুসারে আমি এইখানকার মন-বিজ্ঞান বিভাগের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্যে অনারারী লেকচারের কার্য্য করি। এই সময় আমার ধারণানুযায়ী একজন স্বভাব ও একজন অভ্যাস অপরাধীকে পরীক্ষার জন্য ঐ বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিকট পেশ করি। অভ্যাস অপরাধী খোলামনে সকলের সহিত আলাপ করে, কিন্তু স্বভাব অপরাধীমন্য ব্যক্তিটীকে কেহ কথা বলাতে পারে নি। সে সভ্য মানুষের নিকট হতে যেন দূরে থাকতে চাইছিল। কীট পতঙ্গ ও মানুষ এক পৃথিবীতে বাস করলেও, প্রকৃতপক্ষে উভয়ের পৃথিবী আলাদা। অনুরূপ ভাবে এই স্বভাব অপরাধীরা এই পৃথিবীবাসী হয়েও আলাদা পৃথিবীর মানুষ। এই জন্যে সে এক বিজাতীয় ঘৃণা নিয়ে বিমর্ষ বদনে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল। কেবল মাত্র তার সহধর্ম্মী অভ্যাস অপরাধীর প্রশ্নে সে দুই একটী উত্তর করেছিল, এই যা। এইরূপ আরও কয়েকটী পিকপকেটকেও ঐখানকার বীক্ষণাগারে পরীক্ষার জন্য আমি নিয়ে যাই। যান্ত্রিক ও অন্যান্য

পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায়, সাধারণ ভাবে অপরাধীদের স্পর্শবোধ অত্যধিক এবং কষ্টবোধ কম। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে অভ্যাস অপরাধীদের অপেক্ষা স্বভাব অপরাধীদের মধ্যে এই সকল বোধের স্বল্পতা বা অধিক্য অতি মাত্রায় দেখা যায়। ভারতীয় পিকপকেটদের পরীক্ষা করে আরও জানা যায় যে এদের সময়ের পরিজ্ঞান (Time Reaction) এবং স্পর্শবোধ অত্যাধিক।

পৃথিবীতে অভ্যাস অপরাধীর সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। স্বভাব অপরাধীর সংখ্যা অত্যল্প। এই জন্য এদের সম্বন্ধে গবেষণা করার অসুবিধা আছে।

[সাধারণতঃ স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় বালকদের বলা হয়েছে মধ্যম অপরাধী। এরা জ্ঞানোন্মেষের সহিত অপকর্ম্ম শিক্ষা করে। এজন্য অপরাধ এবং নিরপরাধ সম্বন্ধে এদের কোনও ধারণা থাকে না। অপর দিকে অভ্যাস অপরাধীরা জ্ঞানোন্মেষের পরে মধ্য পথে অপকর্ম্ম শিক্ষা করে। এজন্য এদের ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে পৃথক ধারণা আছে। জন্মান্ধদের সহিত মধ্যম অপরাধীর এবং সাধারণ অন্ধদের সহিত অভ্যাস অপরাধীদের তুলনা করা চলে।]

এই ত্রিবিধ অপরাধীদের উহাদের গুণানুসারে আমি বহু বিভাগে ও উপবিভাগে বিভক্ত করেছি। অধিকন্তু অপরাধী ও অপস্পৃহাকে আমি লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি দুই প্রকার ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রাথমিক ও প্রকৃত বা পুরাতন, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, শোণিতাত্মক ও সাম্পত্তিক, ইত্যাদি। ইহাদের বহু উপবিভাগও পুস্তকে দেখানো হয়েছে। উহাদের বিষয়-বস্তু আমার নিজস্ব সৃষ্টি।

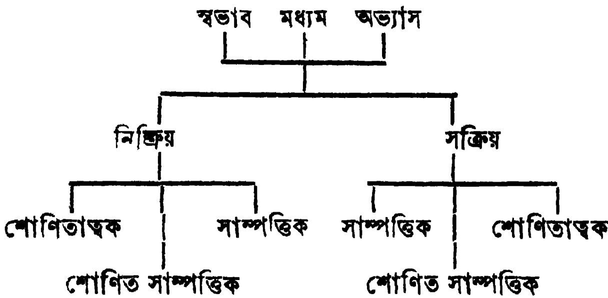
এই অপরাধ-স্পৃহার সহিত স্ত্রী-বীজ বা Ova এবং সৎপ্রেরণার সহিত পুং-বীজ বা Spermএর তুলনা করা চলে। পৃথিবীর প্রথম জীব ছিল

স্ত্রী। পরে এই স্ত্রী-বীজ হতে পুং-বীজের সৃষ্টি হয়। পুং-বীজ স্ত্রী-বীজেরই সূক্ষ্ম অংশ মাত্র। পরে এই স্ত্রী-বীজ ও পুং-বীজের মিশ্রণে উন্নততর জীবের সৃষ্টি হয়। অনুরূপ ভাবে পৃথিবীর আদিম স্পৃহা ছিল অপরাধ-স্পৃহা। সৎ প্রেরণা মানুষ পরবর্ত্তীকালে সভ্যতার সহিত লাভ করে। বস্তুতঃ পক্ষে অপরাধ-স্পৃহা হতেই সৎ প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছে, যেমন করে বিষ (স্বল্প মাত্রায়) হতে অমৃতের বা ঔষধের সৃষ্টি হয়ে থাকে। পরবর্ত্তী কালে এই অপস্পৃহা ও সৎ প্রেরণার সংঘাতের কারণে মানুষ সভ্যতার পথে আরও এগিয়ে গিয়েছে। স্ত্রী-বীজ ক্ষেপে ক্ষেপে ও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় জন্মায় এবং উহা পঞ্চাশ বৎসর উর্দ্ধের স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রায়ই জাত হয় না। অপর দিকে পুং-বীজ সাবলীল ভাবে অফুরন্ত সংখ্যায় একশত বৎসর বয়স্ক মানুষের মধ্যেও জাত হয়ে থাকে। অনুরূপ ভাবে অপস্পৃহা ক্ষেপে ক্ষেপে জন্মায় এবং উহার মধ্যে অপরাধ-বিরাম বা Lucid interval দেখা যায়। এই জন্য বহু প্রকৃত অপরাধীও মধ্যে মধ্যে অপকর্ম্ম হ'তে বিরত থেকেছে। পঞ্চাশ বৎসর উর্দ্ধ বয়স্ক অপরাধী আমরা কম সংখ্যায় দেখে থাকি। অপরদিকে সৎ প্রেরণা অবলীলাক্রমে অফুরন্ত ভাবে জন্মাতে পারে এবং উহা শত বৎসর বয়স্ক মানুষদের মধ্যেও সমান ভাবে দেখা গিয়ে থাকে। আমরা অশীতি বৎসর বয়স্ক বহু রাষ্ট্রবিদ রাষ্ট্রপতি দেখেছি কিন্তু ঐ বয়সের একজনও ডাকাত সর্দ্দারের সন্ধান পাই না।

[আমার এই নিজস্ব মতবাদটী কেবল মাত্র প্রকৃত অপরাধীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য, প্রাথমিক অপরাধী সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কারণ প্রাথমিক অপরাধীদের স্বভাব চরিত্র বহুলাংশে নিরপরাধী মানুষের মত হয়ে থাকে। এই জন্য আমি অপরাধীদের যেমন লম্বালম্বি ভাবে বিভক্ত করেছি, উহাদের আড়াআড়ি ভাবেও বিভক্ত করেছি। 'প্রাথমিক ও

প্রকৃত' এই দুইটী উহাদের লম্বালম্বি বিভাগ এবং 'স্বভাব ও অভ্যাস' ইত্যাদি এদের আড়াআড়ি বিভাগ।]

অপরাধের উপশ্রেণী সকল আমার নিজস্ব আবিষ্কার। এই উপশ্রেণী সমূহের মধ্যে যৌনজ ও অযৌনজ, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় অপস্পৃহা এবং উহার উপশ্রেণী, দ্রব্য-স্পৃহা ও শোণিত-স্পৃহা উল্লেখযোগ্য। এই সুপ্ত শোণিত-স্পৃহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং ইহা কিরূপে অপকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে তাহা পুস্তকে বিশদ-ভাবে বুঝানো হয়েছে। এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করে নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি উপশ্রেণী আমি সৃষ্টি করেছি।



বিশেষ দ্রষ্টব্য :—যারা অপকার্য্যে ব্যক্তি বা দ্রব্যাদির উপর বল-প্রয়োগ করে তাদেব বলা হয় সক্রিয়; যথা—খুন, জখম, দুয়ার ভাঙা, তালাতোড়া, রাহাজানি ইত্যাদি। এবং যারা অপকর্ম্মের সময় বস্তু বা ব্যক্তির উপর আঘাত হানেনি তাদের বলে নিষ্ক্রিয়; যথা—পকেটমার, সাধারণ চুরি, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি ইহাদের উপবিভাগের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও কার্য্যকরণ সম্বন্ধে মূল পুস্তকে বিস্তারিত রূপে বলা হয়েছে।

আমি আরও দেখিয়েছি আদিম শোণিত-পান-স্পৃহা কিরূপে আজও

পর্য্যন্ত আমাদের প্রতিটী কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে। পূর্ব্বেকার শোণিত-পান-স্পৃহা আজিকার দিনে শোণিত-দর্শন-স্পৃহাতে রূপান্তরিত হয়েছে, এই যা। এই স্পৃহা মানুষের ক্ষতি করার ইচ্ছার মধ্যেও রূপান্তরিত হয়েছে। এর মধ্যে অপরাধী মানুষ আদিম মানুষের ন্যায় এক দানবীয় আনন্দ উপভোগ করে থাকে। এই একই কারণে দুই ব্যক্তিকে মারামারি করতে দেখলে আজও বহু লোক তা দেখবার জন্যে ছুটে এসে থাকে। আমি আরও দেখিয়েছি যে সভ্য মানুষ আজও অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই জন্যে তারা আজও প্রখ্যাত অপরাধীর কাহিনী শুনে আনন্দে অধীর হয়ে পড়ে, এমন কি এদের কেহ কেহ পুলিশ হেপাজতি হতে পথিমধ্যে অপরাধীদের উদ্ধার করে এক বিমল আনন্দ পেয়ে থাকে।

কোনও অপরাধী মারপিট ও বলপ্রয়োগ ভালবাসে। এদের কারও কারও লক্ষ্য থাকে শুধু সম্পত্তির উপর। কেহ কেহ আবার মারপিট ও দ্রব্যাপহরণ একত্রে সমাধা করে থাকে। এইজন্য এই অপস্পৃহাকেও আমি বিবিধ উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। কারও কারও এই অপস্পৃহা মাত্র দিবাভাগে এসেছে, কারও কারও তা এসেছে কেবল মাত্র রাত্রিকালে। এইজন্য আমরা রাত্রের ও দিনের চোর পৃথক দেখে থাকি। কোনও এক এ্যাংলো চোর আমাকে বলেছিল, দিন হচ্ছে কাজ করার জন্যে এবং রাত্রি হচ্ছে স্ফূর্ত্তি করার জন্যে, তাই আমি কেবলমাত্র দিনেই চুরি করি। অপর এক দিবাচোর আমাকে বলেছিল, বহু সুযোগ সত্ত্বেও রাত্রে আমার চুরি করার প্রবৃত্তি এলো না। এছাড়া যৌনজ ও অযৌনজ অপরাধীরাও আলাদা হয়ে থাকে। কামস্পৃহা ও দ্রব্যস্পৃহা কদাচ একত্রে এসেছে।

অপরাধীদের মধ্যে চারটী বিশেষ বৃত্তি, যথা—'নিষ্ঠুরতা, দাম্ভিকতা, ভাবপ্রবণতা ও অলসতা' স্থূলরূপে দেখা যায়, কোনও কোনও য়ুরোপীয়

পণ্ডিত এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমি ইহা আলোচনা করেছি ভারতীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। উপরন্তু আমি ইহাও দেখিয়েছি যে এই বৃত্তি চতুষ্টয় প্রকৃত অপবাধের মনের পথে যথাক্রমে উঠা-নামা করে। উহারা কখনও থাকে অলস, কখনও থাকে নিষ্ঠুর, কখনও থাকে দাম্ভিক, কখনও থাকে ভাবপ্রবণ। এই ভাবপ্রবণ অবস্থায় থাকা-কালীন অপরাধীরা অপরাধ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছে। কৃত্রিম উপায়েও এদের ভাবপ্রবণ অবস্থায় আনা সম্ভব। এদের এই মনের পথে উঠা-নামা সাবধানে লক্ষ্য করে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি। দাম্ভিক অবস্থায় থাকা-কালে যে ব্যক্তি গাল পাড়ে, সেই ব্যক্তিই ভাবপ্রবণ অবস্থায় চোরাই দ্রব্যের সন্ধান আমাকে বলে দিযেছে। অপরাধ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই নূতন জ্ঞান রক্ষীমহলেব অশেষ উপকার সাধন করবে। আমি আরও দেখিয়েছি যে নিষ্ঠুর অবস্থায় থাকাকালীন অপরাধীবা অপরাধ করে, বন্দী অবস্থায় উহাতে অপাবক হযে তারা গাল দেয মাথা খুঁডে বা বেগে পলায়নে তৎপব হয়।

এ ছাডা আমি আরও দেখিয়েছি যে দেহের ন্যায় মনেরও ক্রম-বিকাশ হয়েছে। আদিম মানুষ প্রথমে মাত্র কয়েকটী বাক্যের সাহায্যে কথোপকথন কার্য্য সমাধা করতো। এক্ষণে ঐ কয়েকটী শব্দ স্প্লিট আপ, বা বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে আজ ভাব প্রকাশের জন্য বহু শব্দের সৃষ্টি করেছে। অনুরূপ ভাবে নিষ্ঠুরতা, দাম্ভিকতা, ভাবপ্রবণতা ও পরে সৃষ্ট প্রেমবৃত্তির অন্তর্গত প্রতিটী বৃত্তি বহুভাগে বিভক্ত হয়ে প্রেমবৃত্তিপ্রসূত সুবিচারিতা, লোকহিতৈষিতা প্রভৃতি, ভাববৃত্তিপ্রসূত দয়ামায়া, সহানুভূতি প্রভৃতি এবং সূক্ষ্মবৃত্তি ও দম্ভবৃত্তিপ্রসূত অহমিকা, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি ও নিষ্ঠুরবৃত্তিপ্রসূত জিঘাংসা, ক্রূরতা প্রভৃতি স্থূলবৃত্তির সৃষ্টি করে থাকে। এই সম্পর্কে আমি আরও দেখিয়েছি যে অত্যধিক অপস্পৃহার আগমন বা

অন্ত কোনও কারণে এই সকল বহুধা বিভক্ত বৃত্তিকে পুনরায় একত্রিত করে পূর্ব্বের ন্তায় বৃত্তি চতুষ্টয়ে পর্য্যবেশিত করে দিতে পারে। সাধারণ ভাবে আমার মতে সৎপ্রেরণা এই সকল বৃত্তিকে বহুধা বিভক্ত ও সূক্ষ্ম হতে অতি সূক্ষ্ম করে দেয় এবং অপস্পৃহা উহাদের একত্রিত করে উহাদের সংখ্যা কমিয়ে এনে উহাদের স্থূল হতে স্থূলতর করে দিতে পারে। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম যে ইহা রোগপ্রসূত, কিন্তু উভয় শ্রেণীর প্রকৃতিগত পার্থক্য হতে বুঝি যে তা নয়। আমি এও প্রমাণ করেছি যে অপস্পৃহা মানুষের সূক্ষ্মবৃত্তি সমূহকে দুর্ব্বল এবং উহাদের স্থূলবৃত্তি সমূহকে সবল করে দেয় এবং অনুরূপ ভাবে সৎপ্রেরণা মানুষের সূক্ষ্মবৃত্তি সমূহকে সবল ও উহাদের স্থূলবৃত্তি সমূহকে দুর্ব্বল করে তোলে। এই জন্য অপকর্ম্ম স্থূল-বৃত্তিপ্রসূত এবং সৎকার্য্য সূক্ষ্মবৃত্তিপ্রসূত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত তথ্যের এবং অপস্পৃহার উপর নির্ভর করে আমি এক অভিনব অপরাধ-চিকিৎসার কথাও বলেছি। এই প্রণালীতে চিকিৎসা করে আমি বহু অপরাধীকে নিরাময় করতেও সক্ষম হয়েছি। নিম্নোক্ত কয়টী পন্থা হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে।

(১) অপকর্ম্ম মানুষের সূক্ষ্মবৃত্তিপ্রসূত এবং সৎকর্ম্ম স্থূলবৃত্তি-প্রসূত হয়ে থাকে। এই জন্য অন্য উপায়ে উহাদের সূক্ষ্মবৃত্তি সমূহকে সতেজ করে অপরাধীকে নিরপরাধী করা যায়। গীতবাদ্য ও কলা-বিদ্যা সূক্ষ্মবৃত্তিপ্রসূত হয়ে থাকে। এই সকল বিষয়ে অপরাধীদের আকৃষ্ট করলে তাদের সূক্ষ্মবৃত্তি সমূহ এমনিই সতেজ হয়ে উঠবে এবং সেই অনুপাতে তাদের স্থূলবৃত্তির স্থূলতা যাবে কমে। এই উপায়ে ধীরে ধীরে তারা নিরপরাধী হয়ে উঠবে।

(২) আমি এই পুস্তকে অপরাধীদের অপর কয়েকটী দোষ, যথা—অলসতা এবং নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তার কথা বলেছি। অপরাধীদের

ইন্দ্রিয়বোধ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আমি বলেছি যে স্নায়বিক, মানসিক বা অন্য কোনও কারণে উহাদের কষ্টবোধ অত্যন্ত কম। এ ছাড়া এরা কখনও দীর্ঘকাল বা একটানা কাযকর্ম্মে অভ্যস্ত নয়।

অপরাধীদের নিরাময় করার জন্যে তাদের সমুচিত পারিশ্রমিক সহ হাল্কা কুটিরশিল্পে বা কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে ঐ সকল বস্তুর মালিকানা বোধ জাগ্রত করতে পারলে আরো ভালো। এই ভাবে তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ফিরে আসবে এবং নৈতিক অসাড়তা বিদূরিত হবে। এই জন্যে এদের দিতে হবে সমুচিত পারিশ্রমিক এবং সমান সৎব্যবহার। এই ভাবে বহুক্ষণ যাবৎ একটানা কাযকর্ম্মে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হলে তাদের কর্ম্মালসতা এমনিই বিদূরিত হয়ে যাবে। নিয়মিত ব্যায়াম, পর্য্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে স্নান ও খেলাধূলা প্রভৃতি দ্বারা তাদের দৈহিক অসাড়তা বিদূরিত করে এদের কষ্টবোধ ফিরিয়ে আনা সম্ভব। বাদাম ও বেসনবাটা, কাঁচা দুধ ও সর দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করেও স্বভাব ও রোগী-অপরাধীদের নিরাময় করা যায়। দেহ খাদ্য গ্রহণ করে শুধু মুখবিবর দিয়ে নয়, চর্ম্মকোষ দিয়েও তা তারা করে। এরদ্বারা চর্ম্মকোষ সকল প্রত্যক্ষরূপে আহার পেয়ে সতেজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

(৩) আমরা দেখেছি যে অপস্পৃহা জাত ও আগত হওয়ার জন্যে মানুষ অপকর্ম্ম করে থাকে। আমি মানুষের এই স্বাভাবিক অপস্পৃহা কৃত্রিম উপায়ে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে বা উহা নানা উপায়ে নিষ্কাশিত করে বহু অপরাধীকে নিরপরাধী করেছি। আমি দেখেছি যে একজন পাকা চোর ইনফরমার বেনে কিছুকাল চোর ধরার কার্য্যে নিযুক্ত থাকলে সে আর চুরি করতে পারেনি। চোর ধরার কাযে যেমন অপস্পৃহা প্রকারান্তরে নির্গত হয় তেমনি উহাতে কিছুটা আদর্শও

থাকে। আমি দেখিয়েছি যে অপরাধ মাত্রই আদর্শবিহীন। উহাতে আদর্শ আসামাত্র অপরাধী নিরপরাধী হতে বাধ্য। একজন অপরাধীকে দিযে দানধ্যান করালেও এই কারণে সুফল ফলে থাকে।

[অপবাধীদের মধ্যে দৈব, অভ্যাস, মধ্যম ও স্বভাব অপরাধী আছে। এই জন্য এক এক শ্রেণীর অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতিও এক এক প্রকার হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বভাব অপবাধীদের চিকিৎসা একমাত্র স্নায়ুর উপর কার্য্যকরী ঔষধ, পর্য্যাপ্ত ঘুমের উদ্রেক, পর্য্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে স্নান ও নিয়মিত ম্যাসাজ দ্বারা করা যেতে পারে।]

এইবার অপস্পৃহা নিষ্কাশন কবে দিয়ে কি করে মানুষকে নিরপরাধী করা যায়, সেই সম্পর্কে আবও আলোচনা করা যাক। আমি দেখেছি যে ভূমির অধিকারী হালচাষী সে কদাচ অপরাধ করে থাকে বা তা সে আদপেই করে না। এই জন্য কৃষি প্রধান অঞ্চলে অপরাধের সংখ্যা কম। অপবাধের সংখ্যা বাড়ে উদ্যোগ-শিল্পের প্রসারের সহিত। সাধারণতঃ শ্রমিক এবং কদাচিত ভূমিহীন চাষী মজদুরদের অপরাধ করতে দেখা গিয়েছে। এব একটী কারণ এই যে ভূমির অধিকারী হাল-চাষীর আত্মসম্মানবোধ এমনিই এসে যায়, কাবণ সে বাহিরের কারো তাঁবেদার নয়। এ ছাড়া সে তাব অবচেতন মনে শস্য অপহরণ করে মা ধবিত্রীর বুক হতে। এই ভাবে সে তার অন্তর্নিহিত আদিম অপস্পৃহার শনৈঃ শনৈঃ নিষ্কাশন ঘটিয়ে অপরাধ-বিমুখ হযে থাকে। এ ছাড়া আপন পবিবেশে সে স্বাধীন, সন্তুষ্ট এবং অসৎসঙ্গ তারা কদাচিত কবে থাকে।

অপরদিকে শ্রমিকদেব অবস্থা ঠিক বিপরীত। অধিকন্তু তারা অবচেতন মনে ভাবে যে তাদের কষ্টার্জ্জিত দ্রব্য ও শ্রম অপরে অপহরণ করছে। এছাড়া পারিবাবিক পরিবেশ হতে দূরে থাকায় তারা প্রতিদিন নৈতিক অসাড়তা অর্জ্জন করে থাকে।

এই কারণে অপরাধীকে নিরপরাধী করে পুনর্বাসন করার জন্যে তাদের প্রশিল্পে নিযুক্ত করলে ফল হবে বিপরীত। তাদের প্রত্যেককে ভূমির মালিক করে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করতে হবে, শিল্পাঞ্চল হতে তাদের বহু দূরে নিয়ে গিয়ে। পরিসংখ্যা হতে দেখা গিয়েছে যে ভূমির অধিকারী কৃষকদের মধ্যে অতি স্বল্প সংখ্যক ভূমিহীন চাষী ও কুটিবশিল্পীর মধ্যে মধ্যম সংখ্যক এবং উদ্যোগশিল্পী বস্তিবাসীদের মতো অত্যধিক সংখ্যক অপরাধী জাত হয়েছে।

আমি সর্ব্বপ্রথম আমার এই পুস্তকে ভারতীয় অপরাধী সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। ভারতীয় অপরাধ সমাজ কতকটা হিন্দু-সমাজের অনু-করণে গঠিত। এইখানে খুনে ডাকাতরা সর্ব্বাধিক সম্মান পায়। এরা হচ্ছে অপরাধী সমাজের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, ইহার পর যথাক্রমে তালাতোড, সাধারণ চোর, প্রবঞ্চক, ছিঁচকে প্রভৃতিদের স্থান। অপরাধ নিয়েই অপরাধী সমাজ, কিন্তু এদেরও মধ্যে অপরাধ আছে। বিশ্বাসঘাতকতা এবং বলাৎকারকে প্রকৃত অপরাধীরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। স্বভাব-অপরাধীরা স্বভাব-বেশ্যাদের সহিত নিরালা বস্তিতে রাত্রিযাপন করে এবং অভ্যাস-অপরাধীরা অভ্যাস-বেশ্যাদের সহিত কোঠা বাড়ীতে রাত্রিযাপন করে থাকে। এই বিশেষ সত্য অনুধাবন করে অপরাধীর স্বরূপ বুঝে তাদের যথাযথ স্থানে সন্ধান করা উচিত হবে। পুরানো চোরেরা হুল্লোড়ে অভ্যস্ত। হুল্লোড় ও নেশাভাঙ করে তারা উত্তেজনা এনে তাদের অন্তর্নিহিত অলসতা দূর করে কর্ম্মতৎপর হয়। সহরের চণ্ডুর আড্ডা প্রভৃতি স্থান এদের ক্লাব ঘরের কাজ করে। এই সমাজ ও তাদের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

এরপর তুলনামূলকরূপে (য়ুরোপীয়দের সহিত) ভারতীয় অপরাধ সাহিত্য ও অপরাধ দর্শন সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অপরাধ সাহিত্যের

ক্রমবিকাশ যা আমি দেখিয়েছি তা একান্তরূপে আমার নিজস্ব ও নূতন। প্রথমে জন্তু-জানোয়ারদের ডাকের অনুকরণে এই সাহিত্য সৃষ্ট হয়। তারপর চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতিতে ভাষা লিখিত হতে থাকে। এরপর যথাক্রমে আসে শব্দ খেউড় সঙ্কেত ও উচ্চ সাহিত্য।

অপরাধীরা তাদের বুদ্ধিমত্তার মধ্যে বিজ্ঞানের উচ্চ জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকে। ভারতীয় অপরাধীদের এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে আমি বিশেষ অনুসন্ধান করেছি। উহাদের এই গভীর জ্ঞানের কয়েকটি মাত্র নিয়ে উদ্ধৃত হলো, এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মূল পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

(১) পিকপকেটগণ পকেট মারার সময় ডান হাতের বাহু দ্বারা ঈপ্সিত ব্যক্তিকে জোরে ধাক্কা দেয় এবং তারপর বাম হাত তার বাহুর তলা দিয়ে সম্প্রসারিত করে পকেট হতে দ্রব্য তোলে। এই বড় ধাক্কার আওতায় 'পকেট-মারা'রূপ ছোট ধাক্কা আদপেই অনুভূত হয় না। এরা ধাক্কা প্রভৃতির দ্বারা একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই কায হাসিল করেছে। এই পরিস্থিতি তৈরীর এক সেকেণ্ড পূর্ব্বে কিংবা এক সেকেণ্ড পরে যদি তার পকেট মারে তা'হলে তারা ধরা পড়ে যাবে। এইজন্যে পকেট-মারদের মধ্যে সময়ের পরিজ্ঞান অতীব তীক্ষ্ন। এদের স্পর্শবোধও অত্যন্ত উগ্র। পকেটে সাদা কাগজ বা নোট আছে তা বার হতে টোকা মেরেই তারা বলে দিতে পারে। এদের কোনও কোনও সর্দ্দার দলবলসহ ট্রামে উঠে হাত দিয়ে উপরে রড্ বা ডাণ্ডা ধরে ঈপ্সিত শিকারের কাঁধের উপর ঐ হাতের বাহু ন্যস্ত করে, এইভাবে বাহুর ধমনীর সহিত শিকারের কাঁধের ধমনির সংযোগ স্থাপন করে রক্ত সঞ্চালন হতে বুঝতে চেষ্টা করে ঐ 'শিকার' ভদ্রলোক কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, ইহা বুঝা মাত্র সে ইসারায় সাথীদের জানিয়ে দেয় যে ভীড়ের মধ্যে কাজ

হাসিল করার এই উপযুক্ত সময়। এছাড়া মানুষের উতলা ভাব লক্ষ্য করেও এরা বুঝে নেয়, কার কাছে বহু অর্থ আছে। এদের কেহ কেহ ছলনা দ্বারা শিকারের মন অন্য কোনও বস্তু বা বিষয়ের প্রতি বিক্ষিপ্ত করেও আপন কায হাসিল করেছে।

(২) পুরানো চোরেরা রাত্রে নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করে মেয়েদের গা হতে গহনা চুরি করেছে। কিন্তু তার পূর্ব্বে তারা সাবধানে লক্ষ্য করে কারা বিবাহিতা এবং কারা কুমারী। কুমারী মেয়েদের সম্বন্ধে তারা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে, কারণ অনভ্যাসের কারণে এদের স্পর্শ মাত্রে এরা জেগে উঠে থাকে। বিবাহিতা মেয়েদের গলার হার প্রথমে না খুলে এরা স্কন্ধে ও গলায় ধীরে স্পর্শ করে কিছুটা গা-সইয়ে নেয়। ঘুমন্ত অবস্থায় এই সব মেয়েরা মনে করে উহা বুঝি বা স্বামীর হাত। কোনও কোনও পুরানো চোর সন্ধ্যা রাত্রে বাড়ীর মধ্যে ছোট ছোট টুকরা ইট ছুঁড়ে ঐ বাড়ীর লোকের সংখ্যা ও মেজাজ এবং স্বভাব চরিত্র বুঝে নিয়ে তবে রাত্রে সেখানে হানা দিয়েছে। এরা জানে যে শীতকালে প্রথম রাত্রে এবং গ্রীষ্মকালে শেষ রাত্রে গৃহস্থরা গাঢ়ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে, এইজন্য এরা শীত গ্রীষ্ম ঋতুভেদে অপকর্ম্মের জন্য বিভিন্ন সময় নির্দ্ধারণ করে থাকে।

(৩) প্রবঞ্চকগণ প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে মানুষের দুর্ব্বলতা, পছন্দাপছন্দ প্রয়োজন, এবং চিত্ত-প্রস্তুতি সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হয়ে তাদের বাক্‌জাল বিস্তার করে। ডাক্তাররা যেমন ঔষধপত্র সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয় উকিলরা তেমন হয় না। এই জন্যে অপরাধীরা মানুষের ব্যক্তিগত, পেশাগত ও পারিবারিক চিত্ত-প্রস্তুতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে তবে প্রবঞ্চনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

ভারতীয় অভ্যাস-অপরাধীদের উপর ধর্ম্মীয় বিশ্বাস, স্থানীয় জলবায়ু ও খাদ্যাখাদ্য বিশেষরূপে কার্য্যকরী। এরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে তাদের

এই পাপের জন্য শাস্তির প্রতীক্ষায় থাকে, এই জন্য এদের মিথ্যে করে কেহ জেলে পাঠালেও সেজন্য তারা ক্রোধ প্রকাশ করে না। তারা মনে করে যে তাদের পূর্ব্বকৃত সত্য অপরাধের প্রাপ্য শাস্তিই এই মিথ্যে মামলায় তারা পেয়ে গিয়েছে। এজন্য কেহ তাদের নামে মিথ্যে সাক্ষ্য দিলে তারা ক্রুদ্ধ না হয়ে বরং তারা তা উপভোগ করে। কিন্তু কেহ তাদের নিকট হতে ঘুষ গ্রহণ করে সত্য সাক্ষ্য দিলেও তারা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের ছুরি মেরে দিলেও দিতে পারে। ভারতীয় অপরাধীরা সাধারণতঃ কনসারভেটিভ্ বা সনাতনপন্থী। যে সিঁধকাটী তারা অনন্ত-কাল ধরে ব্যবহার করেছে তারা তা পুরানো অস্ত্র হলেও আজও তা তারা পরিত্যাগ করে নি। ভারতীয় সভ্য মানুষও ঋক্‌বেদের সময় যে লাঙ্গল তারা ব্যবহার করেছে তা তারা আজও পরিত্যাগ করে নি। প্রকৃত অপরাধীরা ফাঁসিকে ভয় করে না, কিন্তু জন্ম কয়েদকে ভয় করে। জীবন-মরণ সম্বন্ধে তারা বেপরোয়া এবং জেল তাদের নিকট এক বিদ্যাপীঠ।

প্রাথমিক অপরাধীরা প্রকৃত অপরাধী-সমাজ ও সভ্য মানুষের সমাজের মধ্যে সংযোগের কার্য্য করে। ভারতীয় গ্রাম হতে বেশ্যাদের ন্যায় অপরাধীরাও সর্ব্বদাই বিতাড়িত হয়ে গণ্ডগ্রাম ও পরে ছোট ছোট শহরে এসে আশ্রয় নেয়। পরে আরও পাকাপোক্ত হয়ে বড় বড় শহরের বস্তি সমূহে এসে আশ্রয় নেয়। ব্যাঘ্রকুলের জন্য যেমন সুন্দরবন নিরাপদ, ভারতীয় অপরাধীদের জন্য তেমনি বড় বড় শহর নিরাপদ। কারণ এক-মাত্র এইখানেই তাদের বিরুদ্ধে 'ভারত-সুলভ' সামাজিক প্রতিক্রিয়া কখনও দেখা যায়নি। বড়ো বড়ো শহরের পাঁচমেশালী কদর্য্য বস্তিগুলি পরিবেশ অনুযায়ী অপরাধী ও বেশ্যা সৃষ্টির অনুকূল। এই জন্য শহরে বস্তি উন্নয়ন দ্বারাও অপরাধ নিরোধ করা সম্ভব।

বংশানুক্রম সম্বন্ধেও পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমি বিস্তারিত গবেষণা করেছি। কিন্তু ইহা আরও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ বলে আমি মনে করি এবং এতে ভুল ক্রটি থাকা স্বাভাবিক। তবে এই সম্পর্কীয় অনুসন্ধানের আমি নূতন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছি। এই গবেষণার জন্যে আমি ভারতীয় অপরাধীদের একমাত্র উপনিবেশ আন্দামান দ্বীপেও কিছুকাল বাস করে এসেছি। ঐখানকার গবেষণালব্ধ কয়েকটী সত্য এই সম্পর্কে আমার দুই একটী মতবাদের বিশেষ সমর্থক।

পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয়-বস্তু সম্পর্কে আমার স্বকীয় অবদান সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে বলা যাক। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে মানুষ কেন অপরাধ করে এবং কি করে তাকে নিরাময় করা যেতে পারে তা বলা হয়েছে, পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহ মানুষ কেমন করে অপরাধ করে তা আমি বলেছি। বিবিধ অপরাধের বিবিধ ভারতীয় পদ্ধতি সমূহ উহাদের মনস্তাত্ত্বিক কারণ ও শ্রেণী বিভাগ সহ ইতিপূর্ব্বে কেহ কোনও পুস্তকে সুসংবদ্ধরূপে সঙ্কলিত করেনি। কিরূপে অপরাধীরা অপরাধ করে এবং কেনই বা তারা সহজে ধরা পড়ে না তা জানা না থাকলে অপরাধ-নিরোধ কিংবা অপরাধ-নির্ণয় করা অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি যে পুস্তকের এই খণ্ডটী পড়া থাকলে জনসাধারণের কেহ কখনও হৃতসর্ব্বস্ব বা প্রবঞ্চিত হবে না। বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হয়েও অসাধারণ মানুষ সাধারণ অপরাধীদের দ্বারা কিরূপে ও কেন অতো সহজে প্রবঞ্চিত হয় তা বিস্তারিতভাবে এই খণ্ডটীতে আমি আলোচনা করেছি। এই সম্পর্কে আমার নিকট প্রদত্ত একটী সাম্প্রতিক বিবৃতি প্রদত্ত হলো।

"এই দিন একদল ছদ্মবেশী প্রবঞ্চক আমাকে ভুলিয়ে অমুক বিড়্ গ্যাম্বলিঙ্-এর আড্ডায় এনে আমাকে ঠকাতে প্রয়াস পায়, কিন্তু

সৌভাগ্যক্রমে আপনার পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডটী আমার পড়া ছিল। দেখলাম পুস্তকে বর্ণিত ঘটনার সহিত এই ঘটনাটী হুবাহু মিলে যাচ্ছে। এই দেখে ছুতায় নাতায় ঐ স্থান হতে সরে পড়েই আপনার নিকট এসে বিবৃতি দিচ্ছি।"

উপরোক্ত রূপে বহু ব্যক্তি পালিয়ে এসে জানিয়েছে যে ঐ পুস্তকখানি না পড়া থাকলে তারা ঐ দিন নিশ্চয় হৃতসর্ব্বস্ব বা প্রবঞ্চিত হতো। এই পুস্তকে আমি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহ প্রবঞ্চনার এবং অন্যান্য অপরাধের যাবতীয় প্রচলিত ভারতীয় পদ্ধতি এমন প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছি যাতে মানুষের চোখের সামনে উহাদের প্রতিটী পদ্ধতি সদাসর্ব্বদা ভেসে উঠতে পারে। ব্যাকফ্রড মামলার অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে অপর কেহই আবিষ্কার করে নি। ইহা আমার গবেষণালব্ধ নিজস্ব অবদান। এ'ছাড়া ভারতীয় চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চনা প্রভৃতির পুরাতন ও নূতন এবং প্রাচীনতম (ঐতিহাসিক) অপপদ্ধতি সমূহ; উহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও মৌলিক তথ্য সহ এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদরূপে আমিই সর্ব্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেছি। অপরাধীদের ব্যবহৃত ও আবিষ্কৃত বিবিধ বৈজ্ঞানিক পন্থা, যন্ত্রপাতি, তাদের বিবিধ-পরিভাষা এবং শিকারমন্ত মানুষের মনের বিভিন্ন অবস্থা ও উহাদের নাম যা আমি অপরাধীদের নিকট হতে জেনেছি তা'ও বিস্তারিত ভাবে পুস্তকের এই খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে।

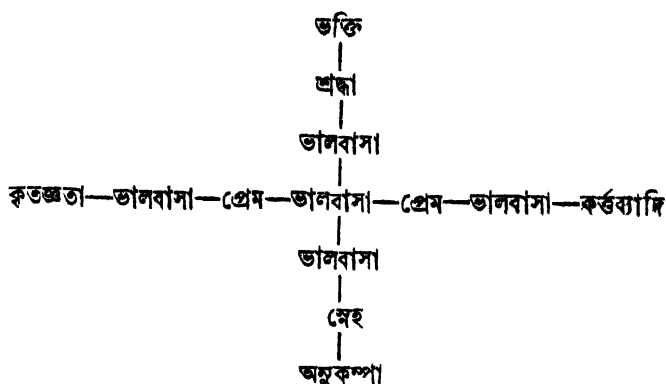
পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার উহার তৃতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলবো। দ্বিতীয় খণ্ডে অযৌনজ অপরাধ-পদ্ধতি এবং তৃতীয় খণ্ডে যৌনজ অপরাধ-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। নারী ঘটিত অপরাধ দুই প্রকারের, যথা—(১) ইচ্ছাকৃত এবং (২) অনিচ্ছাকৃত। নারীর সহযোগিতায় যে অপরাধ তার উপর সংঘটিত

হয় তাকে বলে ইচ্ছাকৃত অপরাধ। আমি এই উভয় অপরাধের ভারতীয় অপপদ্ধতিসমূহ সর্ব্বপ্রথম সঙ্কলিত ও লিপিবদ্ধ করেছি পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে।

একজন সাধ্বী স্ত্রী, স্নেহপ্রবণ মাতা বা ধর্ম্মপ্রবণ কুলনারী অকারণে কেন বিপথগামী হয় তা আজ সুযোগ বহুল বর্ত্তমান সমাজের বিবেচ্য বিষয়। পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত নারীর মন বিশ্লেষণ পন্থাটী একান্ত রূপে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রসূত। এই অভিজ্ঞতা আমি বহু নারী-হরণ ও ব্যাভিচার সংক্রান্ত মামলা তদন্তকালে অর্জ্জন করতে পেরেছি। বর্ত্তমান ভারতীয় নারীর নিজস্ব মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত না হলে তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। ভুলে গেলে চলবে না যে কেবলমাত্র নারীকে উদ্ধার করে এনেই রক্ষীদের সকল কর্ত্তব্যের শেষ হয় না, তাদের অপর কর্ত্তব্য হওয়া উচিত ঐ সকল নারীকে তাদের সপরিবারে ও সপরি-বেশে পুনঃসংস্থাপিত করা. তা না হলে অচিরে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

এই খণ্ডে আমি প্রেমকে সুগার কোটেড কুইনাইনের সঙ্গে তুলনা করেছি, অর্থাৎ ভিতরে থাকে যৌনবোধ, উপরে থাকে প্রেম। ভালবাসা কোনও বান্ধবী, বৌদি বা স্ত্রী যার উপরই হউক না কেন উহাদের যা কিছু তফাৎ তা গুরুত্বের, বিষয়বস্তুর নয়। কি ভাবে নির্দ্দোষ মেলামেশা যৌন-প্রেমে রূপান্তরিত হয় তা এই পুস্তকে আমি বলেছি। পর পৃষ্ঠার তালিকাটী হতে বক্তব্য বিষয়টী বুঝা যাবে।

গুরুকে জনৈকা নারী ভক্তি করে। পরে ইহা নেমে আসে শ্রদ্ধায়। শিক্ষক ও ছাত্রী এইখানে আরম্ভ করে 'শ্রদ্ধা' হতে। অধিক মেলামেশা এদের নামিয়ে আনে ভালবাসায়। বন্ধু ও বান্ধবী কিংবা সহপাঠি ও সহপাঠিনীর সম্পর্ক এইখানে আরম্ভ হয়। পরে এই ভালবাসা ধীরে ধীরে নেমে আসে যৌন সম্পর্কীয় প্রেমে।



উপর হতে নামার ন্যায় নিম্ন হতেও ইহা উপরে উঠে। একটি গরীব কুরূপা মেয়ের প্রতি মানুষের প্রথমে অনুকম্পা আসে। সেবা দ্বারা ঐ মেয়েটি শনৈঃ শনৈঃ ভগ্নীপ্রতিম 'স্নেহের' পর্য্যায়ে উঠে আসতে পারে। এরপর অধিক মেলামেশা বন্ধুসুলভ ভালাবাসায় এবং আরও পরে যৌন-প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে দুই পার্শ্ব হতেও মানুষ শনৈঃ শনৈঃ প্রেমরূপ কেন্দ্রে উপনীত হতে পারে।

বিবিধ কারণে ভদ্র নারীরা গৃহ ত্যাগ করে চলে গিয়েছে, যথা—(১) যৌন তাড়না, (২) হিষ্ট্রিয়া রোগ, (৩) উন্মাদনা, (৪) প্রেম—(ক) গুণগত ও (খ) ব্যক্তিগত। এমন বহু কুমারী আছে যারা একপ্রকার প্রচ্ছন্ন হিষ্ট্রিয়া রোগে ভুগে থাকে। এই রোগের এক একটি বিশেষ পিরিয়ডও আছে। যথা—নয় দিন, একুশ দিন, একান্ন দিন, একানব্বই দিন ইত্যাদি। এই পিরিয়ড্ বা ক্ষণ উত্তীর্ণ হলেই তারা নিরাময় হয়ে যায়। এই সময় এদের কোনও এক ব্যক্তির বা বস্তুর উপর অত্যধিক ঝোঁক দেখা যায়। এই সময় এরা নৈতিক অসাড়তায় আচ্ছন্ন হয়। এই সময় এরা নির্লজ্জ ও মিথ্যা অভিযোগ পিতা, মাতা, ভাই, মামা—অর্থাৎ যে কেহ তাকে বাধা

মেবে, তার বিরুদ্ধে তা দায়ের করেছে। যে মেয়ে মুখ তুলে কাউর সঙ্গে কথা কয়নি সে এই সময় মুখরা হয়ে বেগে পলায়নপর হয় কিংবা বাধা পেয়ে অসহায় ভাবে নেতিয়ে পড়ে। উদ্ধার করে এনে এদের এই 'পিরিয়ড'টুকু অতিবাহিত হওয়া পর্য্যন্ত সাবধানে আটকে রাখিলে সে অচিরে নিরাময় হবে।

যদি বুঝা যায় যে ঐ কন্যা কোনও রোগে ভুগছে না, সত্যই তার আকাঙ্খা প্রেমগত, তা'হলে বিষয়বস্তু অনুধাবন করে বুঝে নিতে হবে যে ঐ প্রেম ব্যক্তিগত না উহা গুণগত। কোনও একটী মেয়ের মন হয়তো চেয়েছে এমন একটী পাত্র যে দীর্ঘকায় উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, ৫০০ শত টাকা বেতন, এম্ এ পাশ, গাড়ী আছে, বাড়ী আছে। এই সকল এক একটী গুণ যা সে মনে মনে কল্পনা করে অবচেতন মনে পুষে রেখেছে। এখন যদি সে ঐ সকল ১০ বা ১২টী গুণের মধ্যে আটটীর সন্ধানও কাউর মধ্যে পায় বা তা সে পেয়েছে বলে বিশ্বাস করে, তা'হলে অচিরে সে ঐ পাত্রের উপর আকৃষ্ট হবে। এই প্রেম অতি সহজে গড়ে উঠে এবং ভাঙেও অতি সহজে। এইখানে আরও অধিক সংখ্যক ঐ গুণসম্পন্ন অপর কোনও যুবকের কথা বলে, কিংবা ঐ ব্যক্তির ঐ সকল গুণ নেই এই কথা ঐ নারীকে বুঝিয়ে তার প্রতি তাকে বিরূপ করে তোলা সম্ভব।

যদি বুঝা যায় তার ঐ প্রেম গুণগত নয়, উহা ব্যক্তিগত, তা'হলে নানা ছলে ও কৌশলে ঐ নারীর মধ্যে এনে দিতে হবে তার প্রতি তার অবিশ্বাস ও ঘৃণা। তাকে এই সম্পর্কে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সে তাকে ঠকিয়েছে এবং সে অনুরূপভাবে অন্যান্য বহু নারীর প্রতিও আকৃষ্ট ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে ঐ নারী তার গুণ দেখে আকৃষ্ট হয়নি। আসলে সে মানুষটাকেই ভালোবেসে ফেলেছে। এই প্রেম দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে এবং ইহা একেবারে ভাঙা ক্ষেত্র বিশেষে সময় সাপেক্ষ।

সর্ব্বোপরি এই সকল বিষয়ে সময়ের ব্যবধান উৎকৃষ্টতম ঔষধ। এই জন্যে সংশ্লিষ্ট যুবকটীকে ঐ নারীর ত্রিসীমানায় বহুদিন আসতে দেওয়া উচিত হবে না।

অপস্পৃহার ন্যায় মানুষের যৌন-স্পৃহাও এক অতি আদিম স্পৃহা। এই যৌন-স্পৃহার কারণে লম্পট ও বেশ্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্বভাব বেশ্যা, অভ্যাস বেশ্যা ও দৈব বেশ্যার ন্যায় স্বভাব লম্পট, অভ্যাস লম্পট ও দৈব লম্পটও দেখা গিয়েছে। আমি দেখিয়েছি, যে মেয়েরা স্বভাব চোর হয় না, সেই স্থলে তারা স্বভাব বেশ্যা হয়। এমন কি মেয়েরা অভ্যাস চোরও কম ক্ষেত্রে হয়েছে। সন্তানপালনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তারা সাধারণতঃ অপরাধ করে নি। উপরন্তু বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা আরও সহজে অর্থোপার্জ্জন করা সম্ভব হয়েছে। শহরে বহু বেশ্যা নারী আছে, কিন্তু তাদের প্রায় কেহই কোনও চুরি-চামারী করেনি। এদের মধ্যে শুধু দৈব চোরই অধিক দেখা যায়। সাধারণতঃ মেয়েরা বেশ্যা হয় কিন্তু চোর হয় না। দুই একটী পরিবারে ভাইকে স্বভাব চোর এবং বোনকে স্বভাব বেশ্যাও হতে দেখা গিয়েছে। তবে রজঃস্বলা অবস্থায় উত্তেজনার কারণে তারা মিথ্যা কথা বলে, এমন কি সহসা অপরাধও করে থাকে। আমি কয়েকটী মেযে-চোরকে পরীক্ষা করে দেখেছি যে, তাদের মধ্যে নারী সুলভ ভাব কম এবং পুরুষালি ভাব অধিক। মনের দিক হতে তারা কতকাংশে পুরুষের ন্যায়। এই জন্য সাধারণতঃ ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্ক এবং ত্রিশের উর্দ্ধবয়স্ক নারীদেরই আমরা অপরাধ করতে দেখেছি।

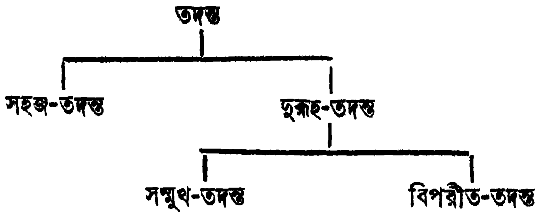
পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত কয়েকটী মাত্র বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলবো।

পুস্তকের এই খণ্ডে রাজনৈতিক অপরাধের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ উহাদের বিবিধ সংঘটন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা

করা হয়েছে। এ'ছাড়া 'স্যাবোটেজ', মিথ্যাচরণ, পেশাগত অপরাধ, বিবিধ শ্রমিক সুলভ অপরাধ ও শ্রমিক বিভ্রাট, উহাদের ধর্ম্মঘটের মনস্তাত্বিক কারণ সম্বন্ধেও নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহাতে আলোচনা করা হয়েছে। এই খণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মনস্তাত্বিক গবেষণা হচ্ছে চুকলামী ও চাটুকারিতা অপরাধ সম্পর্কীয় আলোচনা।

পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে এই দেশের সরোগ এবং নিরোগ আত্ম-হত্যার মনস্তাত্বিক কারণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ এবং কিরূপে এই কদর্য্য ইচ্ছা হতে মানুষ অব্যাহতি পেতে পারে, সেই সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এ দেশীয় সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার মনস্তাত্বিক কারণ ও ইতিহাস সম্পর্কেও নূতন মতবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এই খণ্ডে বিবিধ প্রকার দেশীয় দ্যূতক্রীড়ার পদ্ধতিও একত্রে সঙ্কলিত করা হলো এই প্রথম। এ ছাড়া দেশীয় পদ্ধতিতে নোট ও মুদ্রা সম্পর্কীয় জালিয়াতি এবং কিরূপে ঐ সম্পর্কীয় অপরাধ এদেশে সাধিত হয় তাহা বিশদভাবে বুঝানো হয়েছে। এ'ছাড়া আবগারী অপরাধ, রাস্তাবন্দী, বিবিধ প্রকার খুন সম্পর্কীয় অপরাধের কার্য্যপদ্ধতির আলোচনাও এই খণ্ডে করা হয়েছে।

এইবার আমি পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই পুস্তকটীতে আমিই সর্ব্বপ্রথম বিবিধ প্রকার 'পুলিশি তদন্তকে' বিজ্ঞানের রূপ দিয়েছি। মনস্তত্ব বিশ্লেষণ এবং তদন্তের শ্রেণীবিভাগ সহ এই সম্পর্কে এতো উৎকৃষ্ট পুস্তক ইতিপূর্ব্বে কেহ রচনা করেনি। এই নূতন বিজ্ঞান শাস্ত্র ভারতীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বহু নিজ সৃষ্ট পরিভাষা সহ আমিই প্রথম রচনা করেছি। এই পুস্তকে ব্যাখ্যা সহ নিম্নোক্ত রূপে পুলিশ তদন্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।



এর পর নূতন পদ্ধতিতে বিবিধ গবেষণা দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কিরূপে দুরূহ মামলা সমূহের কিনারা করা সম্ভব তা এই পুস্তকে বিশদভাবে বলা হয়েছে। এই বিবিধ পন্থাগুলি সম্পূর্ণ রূপে নূতন ও আমার নিজস্ব। আমি নিজে এই খণ্ডটী এই পুস্তকের শ্রেষ্ঠ খণ্ড বলে মনে করি। আমার মতে ইহার প্রতিটী অংশই সমান মূল্যবান ও গবেষণালব্ধ নূতন বিষয়। এই কারণে ইহার কোনও অংশ পৃথক রূপে আমি আলোচনা করবো না। এ'ছাড়া এই খণ্ডে টিপ ও পদচিহ্ন, পদ্ধতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয় সম্বন্ধে পুরাতন তথ্য সমূহের নূতন পন্থা ও দৃষ্টি ভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে। এই কথা স্বীকার্য্য যে, যে পদ্ধতিতে য়ুরোপীয় পুলিশ তদন্ত করে থাকে, পুরাপুরি বা হুবাহু সেই পদ্ধতিতে এই দেশে তদন্ত কার্য্য চালালে বিফলতা অনিবার্য্য; যেরূপ পন্থায় য়ুরোপে অপরাধী এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় হুবাহু সেই পন্থা এই দেশে প্রয়োগ করলে ফল হবে বিপরীত। অবশ্য কয়েকটী বিষয়ে উভয় দেশীয় পদ্ধতি একই প্রকার হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্বেও উহাদের আমাকে ভারতীয় ছাঁচে ঢেলে নূতন করে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। আমার মতে ভবিষ্যৎ তদন্তকারী অফিসারদের এই পুস্তকখানি প্রভূত উপকারে আসবে।

পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ড সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার উহার সপ্তম খণ্ড

সম্বন্ধে বলবো। এই খণ্ডে তদন্ত-রীতির বৈজ্ঞানিক উপায় এবং বিবিধ শাখা তদন্ত-রীতি সম্বন্ধেও মৌলিক গবেষণা করা হয়েছে। এই খণ্ডে বর্ণিত বেনামী পত্র ও উহার তদন্ত-রীতি আমার নিজস্ব গবেষণালব্ধ বিষয়। এ ছাড়া মোটর কলিসন, পশু হত্যার প্রকার ও তদন্ত-রীতি, গুপ্তচর নিয়োগ প্রণালী এবং উহার মনস্তত্ব, পকেটমার, তালাতোড়, হত্যা প্রভৃতির তদন্ত-রীতির মধ্যে আমি বহু গবেষণালব্ধ নূতন বিষয় সংযুক্ত করেছি। উহাদের কয়েকটী সত্য অনুধাবন করবার জন্যে আমাকে স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতিদের সহিতও সংযোগ স্থাপন করতে হয়েছিল। আমার মতে এই পুস্তকখানিও ভারতীয় তদন্তকারী অফিসারদের বিশেষ উপকারে আসবে।

পুস্তকের অষ্টম খণ্ডে আমি স্যাধারণ, স্বাভাবিক ও অসাধারণ উপায়ে অপরাধ নিরোধের বিবিধ নূতন উপায় সম্বন্ধে গবেষণা করেছি। এ'ছাড়া এই খণ্ডে নিয়োগ-প্রথা জনবিক্ষোভ বিভিন্ন প্রকার পাহারা ও টহলের কার্য্য, আরক্ষবাহিনীর এবং স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতির ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধেও বহু গবেষণা করা হয়েছে। এই পুস্তকখানিও আমার মতে অপরাধ নিরোধের ক্ষেত্রে দেশীয় আরক্ষবাহিনীর প্রভূত উপকারে আসবে।

অপরাধ-বিজ্ঞানের সহিত সমাজ-বিজ্ঞানের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এই জন্য সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও আমাকে বহুবিধ আলোচনা করতে হয়েছে। ভারতীয় অপরাধী, বেশ্যা ও নপুংসক এবং ভিখারী-সমাজ সম্বন্ধে যা কিছু আলোচনা তা একমাত্র আমিই এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে করেছি। পুস্তকের অন্যান্য খণ্ডে ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক দিকটী আবিষ্কার করবার জন্যে আমাকে এই দেশে প্রচলিত গণ-গল্প সমূহের উপর কিছুটা নির্ভরশীল হতে হয়েছে। এই সকল গণ-গল্প বা কাহিনীর মধ্যে

দেশ-ভেদে নাগরিকদের স্বভাব চরিত্র, পছন্দাপছন্দ ও সুখ-দুঃখ প্রায়ই প্রতিফলিত হয়েছে। এই গণ-গল্প সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) যাহা সত্য ঘটনা সম্ভূত, (২) সত্য না হলেও যাহা সচরাচর ঘটে থাকে, (৩) যাহা নিতান্তরূপে মিথ্যা বা অলীক; কিন্তু তা ঐ যুগের মানুষের সরলতার পরিচায়ক। কিরূপে এই তিনটীর একটী হতে অপরটী বৈজ্ঞানিক উপায়ে বেছে নেওয়া সম্ভব তা'ও আমি পুস্তকের কয়েকস্থানে বর্ণনা করেছি। সাময়িক উত্তেজনা ও সামাজিক প্রয়োজন এবং উহার অবস্থা ও ব্যবস্থা ভেদে মুখে মুখে বংশানুক্রমে গণ-গল্প সমূহ সৃষ্টি হয়ে উহা কাল-ক্রমে জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়। বহু ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সত্যের উপরও ইহারা প্রতিষ্ঠিত। গণ-গল্পের স্বরূপ হতে উহারা কতদিন পূর্ব্বে কি কারণে এবং কিরূপ সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে তা বলে দেওয়া সম্ভব। এই সকল গণ-গল্পের মধ্যে সমাজ যুগে যুগে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে এসেছে।

অপরাধীদের প্রকৃতি স্ব স্ব দেশীয় সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এক শ্রেণীর ভারতীয় অপরাধীরা সর্ব্বদাই শাস্তির অপেক্ষায় থাকে। তাদের মিথ্যা মামালায় ফাঁসিয়ে দিলে তারা রাগ বা দুঃখ করে না। এই সময় তারা মনে করে যে, পূর্ব্বতন যে সকল অপরাধের শাস্তি তারা এড়িয়ে যেতে পেরেছে তাদের সেই প্রাপ্য শাস্তি এইদিন তারা পেয়ে গেল এই যা। কিন্তু কোনও সাক্ষী ঘুষ খেয়ে সত্য বললেও এরা ছুরী মেরে দেবে। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক যুরোপীয় অপরাধীরা এইরূপ ধর্ম্মের মনোভাব কখনও প্রকাশ করেনি। সামাজিক কারণে আমরা কোন কোনও যুরোপীয় অপরাধীদের মধ্যে দেখি হৃদয়ের প্রসারতা এবং

কোনও কোনও ভারতীয় অপরাধীদের মধ্যে দেখি হৃদয়ের উদারতা। এই প্রসারতা এবং উদারতার প্রভেদ সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছি। একজন য়ুরোপীয় পকেটমার পকেট কেটে যদি অর্থসহ একটী জাহাজের টিকিট পায় তা'হলে সে ঐ টিকিটটী নিষ্প্রয়োজন বিধায় ঠিকানা পেলে হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তির নিকট ডাকযোগে পাঠালেও পাঠাতে পারে। কিন্তু ভারতীয় অপরাধীরা এই ক্ষেত্রে অত শ্রম স্বীকার না করে নিশ্চয় উহা বিনষ্ট করে দেবে। কারণ য়ুরোপীয়দের ন্যায় ভারতীয় অপরাধীদের চিত্তের বা হৃদয়ের প্রসারতা অত বেশী নেই। অপর দিকে ডাকাতির সময় কেউ কেঁদে তাদের পায়ে আছড়ে পড়লে ভারতীয় অপরাধীরা প্রত্যাগমন কালে কিছু অর্থ ও অলঙ্কার হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদের ফিরিয়ে দিলেও দিতে পারে, কিন্তু এইক্ষেত্রে বস্তুতান্ত্রিক য়ুরোপীয় অপরাধীদের মনে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হবে না। এর কারণ এদের চিত্তের বা হৃদয়ের উদারতা ভারতীয় অপরাধীদের মত অত বেশী নেই। অর্থাৎ এদের হৃদয়ের প্রসারতা আছে, কিন্তু হৃদয়ের উদারতা নেই।

ভারতীয় অপরাধীরা সাধারণতঃ রক্ষণশীল হয়ে থাকে। কিন্তু য়ুরোপীয় অপরাধীরা সকল বিষয়ে পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। যে লাঙ্গল ভারতীয়রা ঋক্‌বেদের যুগে ব্যবহার করেছে তা আজও তারা ব্যবহার করে। অনুরূপ ভাবে ভারতীয় অপরাধীরাও তাদের পুরাকালীন লৌহ অস্ত্র সিঁধকাটী পরিহার করে অন্য কোনও উচ্চধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার খুব কমক্ষেত্রেই করেছে। ভুলে গেলে চলবে না যে যন্ত্রপাতির উপকারিতা কেবল মাত্র উহাদের উৎকর্ষতার উপরই নির্ভর করে না, উহার প্রকৃত উপকারিতা নির্ভর করে উহাদের ব্যবহার চাতুর্য্যের উপর। প্রকৃত আর্টিষ্ট সেই ব্যক্তি যে মাত্র স্বল্প সংখ্যক বা কয়েকটী মাত্র রেখা দ্বারা অধিক 'এফেক্ট' প্রকাশ করতে সক্ষম। এইজন্য ভারতীয়

অপরাধীরা সর্ব্বদাই অতি সাধারণ বা সিম্পল (simple) যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পক্ষপাতি। য়ুরোপীয় অপরাধীরা তাদের যন্ত্রের উৎকর্ষতার উপর নির্ভরশীল এবং ভারতীয় অপরাধীরা নির্ভরশীল উহাদের ব্যবহার চাতুর্য্যের উপর।

[ভারতীয় অপরাধীরা রসায়ন বিদ্যাতেও কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ। এরা চরস, আফিম ও অন্যান্য আরক দ্বারা এমন এক বিড়িও তৈয়ারী করেছে, যা ফুঁকলে আগুন দেখা যায় না, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে ধোঁয়া নির্গত হয়। অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষের মাথার শিয়রে বসে এই বিড়ি ফুঁকে এরা তার ধোঁয়ায় ঘুমন্ত মানুষের ঘুম গভীর করে দিতে পারে। এ'ছাড়া বিবিধ শ্রেণীর পিপীলিকা কিরূপে গৃহে পুষতে হয় তা'ও এরা অবগত আছে। এই পিপীলিকার এক এক শ্রেণী এক এক অপরাধে এরা ব্যবহার করেছে। এই পিপীলিকা কাহারও কাঁধে কাহারও বা গলায় অতর্কিতে ছেড়ে দিয়ে তাদের অস্থির করে তুলে সাহায্যের অছিলায় এগিয়ে এসে এরা তাদের অর্থ অপহরণ করতে সক্ষম হয়েছে।]

পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত প্রতিটী অপরাধ পদ্ধতি আমার স্বকায় অভিজ্ঞতা প্রসূত। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে মানুষ কেন অপরাধ করে তা বলা হয়েছে, পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে মানুষ ঐ সকল কিরূপ উপায়ে বা পদ্ধতিতে সমাধা করে থাকে। ভারতীয় অপরাধীদের বিবিধ যৌনজ ও অযৌনজ পদ্ধতি উহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহ ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও সঙ্কলন করে নি। এ'ছাড়া ভারতীয় অপরাধীদের দ্বারা ব্যবহৃত বহু যন্ত্রপাতির কথা চিত্র সহ আমি বর্ণনা করেছি। এ'ছাড়া আরও বহু যন্ত্রপাতি আমার নিকট সংগৃহীত আছে যাদের কথা এই পুস্তকে আমি বলিনি।

অপরাধ-নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক পন্থা সমূহ সম্বন্ধেও এই পুস্তকে

বিশেষরূপে আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ সেনা বাহিনীর ব্যবহারের জন্য বহু সময় ও মেধা অপব্যয় করেছেন, তাঁরা যদি তাঁদের অমোঘ শক্তির শতাংশের একাংশ রক্ষীবাহিনীর উপকারের জন্য নিয়োগ করেন তা'হলে জগতের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু এইরূপ প্রচেষ্টা তাঁরা খুব কম ক্ষেত্রেই করেছেন। বরং রক্ষী-কুল প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র হতে নিজেরাই সঙ্কলন করে অপরাধ-নির্ণয় ও নিরোধ সম্পর্কে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়েছেন। অধিকন্তু তাঁরা টিপ শাস্ত্র পদচিহ্ন শাস্ত্র রূপ দুইটী পৃথক শাস্ত্র নিজেরাই সৃষ্টি করে নিয়েছেন। সুখের বিষয় যে ভারতবর্ষে ভারতীয়দের দ্বারাই এই দুইটী শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। চিহ্নশাস্ত্র সম্বন্ধে য়ুরোপীয়গণ যৎসামান্য আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমি তাদের এই জ্ঞান ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রসারিত করে উহার বিশেষ উন্নতি সাধন করেছি। এ'ছাড়া মনোবিজ্ঞানের বহুবিধ তথ্য অপরাধ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার পন্থা আমি নির্ণয় করে দিয়েছি। রক্ত-বিজ্ঞান ও কেশ শাস্ত্র পুরাতন কিন্তু উহাদের প্রয়োগ কৌশল একান্ত রূপে আমার নিজস্ব। আমি পুলিশি তদন্তের বহু উপপ্রণালীও আবিষ্কার করে তা অপরাধ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেনামীপত্র, পশুহত্যা, অগ্নিপ্রদান, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি বিবিধ অপরাধের তদন্তের উপপ্রণালী সম্বন্ধে বলা যেতে পারে।

উপরোক্ত বিষয় বস্তু পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু অপতদন্তের মূল প্রণালী সমূহ মৎ-কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়ে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এই পুস্তকটীর দ্বারা অপরাধ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমি নূতন এক বিজ্ঞান শাস্ত্র গড়ে তুলেছি। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা আমার এক নিজস্ব অবদান, এইজন্য এর

প্রতিটী পরিচ্ছেদ আমি পাঠকদের পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। এই পুস্তকের অকুস্থল গমন ও পরিদর্শন, চিহ্নানুসরণ গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ অনুসরণ, ওয়াচ ট্র্যাপিঙ, তল্লাস, প্রমাণ সংগ্রহ, কার্য্যকরণ, বিবৃতি গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়বস্তুগুলি আমার একান্তরূপে নিজস্ব।

এই পুস্তক কয়খানিতে আমি বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছি। বলা বাহুল্য, এই সত্য কাহিনীগুলি উপন্যাস বা গল্পের চেয়েও মনোরম। এই সকল কাহিনীর কয়েকটী অতি হাস্যকর। বলা বাহুল্য বুদ্ধিমান মানুষ সাধারণ অপরাধীদের দ্বারা হাস্যকর রূপেই প্রবঞ্চিত হয়। কারণ লোভ তাদের হাস্যকর রূপে বোকা করে তুলে। পাছে ইহা হাসির গল্পের সামিল মনে করে কেহ অবিশ্বাস করে এই জন্য প্রবঞ্চিত ব্যক্তিগণ বহুক্ষেত্রে ইহা বেমালুম চেপে গিয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্বেও এইগুলি গল্প নয়, এইগুলি সত্য কাহিনী। প্রবঞ্চনা সম্পর্কিত কাহিনী সৃষ্টি হয় চক্ষুর সম্মুখে, এইজন্য কাহারও না কাহার দ্বারা উহা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু চুরি প্রভৃতি কয়েকটী গোপন কার্য্য আছে যা সামাধা হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে। এই জন্য এই সকল কাহিনী আমাকে পুরানো পাপীদের নিকট হতে বহু আয়াসে জেনে নিতে হয়েছে। অপপদ্ধতির কায়দা কানুন ও মনস্তাত্বিক উপায় সম্পর্কিত কাহিনী এই উভয় শ্রেণীর নিকট হতে আমাকে জ্ঞাত হতে হয়েছে। তাদের নিকট হতে শুধু একটী বিবৃতি গ্রহণ করলেই হলো না, বহু লিডিঙ কোশ্চেন দ্বারা ঐ সম্পর্কীয় আরও বহু বিষয় জেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

উপরিউক্ত পন্থায় পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত সাধারণ ও অসাধারণ প্রবঞ্চনা উহাদের সংঘটন এবং মনস্তাত্বিক জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হতে পেরেছিলাম। এই বিশেষ জ্ঞান দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত

আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক আখ্যান। অসাধারণ প্রবঞ্চনা সম্পর্কে পৃথিবীতে ইতিপূর্ব্বে অপর কেহই আলোচনা করেন নি। অসাধারণ প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চক বাক্‌জাল ও বাক্‌প্রয়োগ (Suggestion) দ্বারা প্রবঞ্চিত ব্যক্তির মধ্যে তার সুপ্ত অপস্পৃহার উন্মেষ ঘটিয়ে তাকে বঞ্চিত করে। এই অবস্থায় প্রবঞ্চিত ব্যক্তি (অপস্পৃহা জাত ও আগত হওয়ায়) অপরকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে যায়।

উপরের তথ্য মানুষের অন্তর্নিহিত অপস্পৃহার অবস্থান প্রমাণ করে। তা' না হলে কৃত্রিম উপায়ে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের (সাধারণ ভাবে সৎ) অপস্পৃহা বহির্মুখী করা এতো সহজে সম্ভব হতো না। এই অপস্পৃহার ন্যায় যৌন-স্পৃহাও মানুষের এক আদিম স্পৃহা। পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে 'পরাবিদ্যা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে কৃত্রিম উপায়ে দুর্ব্বৃত্তগণ কিরূপে একজন সৎনারীর অন্তর্নিহিত যৌন-স্পৃহার উদ্রেক করে উহাকে শনৈঃ শনৈঃ বহির্মুখী করে তা ব্যাখ্যা করেছি। এই সকল পরীক্ষা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করবে যে প্রতিটী মানুষের মধ্যে কম বেশী যৌন-স্পৃহাও অপস্পৃহা সুপ্ত অবস্থায় অবস্থিত এবং যে কোনও মুহূর্ত্তে তা জাত ও অবগত হতে পারে।

কৃত্রিম উপায়ে যেমন ঐ সকল স্পৃহা জাত ও আগত হতে পারে, তেমনি চিকিৎসা দ্বারা উহাদের অন্তর্মুখী বা সুপ্ত করে দেওয়াও সম্ভব। অপরাধ চিকিৎসা শীর্ষক প্রবন্ধে আমি ইহা বিবৃত করেছি; ইহাও অপস্পৃহা অবস্থানের অপর আর একটী অকাট্য প্রমাণ। প্রথমে কোষ্ঠবদ্ধতা, দন্ত ও গলার রোগ প্রভৃতির জন্য দৈহিক চিকিৎসা করে পরে উক্ত উপায়ে মানসিক চিকিৎসা দ্বারা আমি বহু আত্মীয় ও অনাত্মীয় অপরাধী ও অপরাধমুখী ব্যক্তিদের চিকিৎসা করে তাদের নিরাময় করতে পেরেছি। যারা অপস্পৃহার অবস্থানে অবিশ্বাসী তাদের এই জরুরী বিষয় আমি ভেবে দেখতে বলবো।

[গোত্রানুক্রম অপরাধী সৃষ্টির কারণ রূপে আমি বিবৃত করেছি। এই গোত্রানুক্রমে (Atavism) দুই প্রকারের। যথা—মানসিক ও দৈহিক। আমি প্রমাণ করেছি যে দৈহিক গোত্রানুক্রম অপরাধী সৃষ্টির জন্য আদপেই দায়ী নয়। আমি আরও প্রমাণ করেছি যে একমাত্র মানসিক গোত্রানুক্রম স্বভাব অপরাধী সৃষ্টি করতে সক্ষম। যদিও এই দৈহিক ও মানসিক গোত্রানুক্রম পৃথক পৃথক ভাবে বা একত্রে মানুষের মধ্যে পরিদৃষ্ট হতে পারে। সাধারণ অপস্পৃহা প্রত্যেক মানুষই জৈব কারণে লাভ করে থাকে।]

কোনও বন্ধু আমাকে বলেছেন যে বিজ্ঞানের পুস্তকে এতো বেশী গল্প উদ্ধৃত করার সার্থকতা কোথায়? এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে যতই মনোরম হউক না কেন, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এইগুলি আদপেই গল্প নয়। এইগুলি বিষয়বস্তু (Factual) বা ফ্যাক্ট মাত্র। এই ফ্যাক্ট বা বিষয়বস্তু অনুধাবন করে বা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানের বিবিধ থিওরী তৈরী করা হয়ে থাকে। থিওরীগুলি তৈরী করার পর উহাতে ফিট্-ইন করার জন্য কাহিনীগুলি পুস্তক কয়টীতে সন্নিবেশিত হয়নি। বরং কাহিনীগুলি বিষয়বস্তুর সহিত ফিট্-ইন্ করে বলে এই সকল থিওরীর অবতারণা করা হয়েছে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় মনোবিজ্ঞান বিভাগীয় ছাত্রদের জন্য এমন বহু পাঠ্য-পুস্তক আছে যাতে কোনও অনুধাবন বা বিশ্লেষণ আদপেই নেই; ঐ সকল পুস্তকে কেবলমাত্র বহু কাহিনী বা ফ্যাক্ট উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই সকল ফ্যাক্ট হতে ঐ সকল দেশের ছাত্রদের আপন আপন ধারণানুযায়ী উহাদের বিশ্লেষণ করে থিওরী গড়ে তুলতে বলা হয়ে থাকে। এইজন্য আমার পুস্তক কয়টীতে অপরাধ সম্পর্কীয় বহু ভারতীয় কাহিনী বা ফ্যাক্ট আমি উদ্ধৃত করেছি। মূল কাহিনীর সহিত উহার

পাত্রপাত্রীর প্রত্তিটী প্রশ্নোত্তর বিজ্ঞান সম্পর্কীয় অর্থবোধাত্মক। এই সকল কাহিনীর কয়েকটী পাত্রপাত্রীর ব্যবহার (আচরণ) ও বচনবিন্যাস অত্যদ্ভুত ও অস্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু যারা অস্বাভাবিক (Abnormal and Perversed) তাদের কার্য্যকরণ স্বাভাবিক হবেই বা কেন? মনোবিজ্ঞানের ভারতীয় ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য এইরূপ বহু বিলাতী ফ্যাক্ট সম্বলিত পুস্তক পাওয়া যায়, কিন্তু অপরাধ সম্পর্কীয় ভারতীয় ফ্যাক্ট সমূহ পর্য্যালোচনা করতে হলে এই পুস্তক কয়খানি পাঠ করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর নেই। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে অধস্তন পৃথিবী হতে বিবিধ কাহিনী বা ফ্যাক্ট সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত। একমাত্র তাঁরা রক্ষীবাহিনীতে প্রবেশ করে এই কার্য্য সমাধা করতে পারেন। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর দুরূহ জীবন যাপন তাঁরা খামকা করেনই বা কি করে? এই সকল বিষয় বিবেচনা করে ভারতীয় অপরাধ ও সমাজ (পুরাতন ও আধুনিক) সম্পর্কীয় বহু কাহিনী বা ফ্যাক্ট তাদের জন্য আমি এই পুস্তক কয়খানিতে সংগ্রহ করে দিলাম। তাঁরা এই সকল ফ্যাক্ট হতে আপন আপন ধারণা অনুযায়ী থিওরী নিজেরাই তৈরী করে নিলে আমি সুখী হবো।

যে সকল নিজস্ব আবিষ্কার ও মৌলিক গবেষণা আমি মূল পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি, উদাহরণ স্বরূপ তাদের কয়েকটী মাত্র আমি এই পরিচিতি পত্রে উদ্ধৃত করলাম। বক্তব্য বিষয় সম্যকরূপে বুঝতে হলে সবকয়খানি পুস্তক পাঠ করে উহার বিষয়বস্তু অনুধাবন করা প্রয়োজন।

আমি দাবী করি যে আমি ভারতীয় অপরাধীদের চিনেছি, জেনেছি, বুঝেছি ও ভালবেসেছি। আমি বিশ্বাস করি, আমার কষ্টলব্ধ গবেষণা একদিন সমাজের প্রভূত উপকারে আসবে।